নব্যভারত

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

অষ্টম খণ্ড ১২৯৭।

০/৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, নব্যভারত কার্য্যালয় হইতে
প্রকাশিত

কলিকাতা,

৬/১ নং পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন, যোড়াসাঁকো,
কলিকাতা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্" যন্ত্রে শ্রীচণ্ডীচরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ৩৲ তিন টাকা মাত্র।

নব্যভারতের অষ্টম খণ্ডের সূচী।

(অষ্টম খণ্ড ।)

সাহেবীকরণের দিকে !

মানুষ যে পথে প্রতারিত হয়, সে পথে পুনঃ পা ফেলিতে সে কিছু সশঙ্কিত। কিন্তু ...শার উত্তেজনা আবারও তাহাকে সে ...থে লইয়া যায়, আবারও প্রতারণায় ...লে। এইরূপ বারম্বার প্রতারিত হইলেও ...ষ আশার কুহকে আবার ভোলে। ভুল—মহাভুল। কিন্তু জীবন-মমতা ...কিতে এ ভ্রমের হাত হইতে কেহই ...ত্তি পায় না। আশারও বিরাম নাই, ...রও কূল কিনারা নাই। মানুষ দিবা-...শ ভুল বুঝিয়া, ভুলে মজিয়া, ভুলকেই ...লিঙ্গন করিতে ধাবিত হইতেছে! আশ্চর্য্য ...লা !!

দ্যূতক্রীড়ার ছলনায় ধর্ম্মবীর যুধিষ্ঠির ...জ্যধন সর্ব্বস্ব খোয়াইয়াও বুঝিলেন না, ...তিনিবৃত্ত হওয়া উচিত। আবার পাশার দান ফেলিলেন—ক্রমে আপনাদিগকে পর্য্যন্ত ...নবাসী করিলেন। মহাভারতের এই ...হেলিকার তবুও একটা মহা অর্থ অভিব্যক্ত হইয়াছে; কিন্তু আমরা যে কেন বারম্বার প্রতারিত হইয়াও পুনঃ সেই পথেই পা ফেলিতেছি, নিজেরাই বুঝি না। সময়ের ফের, মানুষের দুর্ব্বুদ্ধি!

নূতন বর্ষ সমাগমে আবার সকলে হাল-খাতা বাঁধিলেন। নিকাশপত্রে দেখা গিয়াছে কেবল লোকসান;—কিন্তু তবুও আবার বাজার গরম হইয়া উঠিতেছে। মানুষ যত ঠকিতেছে, নূতন নূতন ভেল্কির উপায় উদ্ভাবনে ততই ব্যতিব্যস্ত হইতেছে। বুঝিতেছে না যে, প্রতারণার পরিণাম প্রতারণাই, কিন্তু তবুও ইহারই আশ্রয় লইতেছে। উপহারের চোটে সাহিত্যের বাজার গরম হইয়া উঠিতেছে। গতবৎসরে যে শূন্য পাইয়াছে, সে শূন্যের জোরেই আজ আবার আশার নব মাতোয়ারা। সংসার, বলিহারি তোর ভেল্কির কুহক !!

কেহ কেহ বলিতে পারেন, কেন নিরাশাই বা কিসে? এদেশ যে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? জাতীয় মহাসমিতির এই মহামেলার দিনে কেন আক্ষেপ কর? আশার কথা শুন, চাহিয়া দেখ, ভারত কত উন্নতির দিকে চলিয়াছে! আন্দোলনে ভারত যেন ইংরাজের কাছাকাছি হইয়াছে, আর ভাবনা কিসের?

একদিকে যতই আশার তুরি-ভেরির শব্দ শুনিতেছি, ততই আমরা গভীর নিরাশার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইতেছি। বস্তু

আশা করিয়া মহাত্মা রিপণের প্রবর্ত্তিত স্বায়ত্ব-শাসন আহ্বান করিয়াছিলাম, আজ তাহাতেও গাঢ় নিরাশার ছবি দেখিতেছি,—প্রভুত্ব ঘোষণায়, আত্ম কলহে, নানা কূট তর্কে, ঝগড়া বিবাদে বৃথা দিন কাটিয়া যাইতেছে, সমষ্টিতেও দেশের উন্নতি হইতেছে না। এমন যে জাতীয় মহাসমিতি, ইহাও মনোমিলনের ক্ষেত্র না হইয়া এখন মনোভঙ্গের কারণে পরিণত হইতে চলিয়াছে;—ভিক্ষানীতির ধূয়া এখন বিলাত পর্য্যন্ত ছুটিয়াছে। এই অধঃপতিত জাতির আশা ভরসা ইহাতেও বড় একটা দেখিতেছি না। আমরা ছুটি প্রশ্নের মীমাংসা না পাইয়া ভগ্ন-মনোরথ হইয়াছি। পৃথিবীর জাতীয় উন্নতির ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়া দেখিয়াছি, জাতীয় ভাষার উন্নতি সাধন না করিয়া কোন জাতি উন্নতি লাভ করিয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত পাই নাই। ধর্ম্মের উন্নতি সাধন না করিয়াও কোন জাতি পৃথিবীর মধ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়া তাহা স্থায়ী করিতে পারিয়াছে বলিয়া শুনি নাই। কিন্তু ভারতে এ সকল কল্পনার স্বপ্ন বলিয়া উপেক্ষিত। আশা কোথায়?

সে দিন একখানি সংবাদপত্রে পাঠ করিতেছিলাম, গত ১৬ বৎসরে ইংরাজি ভাষা এত উন্নতি লাভ করিয়াছে যে, আর আর সকল ভাষাকে পরাস্ত করিয়া আপন শিষ্যের সংখ্যা দ্বিগুণিত, ত্রিগুণিত করিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, ইংরাজি ভাষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ জাতির প্রভুত্ব পৃথিবীতে দিন দিন বিস্তৃত হইতেছে। প্রাচীন হিন্দু, গ্রীক ও রোমক; আধুনিক ফরাসি, মুসলমান, কি ইংরাজ, যে কোন জাতির কথাই বলা না কেন, ধর্ম্ম ও ভাষার উন্নতির দিনেই এই সকল জাতির আধিপত্য দেখা যায়, এবং তাহার অপকর্ষের দিনেই অবনতি পরিলক্ষিত হয়। ভারতবর্ষ—দিন দিনই ধর্ম্মচ্যুত, দিন দিনই জাতীয় ভাষাচ্যুত হইয়া পড়িতেছেন। এখন পাশ্চাত্য ধর্ম্ম, এখন পাশ্চাত্য ভাষা ভারতবর্ষকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। শনৈঃ শনৈঃ এখন লোক সকল ইংরাজ অধিকৃত হইয়া পড়িতেছেন। কি ধর্ম্মে, কি কর্ম্মে, কি জ্ঞানে, কি সভ্যতায়—ভারতবাসী, শিক্ষিত ভারতবাসী, এখন ষোল আনা সাহেবী-কৃত! ইহা ভাল কি মন্দ, সে বিচার করিয়া ফল নাই। তবে ইহা [illegible] যে, এ দেশের আপামর সাধারণ লোকশ্রেণী হইতে শিক্ষিত শ্রেণী, এখন ক্রমে ক্রমে বড়ই দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িতেছেন। কি জ্ঞানে, কি সভ্যতায় নিম্ন শ্রেণী হইতে মধ্যবর্ত্তী শ্রেণী দিন দি[ন] বহু দূরে সরিতেছেন; কাজেই সখের ছু[র্ভিক্ষ]... বাজারটায় দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই রহিয়াছে। ঢাকার "শক্তি" আক্ষেপেই করুন, আর যা করুন, নিম্নশ্রেণীর রক্ষার জন্য "শিক্ষা[লয়]" (School) কি "অর্থালয়" (Ban[k]) কোন আলয়ই মধ্যবর্ত্তী লো[ক] দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইবে না! ইহ[া] যদি জাতীয়তা গঠনের প্রথম সো[পান] বলিতে চাও, বল। পর-মুখ-প্রত্যাশীর দ[ল] যদি ভারতগগনের উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে অ[ভি]নন্দন দিতে চাও, এবং বাড়ীতে নিমন্ত্রণ সভা না গঠন করিয়া ম্লেচ্ছের হোটেলে সুরা-পূর্ণ গ্লাসের মধ্যে স্বাস্থ্য পানের ব্যব[স্থা] করিয়া সম্মান বৃদ্ধি করিতে চাও, কর। আমরা এ সকলে কোন আশার [illegible] পাঠ করিতে না পারিয়া নববর্ষের প্রারম্ভে কেবল নিরাশার ক্রন্দন তুলিয়া অধীর হইতেছি! হিতৈষণা, তুই আমাদিগের জন্য একটুও আশা রাখিলি নে?

কাল জাদুগীর বুলি লইয়া যাঁদের ব্যবসা, এই ঘোর সাহেবীকরণের দিনে তাঁহাদের আর আশা ভরসা কোথায়? [illegible]

কাল মুখের মলিন বুলি—W. C. Banerjeeই বল, এবং P. M. Mukerjeeই বল, পড়িতে বসিয়া আপন আপন গৌরব নষ্ট করিতে পারেন না! "বাঙ্গলা ভাষাটা রাখ কেন? ইংরাজি ভাষার ভারতের জাতীয় ভাষা হওয়ার যতটা সম্ভব, আর কোন ভাষায় তেমন সম্ভব নাই"—কত বে-নামী, অ-নামী লেখক, আমাদের সশিক্ষীকরণ করিয়া, সঞ্জীবনী প্রভৃতি কংগ্রেস-প্রমুখ পত্রিকায় এই কথা ঘোষণা করিয়া "হাম বড়" বলিয়া পরিচয় দিতে সাহসী হইতেছেন! সেই ভয়ে, বুঝিবা, প্রচার নীরব হইলেন, নবজীবন সভয়েও দাঁড়াইতে পারিতেছেন না, যোগেন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ, নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র—এখন নীরব ভাষার সাধন করিতে বসিয়াছেন! আর রমেশচন্দ্র আর্য্য ইতিহাস, সময় বুঝিয়া ইংরাজিতে লিখিতেছেন;—এবং কেহ কেহ রামায়ণ মহাভারতকে ইংরাজি করিয়া ফেলিবার চেষ্টায় আছেন। উন্নতি ত এক দিকে হয় না;—সকল দিকেই সাহেবীকরণের ছটা! ইহাকেই প্রকৃত উন্নতি বলে; নব আমেরিকা, নব অষ্ট্রেলিয়ার ন্যায় ভারতবর্ষও নাকি জাতি ধর্ম ভাষা ভুলিয়া একদিন স্বাধীন ইংরাজ হইয়া যাইবে! আমরা, এই প্রাচীন অধঃপতিত জাতি, মহাত্মা হার্বার্ট স্পেন্সরের (Survival of the Fittest) উপযুক্ততার মতের খাতিরে জীবলীলা সাঙ্গ করিয়া ইংরাজের উদরস্থ হইয়া যাইব! তাই সাহেবীকরণের বাজারে আনন্দের রোল উঠিয়াছে!

বাঙ্গলা কাগজের গ্রাহক জুটে না; যাহার জুটে, সেও মূল্য পায় না। বাঙ্গলা কাগজ কেহ পড়ে না, যাহারা পড়ে, তাহারাও সাধারণের ঘৃণার জিনিস। বাঙ্গলা ভাষা আফিস হইতে উঠিয়া গিয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে না,—দেশের সভা সমিতিতে চলে না;—জাতীয় মহা সমিতিতে গ্রাহ্য নয়, বরং ঘৃণ্য; এমন বাঙ্গলা ভাষা যে পড়ে, সে ঘৃণার জিনিস হইবে না? জানি না, কোন্ আশায় জমীদার পঞ্চায়ৎ সভা এই চাষার ভাষা, এই অসভ্যদের ভাষাটা গ্রহণ করিয়া জাতীয়তা-হীনতা দেখাইয়া সাহেবীকৃত বাঙ্গালীর শ্রদ্ধা হারাইতে বসিলেন! এই ভাষাতে যে কথা বলে, সে অসভ্য; যে পত্র লেখে, সে অসভ্য, যে বক্তৃতা করে, সে আরো অসভ্য! যে এই ভাষার পোষকতা করে, এই ভাষার সংবাদ পত্র বা সাময়িক পত্র পাঠ করে, বা কোন পুস্তক ক্রয় করে, সে ঘোরতর মূর্খ। এই জন্য একটা কথা উঠিয়াছে;—"বাঙ্গলা পুস্তক কিনি মেয়েদের জন্য!" কটকে একজন বন্ধুকে নব্যভারতের গ্রাহক হইতে বলায়, তিনি উত্তর করিয়াছিলেন "মেয়েদের জন্য বামাবোধিনী লইতেছি, তাহাই তাহারা পড়িয়া উঠিতে পারে না; তাহাদের আর সময় কই?" এই অত্যাচার ঘৃণার ভয়েই, বুঝিবা যাহারা পত্রিকা গ্রহণ করে, তাহারাও মূল্য দেয় না। এমন অপকর্ম্ম করিয়া কি লোকের নিকট বলা যায়!!

এ সকল কি অত্যুক্তি-প্রলাপ বকিতেছি? যাঁহারা দেশের প্রকৃত অবস্থা জানেন, তাঁহারা কখনও একথা বলিবেন না। তোমাদের হিতৈষী-শ্রেষ্ঠ প্যারীমোহন ও বন্দ্যোপাধ্যায় সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া, মুন্সেফ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও তাঁহাদের আমলাগণ পর্য্যন্ত, দুই দশজন বাদে আর সকলেই, বাঙ্গলা ভাষাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে! যে দু পৃষ্ঠা ইংরাজি পড়িয়াছে সেও; যে কখন ইংরাজি স্পর্শও করে নাই, সেও। ইহার পরিচয় অদেশে প্রচুর পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গ-দর্শন, আর্য্যদর্শন, প্রচার,

উঠিল কেন? বান্ধব, নবজীবন যায় যায় হইয়াছে কেন? পত্রিকার মূল্য যে আদায় হয় না, তাহার পরিচয়—"বঙ্গবাসীও উপহার খুব দিতে আরম্ভ করিয়াছেন!" এমন দেশ-ব্যাপী ঘৃণার স্রোত আর কোন দেশে কখনও দেখা যায় নাই। ধন্য সাহেবীকরণ!

ভাষাতে চূড়ান্ত সাহেবীকরণ দেখাইয়াছি। ধর্ম্মে কি সাহেবীকরণটা কিছু কম? একদিন মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয় আক্ষেপ করিয়া বলিতেছিলেন যে, "এই কলিকাতায় এমন বড় লোক নাই, যিনি উইলসনের বাড়ীর খানা খান না।" ভাল মন্দ বিচারের ভার, পাঠকগণের হাতে; আমরা অবস্থাটাই জানাইতেছি। শশধর, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন, কৃষ্ণপ্রসাদ—যে দেশের ধর্ম্মের তত্ত্বটাকে বক্তৃতার বিষয় করিয়া পাদরী সাহেবের ন্যায় ব্যবসা চালাইতেছেন; সে দেশের ধর্ম্ম কত দূরে যাইয়া গড়াইয়া পড়িয়াছে, ভাবাও কঠিন। আমরা এই সকল মহাত্মাদের প্রতি ঘৃণা দেখাইতেছি না; তবে এই কথা বলিতেছি, ধর্ম্মটাকে বক্তৃতার আসরে নামাইয়া ইঁহারা হিন্দুধর্ম্মের অগৌরব করিতেছেন; অধিকারী ভেদে উপদেশ দেওয়ার অমূল্য তত্ত্বকে ডুবাইয়াছেন;—ধর্ম্মকে বৃথা হুজুগে পরিণত করিয়াছেন! ফল শাস্ত্র হওয়ার, খুব হইতেছে;—মিথ্যা, প্রবঞ্চনা—পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণে অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই শোচনীয় অবস্থাকেও কেহ কেহ উন্নতির অবস্থা বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন! মোটের উপর কি হইতেছে, কেমনে বলিব? কিন্তু এ কথা বলিতে পারি যে, আমরা দিন দিন চরিত্রহীন হইয়া এক অপকৃষ্ট জীবের সৃষ্টি করিতেছি। যাক্, সে সকল দুঃখের কাহিনী বলিয়া আর কাজ কি?

এইরূপ ঘোরতর সাহেবীকরণরূপ নিরাশার ঘনঘটার মধ্যে পড়িয়াও নব্যভারত কি—আশায় রহিয়াছে? ১২৯৬ সালের গভীর শোকের পরও আবার মাথা তুলিতেছে কেন? কেহ কেহ এই প্রশ্ন তুলিতে পারেন। যে দেশে ভাল কাজেও সহানুভূতি প্রকাশ করিবার বন্ধু জুটে না, কর্ত্তব্য-পালনে একটু সাহায্য মিলে না, চরণ ধরিলেও প্রসন্ন মুখের হাসিটুকুও উপহার পাওয়া যায় না, সে দেশে আবার এই "নব্যভারত" থাকে কেন?—উত্তর:—ইহাও মহাভুল!

মহামতি যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ, বুঝিয়াও ফিরিতে পারেন নাই;—আমরা কর্ত্তব্য-প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ, বুঝিয়াও ফিরিতে পারিতেছি না! ফিরিয়া দাঁড়াই বা কোথা? যদি ধর্ম্ম যায়, ভাষা যায়;—ভারতের আর বাকী থাকে কি? কি লইয়া থাকিব? কার মায়ায় থাকিব? বুঝিতেছি, দিন দিন সাহেবীকরণেরই জয় হইতেছে, তবুও একটু একটু আশার কুহকে না মজিয়া পারিতেছি না। কালে আমরা কেহই থাকিব না—জানি; কিন্তু আজই নব্যভারত তুলিয়া দিতে পারিতেছি না। এ এক মহা ভ্রান্তির ঘোর! ধন জন প্রাণ—সব এদেশের কর্ত্তব্য-পালনে ফেলিয়া দিয়া শেষে পলায়ন করিব! কন্যা শোকের দারুণ আঘাতে, সাহেবীকরণের গভীর নিরাশার কশাঘাতে, বন্ধুবান্ধবগণের সহানুভূতি ও দয়া-শূন্য এই কর্ত্তব্যরূপ মহাশ্মশানে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, সকল তীব্র বাণ সহ্য করিয়া করিয়া শেষে প্রাণ বিসর্জ্জন দিব। নব্যভারত তারপর আর মাথা তুলিবে না। সেই দিন—সাহেবীকরণের ষোল কলা এই ভারত-শ্মশানে রাজত্ব করিবে। সেই দিন "বঙ্গবাসীর" গভীর হাহাকার ধ্বনি শ্রবণ করিয়া কাহারও চক্ষে আর বিন্দুমাত্র জলও পড়িবে না; হার্বাট স্পেন্সার সাহেবের জয় জয় কারে চতুর্দ্দিকে পরিপূর্ণ হইবে।

ধর্ম্ম।

পৃথিবীতে যে সকল ধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছে, তন্মধ্যে মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ ও হিন্দু, এই চারিটীই প্রধান। বয়সে হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধ, ঋষিরা ইহাকে মানব ধর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। তদপেক্ষা তরুণ বৌদ্ধ, তদপেক্ষা খ্রীষ্টান ও সর্ব্বাপেক্ষা মুসলমান। প্রত্যেক ধর্ম্মেরই সংস্থাপনকর্ত্তাদিগের এই অভিপ্রায় ছিল যে, ক্রমে ক্রমে সমগ্র মানব জাতি তদীয় ধর্ম্মের অনুসরণ করিবে, জগতে আর বৈষম্য হইবেনা,বা থাকিবে না; কিন্তু ঘটনার কি কুচক্র! কাহারও উদ্দেশ্য সফল হয় নাই, প্রত্যেক সাধু চেষ্টায় মানুষ যেন স্পর্দ্ধা করিয়া নূতন নূতন ভেদ উদ্ভাবন পূর্ব্বক সেই সেই ভেদ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে।

এক্ষণ পৃথিবীর জন সংখ্যার যেমন বৃদ্ধি হইয়াছে, তেমনি রেল, ষ্টীমার ও টেলিগ্রাফের প্রসাদে সমস্ত মানব জাতি বহুল পরিমাণে এক পরিবার ভুক্ত হইয়া পড়িতেছে। আমেরিকা, আফ্রিকার প্রশ্নের উত্তর করিতেছে, ম্যাঞ্চেষ্টার চিনকে কাপড় পরাইতেছে। জ্ঞানের চর্চ্চা খরতর বেগে চলিতেছে; চিনবালক আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতেছে, অষ্ট্রেলিয়ার লোক বার্লিনে যাইয়া শিক্ষা লাভ করিতেছে। একই ব্যক্তি একবৎসরের মধ্যে কিয়ৎকাল নিউইয়র্কে, কিয়ৎকাল জেডোয় ও কিয়ৎকাল কলিকাতায় বক্তৃতা দিতেছে। ইহাতে মতামতের যে একটা অদ্ভুত ঝটিকা উপস্থিত করিয়াছে,তাহার ফলাফল অনুমান করা সহজ নহে।

মানব জাতি স্বভাবতঃ বড়ই স্থিতিশীল; সুন্দর হইলেও একটা পরিবর্ত্তের প্রস্তাব করিলেই অমনি কেহ তাহা গ্রহণ করিতে চাহে না, যদি তাহা চাহিত,তাহা প্রত্যেক নবধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের উন্মাদিনী ভাষা ও স্বর্গীয় প্রকৃতিতে জগৎ গলিয়া এতদিন এক ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া যাইত। আজ যত সম্বন্ধে সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া যে ঝটিকা বহিতেছে, তাহাতে অতীত দেখিয়া ভবিষ্যতের অনুমান না করিয়া অনেকে আশা করিতেছেন যে, কাল ক্রমে সমগ্র পৃথিবী এক ধর্ম্মাক্রান্ত হইবে, কিন্তু সেই এক ধর্ম্ম কোন্ ধর্ম্ম হইবে, এবং সেই ধর্ম্মোপদেষ্টা জগৎ গুরুর কোন দেশে আবির্ভাব হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

ধর্ম্ম সম্বন্ধে এসিয়াই এপর্য্যন্ত জগতের গুরুত্ব করিয়া আসিয়াছে; ইউরোপ বল, আমেরিকা বল, আফ্রিকা বল, সকলেই এসিয়ার শিষ্য, কিন্তু সেই এসিয়ার অবস্থা এখন শোচনীয়! যে ভারতবর্ষ নিসৃত ধর্ম্ম এক্ষণও পৃথিবীর অর্দ্ধেক লোকের অবলম্বন, সেই ভারতবর্ষ এক্ষন ইংলণ্ডের কুক্ষিগত। ভারতসন্তান সব জীর্ণ শীর্ণ; ফেরুপালের ন্যায় ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; মস্তকে মনীষা নাই, হৃদয়ে তেজ নাই, বিজয়ীদিগের এরূপ অনুগত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাদিগের চা'লে চলিতে, তাহাদিগের খানা খাইতে ও তাহাদিগের পরিচ্ছেদ পরিতে অসীম প্রীতি অনুভব করিতেছে। এই প্রকারের ভবিষ্যৎ, অন্ধ অবিমৃষ্যকারী, কেন্দ্র-ভ্রষ্ট প্রায় সমস্ত উচ্চ

লোক। তারপর ভারত কেবল যে পরাধীন, এমত নহে। বিভক্ত লম্বোদর গজানন পুঞ্জকে বক্ষে ধারণ করিয়া একরূপ অধিকারীশূন্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আজ ইংরেজের অধীনে আছে, অতঃপর রুশ লই বার জন্য শাণাইতেছে; কিছুদিন রুসের পরিচর্য্যা করিলে পর জার্ম্মানি ফরাসী প্রভৃতি অপরাপর প্রতাপান্বিত জাতিরা যে কিছু কাল আধিপত্য না করিয়া ছাড়িবে, তাহার নিশ্চয়তা কি? যে জাতি এরূপ পরসেবা নিরত, পরপদানত, তাহার দ্বারা জগতের ধর্ম্ম-সমীকরণ সম্ভবনীয় কি?

মুসা, যীশু ও মহম্মদের জন্মদাতা আরব তুরস্কও এক্ষণ কণ্ঠাগতপ্রাণ; ইউরোপে তাহারা "রুগ্ন" নামে অভিহিত; রাজ্যের উত্তরের কথকাংশ রুস লইয়াছে, দক্ষিণ পশ্চিমের একটা বৃহৎ অংশ ইংরেজ প্রায় উদরস্থ করিয়াছে; বিনাদোষে আমির শের আলিকে লর্ড লিটন নষ্ট করিল, আমরা তাহাকে প্রাণ ভরিয়া অভিনন্দন দিলাম। কাল যদি শুভ্র বীর সমস্ত তুরস্ক গ্রাস করেন, তাহাতে অভিনন্দন দিব না কি? তুরস্কের এইরূপ শোচনীয় দশা; চীন আত্মরক্ষণে সমর্থ হইলেও একটা সম্ভ্রান্ত শক্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। কারণ, কাল তাহার শরণাগত থিবকে বিনাপরাধে ইংরাজে মারিয়া খাইল, চীন চাহিয়াও দেখিল না। বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত; বৌদ্ধেরা হিন্দুসমাজের আচার ব্যবহারে হস্তক্ষেপ করাতে ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন। ব্যবহারের দোষে ইংরেজেরা আমেরিকা হইতে নিষ্কাসিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে ইংরেজ ও আমেরিকার ধর্ম্মের কোন বৈষম্য ঘটে নাই, বরঞ্চ সময়ে সময়ে প্রগাঢ় বন্ধুতা দৃষ্ট হইয়াছে, এজন্য অনুমান করি, বৌদ্ধের সহিত হিন্দুর মনোমালিন্য এখন নাই; তাহারা তীর্থ দর্শনে গয়ায় আসিয়া অনেক হিন্দুর নিকট যত্ন পাইয়া থাকে। তুরস্ক, পারস্য, আফ-গান, ইহারাও একধর্ম্মী, ইহাদিগেরও যথেষ্ট বন্ধুতা আছে। দুটী প্রবল এসিয়া-বাসী জাতির একত্র সমাবেশ হইয়াছে। ইহা এসিয়ার পক্ষে একটী অতিশয় উজ্জ্বল ভাবী-শুভ চিহ্ন হইতে পারে, এজন্য আমি কেবল স্বদেশের ভাবনা ভাবিতে ইচ্ছা করি; আমার স্বদেশীয়দিগকেও আমি গললগ্নকৃত বাসে এই পথের পথিক হইতে অনুরোধ করি।

মহাসমুদ্রের নিকট নদী সকল যেমন তুল্য, ঈশ্বরের নিকটও নানা ধর্ম্ম তদ্রূপ। এক বৃষ্টির জল কূপে, সরোবরে ও নদীতে পড়িয়া কূপোদকাদি নানা প্রকার নাম ধারণ করে, কিন্তু সেই জল যখন সৌরকরে পরিশুদ্ধ হইয়া বাতাসভরে ঊর্দ্ধে গমন করে, তখন তাহার নাম-ভেদ বৈষম্য থাকে না; ধর্ম্ম ও সেইরূপ শ্রেণীবিশেষকে আশ্রয় করিয়া নানাবিধ নাম গ্রহণ করিয়া থাকে, কিন্তু পরিশুদ্ধ হইলে তাহারও নাম-পার্থক্য থাকে না, সুতরাং কোন ধর্ম্মের দোষ-সংস্কা-রের যে আবশ্যক হইয়াছে, ইহা আমি বিশ্বাস করি না; আবশ্যক হইয়াছে, ব্যক্তি-দিগের আত্ম-সংস্কারের। আমি ইহা অব-গত আছি যে, ধর্ম্মভেদ হইতে সৌহার্দ্দের বাধা জন্মিয়াছে, অপরাধী স্বধর্ম্মীকে লোকে যেরূপ ব্যগ্রতার সহিত সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছে, নির্দ্দোষ বিধর্ম্মীকে সেরূপ করে নাই, কিন্তু ইহা নিশ্চয়ই ব্যক্তিদিগের

স্বভাবের দোষ; ধর্ম্মের দোষ নহে। কারণ অপরাধীর সাহায্য করিতে কোন ধর্ম্মের অনুমতি নাই।

কিন্তু ব্যক্তিদিগের সংস্কার সাধন করা সহজ ব্যাপার নহে, এজন্য মহাত্মা রাম-মোহন রায় জগতের ধর্ম্ম সকলের সন্ধি-স্থান অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের অবতারণা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার পূর্ব্বে মহাত্মা নানক চৈতন্যও ঠিক সেই উদ্দেশ্যে শিখ ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব ও শিখের উন্নতি এখন রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

ধর্ম্মের ইতিহাসে ইহা একটী অখণ্ডনীয় সত্য যে, কোন ধর্ম্ম-সংস্থাপকই একাকী সেই ধর্ম্মের পূর্ণাবয়ব গঠন করিতে সমর্থ হন নাই। মার্ক, লুক, জন না আবির্ভূত হইলে যীশুর নাম কেহই শুনিতে পাইত না, আবুবেকের, ও ওমর প্রভৃতি না হইলে মহম্মদের নাম লোপ পাইত। চৈতন্য ও গুরুগোবিন্দের বংশ পরম্পরায় যদি তাহাদিগের সদৃশ ধর্ম্ম ভাবাপন্ন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইত, তাহা হইলে তত্তৎধর্ম্মের অধিকার নিশ্চয়ই প্রসারিত হইত। ব্রাহ্মধর্ম্ম একরূপ সদ্যজাত ধর্ম্ম, এখনও উহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি গঠিত হয় নাই, কি ভবিষ্যৎ উহার অদৃষ্টে লিখিত আছে, তাহা আমি অনুমান করিতে সাহস করিনা; কিন্তু ইহা নিশ্চয় বলিতে পারি যে, যদি রামমোহন রায়ের শিষ্যদিগের মধ্যে উত্তরোত্তর কেশব বাবুর ন্যায় উপযুক্ত শিষ্যের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে উহা বিস্তার লাভ করিতে পারিবে; কিন্তু যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে কালক্রমে উহার শিখ বৈষ্ণবাদি শ্রেণীভুক্ত হওয়া কেহই নিবারণ করিতে পারিবেন না।

মুসলমান ধর্ম্ম নিরাকারবাদের লীলা ভূমি, কিন্তু কোরাণে সাকার কল্পনার আভাস ও স্পষ্টতঃ দেবতাদির কল্পনা আছে। সুরা এরাকের ষষ্ঠপঞ্চাশত্তম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, "পরমেশ্বর ৬ দিবসে স্বর্গলোক ও ভূলোক সৃজন করিয়াছেন ও তৎপরে সিংহাসনে বসিয়াছিলেন।" আবার ঐ সুরা এরাকের ৪৮ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, "স্বর্গ নরকের মধ্যে এরাকের (বিয়োজক ক্ষেত্র বা প্রাচীরের) উপরে পুরুষ সকল আছেন, তাঁহারা প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার কর্ম্মানুসারে চিনিবেন এবং স্বর্গবাসের যোগ্যদিগকে সলাম করিবেন।" এই পুরুষ সকল অবশ্যই দেবলোক। তার পর "জিবরিল" (স্বর্গের কর্ত্তা), "মেকাইল" (শস্যের কর্ত্তা), "এছরাকিল" (কেয়ামত জানাইবার জন্য শৃঙ্গহস্ত পুরুষ), "বদর" (জলস্থলের কর্ত্তা), "মালাক" (নরকের কর্ত্তা), ইহারাও ফেরেস্তা অর্থাৎ দেবতা। "আজাজিল" (শয়তান) বোধহয় হিন্দু শাস্ত্রের অবিদ্যা। এতদভিন্ন মহম্মদ, ইব্রাহিম প্রভৃতি নবী ও অনেক পীর প্যাগম্বরের উল্লেখ আছে।

হিন্দুশাস্ত্রে পাঁচ প্রকারের উপাসনা নিরূপিত আছে; মুসলমানদিগেরও ঠিক সেইরূপ কার্য্য দেখিতে পাই, যথা;—

(১) অভিগমন, অর্থাৎ দেবমন্দিরের মার্জ্জন ও অনুলেপন। মুসলমানেরা খুদার ঘর মার্জ্জন ও অনুলেপন করিয়া থাকেন।

(২) উপাদান—গন্ধপুষ্পাদি পূজোপকরণের আয়োজন; মুসলমানেরা তণ্ডুল, দুগ্ধ মিষ্টান্নাদির আয়োজন করিয়া থাকেন।

(৩) ইজ্যা—পূজা—মন্ত্র দ্বারা পুষ্প ও অন্যান্য উপকরণের

সমর্পণ। মুসলমানেরা মন্ত্রদ্বারা পূজোপকরণ সমর্পণ করিয়া থাকেন।

(৪) স্বাধ্যায়—শাস্ত্রপাঠ, মুসলমানেরা শাস্ত্রপাঠ করিয়া থাকেন।

(৫) যোগ—দেবতানুসন্ধান; মুসলমানেরা ঈশ্বরের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন।

কোরাণ আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে, মহম্মদের ঈশ্বর ভক্তি দেখিয়া না আর্দ্র হয়, এরূপ পাপাত্মা ভূতলে নাই; প্রত্যেক পৃষ্ঠায় তাঁহার অসীম দয়া ও অনন্ত শক্তির কথা, হৃদয়ের অন্তস্তলীয় ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে পৃথিবীতে যদি কেহ ঈশ্বরকে জানিতে পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মহম্মদ সেই পরম-সৌভাগ্যশালী মহাপুরুষদিগের একজন। যে আর্য্য শাস্ত্র শুক নারদাদি ভক্ত চূড়ামণিদিগের গৌরব মালায় পরিপূর্ণ; ভক্তপ্রবর মহম্মদের নাম সেই শাস্ত্রে সন্নিবেশিত করিবার উপযুক্ত।

বৃহস্পতি বলিয়াছেন—

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়
যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্ম্মহানি প্রজায়তে"

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ঈশ্বরের জীবত গ্রন্থ! ইহার সহিত মিশাইয়া শাস্ত্রকে অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। বাক্‌পাণি পাদ ও পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটী মনুষ্যের কর্ম্মেন্দ্রিয়, অর্থাৎ ইহা ব্যতিরেকে মনুষ্য কর্ম্ম করিতে পারে না, কিন্তু ঈশ্বর ইহার অভাবেও কর্ম্ম করিতে সমর্থ। যথা শ্রুতি—

"অপানি পাদো জবনো গৃহীতা, পশ্যত্য চক্ষু স শৃণোত্য কর্ণঃ স বিশ্বং বেত্তি,নহি তস্য বেত্তা, তমাহু রাজ্যঃ পুরুষ প্রধানম।"

আমরাও দেখি, তাঁহার বায়ু বিনাপদে মহীতলে ভ্রমণ করিতেছে, তাঁহার মাধ্যাকর্ষণ বিনাহস্তে ফল ফুল টানিয়া লইতেছে, তাঁহার তাড়িত বিনাহস্তে ভূমণ্ডলে সংবাদ সকল বিতরণ করিতেছে। তিনি অবশ্যই এ সকল নহেন, কারণ আমরা ইহাদিগের হ্রাসবৃদ্ধি অনুভব করিয়া থাকি, সুতরাং ইহারা অন্য পদার্থ। তবে অপানি পাদো—ইত্যাদি কাহার সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে? ঐ বায়ু, তেজ ও মাধ্যাকর্ষণের ব্যাপক যে শক্তি, সেই শক্তির সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, সেই শক্তিই ঈশ্বর। যিনি ঐ ক্ষুদ্র সকল কণাকে দৃঢ় ভাবে সম্বদ্ধ রাখিয়াছেন, তিনিই এই মহীতলকে ধারণ করিয়া রাখিযাছেন এবং তিনিই এই সৌরজগতের নিয়ন্তা ও অনন্তব্রহ্মাণ্ডের বিধাতা।

এক্ষণে কথা হইতেছে, সেই শক্তির স্বরূপ কি? যদি ধরাতলে কেহ এই শক্তির তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই বর্ত্তমান মানবজাতির আদিপুরুষ মহর্ষিগণ; আমাদিগের পরম সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, তাঁহারা আমাদিগের প্রতি স্নেহ পরবশ হইয়া বেদ, শ্রুতি, স্মৃতি, তন্ত্র ও দর্শনাদি নানা শাস্ত্র রাখিয়া গিয়াছেন; অতএব আমরা তাঁহাদিগের শাস্ত্রেই শক্তিতত্ত্ব অন্বেষণ করিব।

শ্রুতি বলেন—

একো দেব সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
কর্ম্মাধ্যক্ষ, সর্ব্বভূতাধিবাসঃ, সাক্ষীচেতঃ, কেবলোনির্গুণশ্চ।

সকলের আদিবীজ তিনি, যিনি সর্ব্বভূতে গূঢ়ভাবে অবস্থিত ও সর্ব্বব্যাপী, কর্ম্মের অধ্যক্ষ, চিত্তের সাক্ষী অথচ নির্গুণ।

এই আদিবীজকেই অন্যান্য শাস্ত্রে ত্রিগুণাতীত নির্লিপ্ত কূটস্থ চৈতন্য বলিয়া

নির্দ্দেশ করিয়াছেন; ইহাঁর স্বরূপ চিন্তার অতীত, মনের অকল্পনীয়; ইনিই সেই বেদোক্ত তুরীয়াতীত ব্রহ্ম; শ্রুতিতে যাঁহার সম্বন্ধে "যতঃ বাচঃ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" উক্ত হইয়াছে, ইনিই সেই নির্গুণ ব্রহ্ম।

ঋষিরা এই নির্গুণ ব্রহ্মকে উপাসনার অবিষয় বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। যাঁহারা যোগ শাস্ত্রোক্ত সংযমী নির্বিকল্প সমাধির অধিকারী, তাঁহারাই তাঁহার সত্তা অনুভব করিতে পারেন।

এই নির্গুণ ব্রহ্মের দুটি ভাব আছে, (১) পুরুষভাব, (২) প্রকৃতিভাব। এই প্রকৃতিকেই বেদান্তে পরমাণু ও পাতঞ্জলে মায়া বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রকৃতি হইতে সত্ত্ব, রজঃ, তম, এই ত্রিগুণের উৎপত্তি হয়; এবং প্রকৃতি পুরুষ এই উভয়ের যুক্তক্রিয়ায় এই ব্রহ্মাণ্ড হইয়াছে। প্রকৃতি গুণের আশ্রয়, সুতরাং সগুণ; পুরুষও প্রকৃতির সহিত জড়িত, সুতরাং সগুণ, কিন্তু আশ্রয় দোষে সগুণ বলিয়া নিজে সগুণ নহে। গীতায় মহর্ষি ব্যাস বলিয়াছেন,—

"প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদি উভাবপি
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃত সম্ভবান।"

মুণ্ডকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া, সমান বৃক্ষং পরিষস্বজাতে তয়োরন্যঃ পিপ্পলংস্বদ্বত্ত্যনশ্নন্যো অভিচাকশীতি।"

অর্থাৎ সুন্দর পক্ষ যুক্ত দুইটী এক বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, তাহার একটী পিপ্পল অর্থাৎ কর্ম্মজন্য ফলভোগ করেন, অন্যটী নিরশন থাকিয়া কেবল দর্শন মাত্র করেন।

প্রকৃতি পুরুষাত্মক ব্রহ্ম অবশ্যই সগুণ ব্রহ্ম; নির্গুণ ব্রহ্মের যখন উপাসনা হয় না, তখন সগুণ ব্রহ্মই আমাদিগের উপাস্য ঈশ্বর। আমরা জগতে (মাধ্যাকর্ষণে, তাড়িতে ও অন্যান্য পদার্থে) যত প্রকার শক্তি দেখিতে পাই, সে সমুদয়ই গৌণভাবে সেই নির্গুণ ব্রহ্মাত্মক কিন্তু মুখ্যভাবে প্রকৃতি পুরুষাশ্রিত। নির্গুণ ব্রহ্ম যখন আমাদিগের দুরবিগম্য, তখন এই জগতের অব্যবহিত কারণ স্বরূপ প্রকৃতি পুরুষরূপী ঈশ্বরকে (আল্লাকে বা গডকে) উপাসনা করা ব্যতিরেকে আমাদিগের গত্যন্তর নাই। এই সমন্বিত প্রকৃতি পুরুষই বেদে "আত্মা" শব্দে অভিহিত হইয়াছেন। তাঁহাকে কি প্রকারে লাভ করা যায়, তৎসম্বন্ধে কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে।

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যোঃ ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন; যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূস্বাং।"

অর্থাৎ প্রবচন, মেধা বা শ্রুতি দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না, যে তাঁহার প্রার্থী হয়, তাহারই নিকটে তিনি স্বীয় রূপ প্রকাশ করেন।

অতএব এক্ষণ কথা হইতেছে এই, আমাদিগের প্রার্থী হইতে হইবে কি প্রকারে? সেই প্রকৃতি পুরুষ সমন্বিত ব্রহ্ম অবশ্যই নিরাকার। আমি শব্দে কখনই আমার এ দেহ নহে। যখন জন্মের পূর্ব্বে এ দেহ আমার ছিল না, মৃত্যুর পরেও আমার থাকিবে না, তখন এই দেহ কদাচ আমি হইতে পারি না। আরও ইহা দ্রষ্টব্য যে, দৃশ্য ও দ্রষ্টা কখনও এক হইতে পারে না। আমার এই হস্ত আমি দেখিতেছি; দেখিতেছে যে সে [illegible] কখনও হস্ত হইতে পারে না, অতএব যে দেখিতেছে সেই আমি

অর্থাৎ জীবাত্মা। পুরুষপ্রকৃতি স্বরূপ আত্মাকে এই জীবাত্মার জানিতে হইবে। কিন্তু নিরাকার আত্মাকে আমি কি প্রকারে জানিব ?

এ বিষয় চিন্তা করিবার পূর্ব্বে একবার জীবাত্মার জ্ঞানের সীমা সকল পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, মনের যে জ্ঞান আছে জীবাত্মারও সেই জ্ঞান আছে, কিন্তু মনের সমস্ত জ্ঞানই এই শরীরের দ্বারা লব্ধ। যাহা শরীর দেখায় নাই, শুনায় নাই, জানায় নাই, মন তাহা জানে না সুতরাং জীবাত্মার বর্ত্তমান জ্ঞান সকলই সাকার-লব্ধ কিন্তু জ্ঞান যত সকলই নিরাকার, অতএব প্রতিপাদিত হইতেছে যে নিরাকার জীবাত্মা নিরাকার জ্ঞান লাভ করিয়াছে সাকার দেহের দ্বারা।

আবার দেখা যাউক, নিরাকার আত্মজ্ঞান ভিন্ন জীবাত্মা অন্য কোন নিরাকারের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে কি না এবং যদি করিয়া থাকে, তবে তাহা লাভ করিয়া থাকে [illegible] প্রকারে ? এ অনুসন্ধানে দেখা যাই [illegible] জীবাত্মা সুগন্ধ, সুস্বাদ, সুস্বর, ইত্যাদি নানা প্রকার নিরাকার দ্রব্যের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে এবং তাহা লাভ করে তত্তৎগুণের আধার স্বরূপ দ্রব্যের দ্বারা, অতএব নিরাকার আত্মজ্ঞান তদুপযোগী সাকার ব্যতিরেকে লাভ হইতে পারে না।

এক্ষণ কথা হইতেছে, আত্মজ্ঞানের উপযোগী সাকার কি ? আত্মজ্ঞানত প্রকৃতি পুরুষরূপী এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত, এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকারে অবলম্বন করা যাইতে পারে ? সুতরাং অবলম্বনীয় হইতেছে [illegible] কোন একটী অংশ, সেই অংশ মৃত্তিকা, ধাতু, প্রস্তর কাষ্ঠ, অগ্নি, বিষ্ঠা, গোবর, গুল্ম, জীব, লতাদি, সকলই হইতে পারে, কিন্তু এই সমস্ত বস্তু অবলম্বন করিতে হইলে দেখা যায় যে, ইহার মধ্যে কতকগুলি বিভৎরসাত্মক দাহকরী, ক্ষণক্ষয়শীল, বিকৃতিপ্রবণ, সুতরাং যে সকল দ্রব্য এ প্রকারের দোষাশ্রিত, তাহা অবশ্যই বর্জ্জনীয়। ঐ সকল বাদ দিলে রহিল মৃত্তিকা, ধাতু, প্রস্তর ও সারবান কাষ্ঠ সকল। আশ্বালায়ন গৃহ্যসূত্রের চতুর্দশ অধ্যায়ের তৃতীয় সূত্রে পূজ্য দ্রব্যের এই সকল গুণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "দারুজা কামদা, সৌবর্ণা ভক্তি মুক্তিপ্রদা, রাজতা স্বর্গদা, তাম্রময়ী আয়ুর্বর্দ্ধিনী, কাংস্যা আপদ্ধ্নী, পৈতলি শত্রুনাশিনী, শৈলা সর্ব্বভোগপ্রদা; স্ফাটিকী সিদ্ধিদা, মৃণ্ময়ী মহাভোগপ্রদা।

মূর্ত্তি বা প্রতিমা বলিলে দ্রব্য বুঝিতে হইবে, সেই দ্রব্য পিণ্ড, বর্ত্তুল বা দেহাকারে গঠিত হওয়াতে কোন ইতর বিশেষ নাই। আবাহন বিসর্জ্জন সম্বন্ধে কেহ কেহ আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছেন, তাহারা বলেন "সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরকে আবার আহ্বান কেন ?" ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, ঈশ্বর সম্বন্ধে দুইটী উক্তি আছে, ইহার কোনটীকেই কেহ মিথ্যা বলিতে পারেন না।

(১) সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম

(২) যতঃ ইমানি ভুতানি যায়ন্তে

যখন দ্বিতীয়টী উক্ত হয়, তখন ভুত হইতে তাঁহাকে পৃথক্ ভাবা হয়, ইচ্ছা করিলে তিনি যে পৃথক্ হইতে পারেন না, ইহা কে বলিতে পারে ? সুতরাং সেই পৃথক স্থলে আবাহন দূষনীয় হইতে পারে না। স্থিরতর মূর্ত্তির প্রতি আবাহন বিসর্জ্জন

নিষিদ্ধ, কারণ একবার আবাহন করা হইয়াছে।

ধর্ম্ম সাধনের যে প্রবল বাধা কি, তাহা আজ কালকার লোকের জানিবার সুবিধা নাই, কারণ ধর্ম্ম এক্ষণ লোকের ওষ্ঠাগ্রে কিম্বা লেখনীর উপান্তে অবস্থিত, নির্দ্দোষ বক্তৃতা দিতে কিম্বা নির্দ্দোষ প্রবন্ধ লিখিতে পারিলেই ধর্ম্মোপদেষ্টা ও ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হওয়া যায়, কোন অনুষ্ঠানের আবশ্যক করে না। এজন্য ধর্ম্ম সাধনের বাধা জানিবার কোন উপায় নাই, কিন্তু ধর্ম্মের বর্ণ পরিচয় যিনি অভ্যাস করিয়াছেন, তিনিও ইহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, সুদৃঢ় ধর্ম্ম বিশ্বাস লাভ করা একটী অতিশয় দুরূহ ব্যাপার। আজ যিনি ঘোর আস্তিক তিনি কাল যে ঘোর নাস্তিক হইবেন না, ইহার নিশ্চয়তা কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায়না। প্রবলতর তার্কিকের পাল্লায় পড়িয়া পরিবর্ত্তিত হইতে সচরাচর দেখা যায় ইহা ব্যতীত মনের বিচারে নিজে পরিবর্ত্তিত হওয়াও কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এই প্রকারের মত বিপর্য্যয়ের শঙ্কট পিতামহেরাও অবশ্যই অনুভব করিয়াছিলেন, এবং নিশ্চয়ই এই রকমের পর্য্যায় নিবারণের নিমিত্ত সাধনার সোপান স্বরূপ কর্ম্ম কাণ্ডের নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা" অর্থাৎ সাধকদিগের হিতের নিমিত্ত ব্রহ্ম নিজেই রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন। পৃথিবীর লোকে হিন্দুর ছত্রিশ কোটি দেবতা শুনিয়া হাসে, কিন্তু প্রত্যহ আমরা চক্ষু সমীপে ব্রহ্মের যে কোটি কোটি বিকাশ-স্বরূপ মূর্ত্তি দেখিতেছি, তাহা দেখিয়া কেহ হাসে না। যে যে মূর্ত্তিতে তিনি এ পর্য্যন্ত মানব জাতিকে কৃতার্থ করিয়াছেন, তন্ত্র তাহার শতাংশের একাংশও বর্ণনা করিতে পারে নাই। এক্ষণও ভক্তেরা স্বপ্নযোগে কত মূর্ত্তি দেখিয়া থাকেন, তাহা তুমি আমি মিথ্যা বলিলে ভক্ত শুনিবে কেন?

উপাসনায় সাকারের আবশ্যকতা অস্বীকার করা অতিশয় সহজ ব্যাপার, কিন্তু যে ঋষিরা ব্রহ্ম নিরূপণের পরাকাষ্ঠা করিয়াছিলেন, ব্রহ্মের নিরাকার নির্গুণ ভাব ভূয়োভূয়ঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহারাই আবার কেন সাকারোপাসনার ব্যবস্থা দিলেন, ইহা চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। বেদে সাকারবাদ নিরাকারবাদ, দুইই আছে।

ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলের অষ্টমাষ্টকে

"দুর্গেষু বিষম ঘোরে, সংগ্রামে রিপুসঙ্কটে

অগ্নিচৌর নিপাতেষু দুষ্টগ্রহ নিবারণে

দুর্গেষু বিষয়েষু জা সংগ্রামেষু বনেষুচ

মোহয়িত্বা প্রপদ্যন্তে তেষাংমে অভয়ংকুরু।"

যজুর্ব্বেদে শিব অম্বিকার উল্লেখ আছে, কেনোপনিষদে "উমাহৈমবতী", মুণ্ডকোপনিষদে "কালী করালী" কৈবল্যোপনিষদে "উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং", তৈত্তিরীয় আরণ্যকে "উমাপতয়ে" আত্মপ্রবোধোপনিষদে "নারায়ণায় শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরায়" আছে।

বিশুদ্ধ ব্রাহ্মমতের ব্রাহ্ম ও হিন্দুমতের ব্রাহ্মতত্ত্বজ্ঞানে তুল্য পদবীস্থ কিন্তু ব্রাহ্মমতের ব্রাহ্মকে সাধনাপথে অনেক গুপ্ত বিবরে পড়িতে হয়, সময় সময় পথ হারাইয়া অন্ধকারে হাতড়াইতে হয়। কিন্তু হিন্দুকে যে পথে যাইতে হইবে, তাহা শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, সে পথ বহু সাধুজন পূত পদে পদে উপদেশপূর্ণ প্রশস্ত রাজপথ। অন্য ধর্ম্মীরও সেপথ অবলম্বনের কোন বাধা নাই।

হিন্দুধর্ম্ম ভিন্ন অন্য সকল ধর্ম্মের অবলম্বী-দিগের মানুষ ফুসলইয়া নিজধর্ম্ম লইবার রীতি আছে; নিউটেষ্টামেন্টের সেন্টমাথুর অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৩য় প্যারায় জনসাধারণকে ব্যাপটাইস হইবার উপদেশ আছে, আর বলা হইয়াছে, তদ্ব্যতিরেকে মুক্তি নাই। সুরা আলো এমরাণের ৮৭ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে "যে ব্যক্তি এছলাম ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম অন্বেষণ করে, তাহার সেই ধর্ম্ম গৃহীত হইবে না, সে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্ত-দিগের একজন।" হিন্দুশাস্ত্রে এরূপ কোন উক্তি দেখিতে পাই না; হিন্দু সমাজেরও অন্য ধর্ম্মকে প্রবেশ করাইবার প্রশস্ত পথ নাই। হিন্দুর ইহাই ইচ্ছা যে, মুসলমান উত্তম মুসলমান হন, খ্রীষ্টান উত্তম খ্রীষ্টান হন, হিন্দু উত্তম হিন্দু হন। এ সম্বন্ধে মহর্ষি ব্যাস গীতায় বলিয়াছেন—

"শ্রেয়ান স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ"
"স্বভাব নিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষং"

মনু বলিয়াছেন,

"যেনাস্য পিতরোজাতা যেন যাতা পিতামহা
তেন যায়াৎ সতাংমার্গং তেনগচ্ছন্নরিষ্যতি।"

অর্থাৎ পিতৃ পিতামহগণ যে পথে গমন করিয়াছেন, সে পথে গেলে কেহ দোষ ভাগী হয় না। স্বধর্ম্ম ত্যাগ দ্বারা স্বজনের মনস্তাপ সংঘটন করিবার বিশেষ কোন আবশ্যক দেখা যায় না। এবিষয়ে ব্যাস বলেন,—

"সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ
সর্ব্বারম্ভাহি দোষেণ ধূমেনাগ্নি রিবাবৃতঃ।"

মানুষ লইয়া টানাটানি করাটা নিশ্চয়ই কলুষিত কালের লক্ষণ; এক্ষণ নিজে বুঝিবার অপেক্ষা অন্যকে বুঝাইবার আবশ্যক অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। নিজের মুক্তিলাভ হইয়া গিয়াছে, এক্ষণ যেন কেবল অন্যকে মুক্ত করিতে পারিলেই কার্য্য সমাধা হয়, পাদরীদিগের উদ্দেশ্য এই কি? না, ইহার নাম রাজনৈতিক-ক্ষেত্রের সহিত ধর্ম্মক্ষেত্রের একীকরণ! ঈশ্বর লইয়া যুদ্ধ হইলে যাহারা ন্যূন সংখ্যক, তাহারা পরাস্ত হইয়া নিরীশ্বর হইয়া যাইবে, এ ভয় নয় ত? কেমন করিয়া জ্ঞানবান্ লোকেরা এরূপ কার্য্যের অনুমোদন করেন, তাহা আমরা বুঝিনা; আমরা উত্তম স্বধর্ম্ম নিরত লোক দেখিলেই আনন্দিত হইতে ইচ্ছা করি এবং ধর্ম্ম-বিরোধ একেবারে পরিত্যাগ করিয়া সকলে একস্বরে বলিতে চাই, "সত্যং পরং ধীমহি।"

শ্রীগণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়॥

চৈতন্যচরিত চৈতন্যধর্ম্ম। (৩৪শ)

(সন্ন্যাসান্তে)

এই পরিচ্ছেদের লিখিত বিবরণে বৈষ্ণব গ্রন্থকারদিগের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য মঙ্গল ও ভক্তি-রত্নাকর গ্রন্থে যেরূপ বর্ণিত আছে, চৈতন্য-চরিতামৃত ও চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের বৃত্তান্ত তাহা অপেক্ষা কিছু বিভিন্ন। আমরা প্রথমোক্ত গ্রন্থকারদিগের অনুবর্ত্তী হইয়া বক্তব্য বিষয় বলিয়া পরে শেষোক্ত গ্রন্থ দ্বয়ের মত ব্যক্ত করিব।

সন্ন্যাসের নিশা প্রেমানন্দে অতিবাহিত হইল। গৌরের প্রেমতরঙ্গে পড়িয়া কঠোর বৈরাগী ভারতী গোঁসাইও নাকি কাঁদিয়া বিভোর হইলেন; তাঁহার দণ্ড কমণ্ডলু কোথায় পড়িয়া রহিল; গুরু শিষ্যে হাত ধরাধরি করিয়া, কখন কোলাকুলি করিয়া নাচিয়া কৃষ্ণানন্দে বিভোর হইলেন। শীত কালের দীর্ঘযামিনী কোন দিক দিয়া পোহাইয়া গেল, কেহ টের পাইলেন না। রজনী প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্নের পাদবন্দনা করিয়া বলিলেন, "পিতঃ আপনি নবদ্বীপে গমন করুন, আমার শোক-বিহ্বলা জননী ও প্রাণের বন্ধুবর্গকে আমার সন্ন্যাসের কথা বলিয়া বলিবেন, "যে যদিও কর্ত্তব্যপালন জন্য আমি বনগমন করিতেছি, তথাচ তাহাদের অন্তর হইতে আমি কখনই দূরে থাকিতে পারিব না। আর আপনি, আমার পিতা যখন স্মরণ করিবেন, আমার দেখা পাইবেন।" আচার্য্যরত্নাদি শোকবিহ্বলচিত্তে কাঁদিতে কাঁদিতে নবদ্বীপ অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং দিবাবসান সময়ে শচীগৃহে উপনীত হইয়া বৈষ্ণবমণ্ডলী সমক্ষে সর্ব্বকথা খুলিয়া বলিলেন। গৌরের গমন হইতে এই তিন দিন পর্য্যন্ত নবদ্বীপ-নগর বিষাদ ধাম হইয়াছে। ভক্তমণ্ডলী মৃতকল্প শচী মাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া গৌরগুণকীর্ত্তন করিয়া কতই কাঁদিতেছেন। মা শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়া অচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া আছেন, প্রভাত সময়ে গৌর যাইবার সময় বাড়ীর অবস্থা যেরূপ ছিল, সেইরূপ সকল বাসি হইয়া পড়িয়া আছে, তিন দিন পর্য্যন্ত কেহ জলবিন্দু স্পর্শ করেন নাই। এক্ষণে আচার্য্যরত্নের কথায় তাঁহাদের শোকাবেগ শতগুণ বৃদ্ধি হইল এবং নানাভাবে সকলে রোদন করিতে লাগিলেন। অদ্বৈতপ্রমুখ ভক্তগণ শোকে আত্মহারা হইয়া জীবনান্ত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। পরক্ষণেই প্রত্যাদিষ্ট হইলেন যে আত্মহত্যারূপ পাপে নিমগ্ন হইবেনা। অল্প সময় মধ্যেই গৌরের সঙ্গে পুনর্মিলন হইবে। তখন তাঁহারা আপনাদের ভীষণ প্রতিজ্ঞা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। এইরূপে বিষাদের কালিমায় নবদ্বীপের আকাশ ছাইয়া ফেলিল। দুঃখ বিষাদে মগ্ন হইয়া ভক্ত-মণ্ডলী কালের কুটিল গতির দিকে চাহিয়া থাকিলেন।

এ দিকে আচার্য্যরত্নকে বিদায় দিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বনগমনে উদ্যত হইলেন। ভারতী গোস্বামী গৌরের প্রেমমন্ত্রে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহার গমনোদ্যোগ দেখিয়া বলিলেন "আমিও তোমার সঙ্গে যাইব। এখানে একাকী থাকিয়া কি করিব? তোমার সঙ্গে সংকীর্ত্তনানন্দে সুখে দিন কাটিয়া যাইবে। প্রেমানন্দের কণা পাইলে আর শুষ্ক জ্ঞান যোগ ভাল লাগেনা।" গৌরচন্দ্র অনুমতি দিলে অগ্রে ভারতী মধ্যে নূতন সন্ন্যাসী, পশ্চাতে নিত্যানন্দ মুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ পশ্চিমা-ভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। গৌর তখন নবজীবনের নবভাবে বিভোর। পিঞ্জরাবদ্ধ পাখী যেমন পিঞ্জর হইতে বাহির হইতে পারিলে প্রমুক্ত আকাশে সুখপূর্ণ উৎসাহে বিচরণ করিতে থাকে, তেমনি সংসার পিঞ্জর কাটিয়া গৌর-পাখী আজ ব্রহ্মাণ্ডের সুপ্রশস্ত পথে বাহির হইয়াছেন, সংকীর্ণতার নীচ সীমা

আজ তাহার পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে, প্রাণে অসীম অনন্তের ছায়া পড়িয়াছে, প্রেমের জলন্ত অনল ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে, এবং এত দিনে প্রাণ নাথের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিতে পারিবেন বলিয়া আনন্দসাগরে বুক ভাসিয়া যাইতেছে, গৌর আত্মহারা হইয়া ভাগবতের নিম্নোক্ত শ্লোক পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে লাগিলেন,—

এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা
মধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহদ্ভিঃ
অনন্তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাং ঘ্রিনিষেবয়ৈব।"

পূর্ব্বতন মহাত্মাদিগের অবলম্বিত পরমাত্ম নিষ্ঠা আশ্রয় করিয়া মুকুন্দ চরণ সেবা দ্বারা আমি দুস্তর অন্ধকার উত্তীর্ণ হইব।"

ভ্রাতৃগণ। সংসার মোহ উত্তীর্ণ হইতে হইলে পূর্ব্বতন মহর্ষিদিগের অবলম্বিত পরমাত্ম নিষ্ঠাই সার। পরমাত্মাতে নিষ্ঠা স্থাপিত না হইলে তাঁহার চরণ সেবার অধিকার জন্মে না। অতএব তোমরা এখন অনুমতি কর, আমি নিভৃতে যাইয়া পরমাত্মনিষ্ঠা অভ্যাস করি। "এই বলিয়া অনুরাগ ভরে গৌরচন্দ্র দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন। বন্ধুগণও তাঁহার সঙ্গে ছুটিয়া চলিলেন। এদিকে অপরূপ মুরতি নূতন সন্ন্যাসী দেখিয়া নগরের বহু সংখ্যক নর নারী তাঁহাদের অনুগমন করিতে লাগিলেন এবং গৌরের তৎকালের জলন্ত বৈরাগ্য ও প্রেম অবলোকন করিয়া তাঁহার মাতা পত্নীর কথা স্মরণ করিয়া কত রূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন; গৌরচন্দ্র তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া অতি মধুর ভাবে নিম্নলিখিত উপদেশ দিলেন।

"ভাই সব। গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া গৃহ ধর্ম্মে মনোযোগ কর। কিন্তু দেখো—যেন সংসারে আসক্ত হইও না। পবিত্র কর্ত্তব্য জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে সকল ধর্ম্ম সমারম্ভ কর। অনুদিন হরি নাম সংকীর্ত্তন কর এবং কৃষ্ণ গত প্রাণ হও। আমি প্রার্থনা করি, শুকাদির ও দুর্ল্লভ প্রেম যেন তোমাদের লাভ হয়।" লোক সকল প্রেমানন্দে গদ গদ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া চলিল।

দেখিতে দেখিতে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বন্ধুগণ রাঢ় ভূমিতে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। রাঢ়দেশের উচ্চ ভূমি সকল পরম সুন্দর, সুপ্রশস্ত প্রস্তরের চারিদিকে অশ্বত্থবৃক্ষরাজি সারি সারি শোভা পাইতেছে, গাভীগণ মহানন্দে বিচরণ করিতেছে দেখিয়া গৌরের বৃন্দাবন ভাবাবেশ হইল এবং মত্ততার সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। মুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ কীর্ত্তন জুড়িয়া দিলেন। নাচিতে নাচিতে প্রভু বলিলেন, বক্রেশ্বর যে বনে তপস্যা করিতেছেন, আমি সেইখানে যাইয়া নিভৃতে কৃষ্ণনাম করিব। এই বলিয়া নবসন্ন্যাসী উদ্ভ্রান্ত নৃত্য কীর্ত্তন করিতে করিতে পশ্চিমাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। বেলা অবসান হইল দেখিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে লইয়া এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আতিথ্য স্বীকার করিলেন, এবং কিছু জলযোগান্তে সকলে গৌরকে বেষ্টন করিয়া ব্রাহ্মণের বাহির বাড়ীতে শয়ন করিয়া থাকিলেন। রজনী তৃতীয় প্রহরের সময় নিত্যানন্দ জাগরিত হইয়া দেখেন, গৌরচন্দ্র শয্যায় নাই। অত্যন্ত ব্যস্তমনা হইয়া তিনি আর আর সঙ্গীদিগকে জাগাইলেন এবং সকলে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাঁহার

অন্বেষণে বাহির হইলেন। গ্রামখানি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া তাঁহারা প্রান্তর ভূমিতে গমন করিলে নৈশ নিস্তব্ধতাভেদ করিয়া সুদূর হইতে বিলাপযুক্ত রোদনধ্বনি তাঁহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। শব্দ তত সুস্পষ্ট না হইলেও তাঁহারা গৌর কণ্ঠবিনির্গত বলিয়া তাহারা বুঝিতে পারিলেন এবং শব্দানুসারে গমন করিয়া লক্ষ্যস্থানে উপস্থিত হইলেন। প্রভাতীয় ক্ষীণালোকে ভক্তগণ দেখিতে পাইলেন, নির্জ্জন প্রান্তর ভূমিতে বসিয়া সেই নবীন সন্ন্যাসী চক্ষের জলে বুক ভাসাইয়া "কৃষ্ণরে প্রভুরে ওরে কৃষ্ণ মোর বাপ" বলিয়া কাঁদিতেছেন, তাহার গভীর বিলাপধ্বনি নৈশ আকাশে প্রতিধ্বনিত হইয়া দিক্‌মণ্ডল কাঁপাইয়া তুলিতেছে ; এবং সাক্ষাৎ বৈরাগ্য প্রতিমূর্ত্তি ধরিয়া যেন তাঁহার রক্ষায় নিযুক্ত আছে। ভক্তগণ তাঁহার তদানীন্তন শোকে বিষাদের ভাব দেখিয়া কাঁদিয়া ব্যাকুল হইলেন। মুকুন্দ অবসর বুঝিয়া মধুর কণ্ঠে সংকীর্ত্তন গাইতে আরম্ভ করিলেন। রসময় হরিনাম শুনিবা মাত্র গৌরের ভাব পরিবর্ত্তন হইল। তিনি অমনি উঠিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। এই রূপে গাইতে গাইতে, নাচিতে নাচিতে এই অপূর্ব্ব ভক্তগণ ক্রমাগত পশ্চিমাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। হরি সংকীর্ত্তন কাহাকে বলে, তখন কেহ জানিত না। যে গ্রামের পথ দিয়া যাইতে লাগিলেন, নরনারী সকল অবাক্ হইয়া তাঁহাদের ভাব গতিক দেখিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের কথা লইয়া গ্রামে গ্রামে কতই আন্দোলন চলিতে লাগিল। এই রূপে রাঢ় দেশ ধন্য করিয়া বিশ্বম্ভর বক্রেশ্বরের আশ্রমাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। চারিক্রোশ মাত্র পথ অবশিষ্ট আছে, হঠাৎ তাঁহার গতি ফিরিল। যাইতেছিলেন পশ্চিমাভিমুখে, হঠাৎ পূর্ব্বাস্য হইলেন। সঙ্গীগণ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর করিলেন, আমাকে নীলাচলে যাইতে হইবে; জগন্নাথ প্রভুর আদেশ হইয়াছে যে শীঘ্র নীলাচলে চল। ভক্তগণ তাহা শুনিয়া পরম সুখী হইলেন। পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে, যখন ইতি পূর্ব্বে পুত্রের সন্ন্যাস গ্রহণের কথা শুনিয়া শচী মাতা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, সন্ন্যাসান্তে তিনি কোথায় থাকিবেন। গৌর তখন জননীকে কিছু ঠিক করিয়া বলিতে পারেন নাই, এই মাত্র বলিয়াছিলেন যে, তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, জননীরে মধ্যে মধ্যে দেখা দিয়া যাইবেন, বিশ্বরূপের ন্যায় নিরুদ্দেশ হইয়া যাইবেন না। ভগবদ্ভক্ত মহাত্মাদিগের এই এক বিশেষ লক্ষণ দেখা যায় যে, তাঁহারা চিরদিনই প্রিয়তমের শ্রীমুখের আজ্ঞার আজ্ঞাকারী। সেই আজ্ঞায় মরিতে হয়, সেও ভাল, তথাচ পৃথিবীর কথায় সহস্র লাভ হইলেও তাহারা তাহা মানিতে প্রস্তুত নহেন। এক মাত্র ভগবদাদেশেই ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ জীবনান্তকারী বিপদকেও গ্রাহ্য করেন নাই। মহর্ষি ঈশা বুক পাতিয়া ক্রুশের আঘাত লইয়াছিলেন। আর তাহাতেই গৌরকে পথের ভিখারী করিল। যাহা হউক, প্রত্যাদেশের অভ্রান্তবাণী আজ তাঁহার ভবিষ্যতের বাসস্থান যেই নির্ণয় করিয়া দিল, অমনি মত্ত মাতঙ্গের গতি ফিরিল। মেষ শিশুর ন্যায় আদেশের নির্দ্দেশানুসারে তিনি গঙ্গাভিমুখে প্রতি নিবৃত্ত হইলেন। পথিমধ্যে গ্রামবাসীদিগের কাহারও মুখে হরিনাম না শুনিয়া গৌরের হৃদয় বড় ব্যথিত হইল। তিনি বলিলেন,

"এই কয়েকদিন যাবত এই দেশে বেড়াইতেছি, কিন্তু হায়! কাহারও মুখে একবার "কৃষ্ণ হেন নাম" শুনিতে পাইলাম না. কি পরিতাপের বিষয়"। এই ভাবে যাইতে যাইতে গৌরচন্দ্র সঙ্গীদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া কিছু অগ্রগামী হইলেন এবং ধ্যানানন্দে বিভোর হইয়া গভীর সমাধি অবলম্বন পূর্ব্বক এক স্থানে যাইয়া নিমীলিত নেত্রে নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। তাঁহার সঙ্গীগণ নিকটবর্ত্তী হইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া গেলেন। তাহারা দেখিলেন, কয়েক জন গরুর রাখাল স্তিমিত নেত্র বিশ্বম্ভরকে বেষ্টন করিয়া হরিবোল বলিয়া হাতে করতালি দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতেছে। মধ্য স্থানে দাঁড়াইয়া চৈতন্য প্রভু নামানন্দে ভাসিতেছেন। তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইলে এই ব্যাপার দেখিয়া মহাসুখী হইলেন এবং দেশবাসীদিগের মুখে হরিনাম না শুনিয়া তাঁহার প্রাণে যে কষ্ট হইয়াছিল, তাহা অপনীত হইল। সহাস্য মুখে গৌরচন্দ্র রাখাল বালকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখান হইতে গঙ্গা কত দূর?" বালকগণ উত্তর করিল এক প্রহরের পথ।

গঙ্গা নিকটবর্ত্তী শুনিয়া গৌরচন্দ্র গঙ্গাবগাহনের জন্য দৌড়িতে লাগিলেন। সঙ্গের ভক্তগণ কেহ তাঁহার সঙ্গে চলিয়া উঠিতে পারিলেন না। কেবল নিত্যানন্দ তাঁহার দেহ রক্ষায় ব্যগ্র হইয়া কোন মতে মতে তাঁহার সঙ্গে যাইতে পারিলেন। প্রায় সন্ধ্যাসময়ে উভয়ে গঙ্গাতীরে পৌঁছিলে গৌরচন্দ্র মনের সাধে অবগাহন উদর পুরিয়া গঙ্গাজল পান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। গঙ্গা দর্শনে তাঁহার প্রেমাবেগ প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি গঙ্গার স্তব পড়িতে পড়িতে প্রেমে বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। "ব্রহ্মরূপের দ্রবভাবরূপিনী গঙ্গে, তোমার জল প্রেমরস স্বরূপ, উহা পানে স্নানে অশেষ পাপ দূরীভূত হইয়া কৃষ্ণ প্রেম লাভ হয়। জগতের মঙ্গলের জন্যই তোমার মর্ত্ত্যে আগমন।" ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়া কেনা গঙ্গার ভাবে মুগ্ধ হইয়াছে। প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ হইবেন না কেন? নিত্যানন্দের সহিত গৌর সেই নিশা সে গ্রামে যাপন করিলে প্রভাতে অনুবর্ত্তী ভক্তগণ আসিয়া মিলিত হইলেন। তখন গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন "নিতাই! আমার বিরহে মা ও শ্রীবাসাদি ভক্তমণ্ডলী ম্রিয়মান হইয়া আছেন; তুমি শীঘ্র নবদ্বীপে গমন করিয়া তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত কর এবং আমার আগমন সংবাদ দিয়া বলিও যে আমি তাঁহাদের দর্শনাপেক্ষায় শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে অবস্থিতি করিতেছি। এখান হইতে শান্তিপুর বেশী দূর নয়, আমি গঙ্গা পার হইয়া ভক্ত হরিদাসের আশ্রমে ফুলিয়া নগর দর্শন করিয়া শান্তিপুরে যাইব। তুমি ইতি মধ্যে নবদ্বীপ হইতে মা ও বন্ধুদিগকে লইয়া আচার্য্য ভবনে আগমন করিও।" এই বলিয়া সকলে একত্রে গঙ্গা পার হইলেন এবং নিত্যানন্দকে নবদ্বীপে পাঠাইয়া গৌরচন্দ্র ফুলিয়া অভিমুখে চলিয়া গেলেন।

এই তো গেল চৈতন্যভাগবত গ্রন্থকার প্রমুখ গ্রন্থকারদিগের মত। ইহাদিগের মতে সন্ন্যাসযাত্রা হইতে এপর্য্যন্ত দ্বাদশ দিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে চরিতামৃতে ও চন্দ্রোদয় নাটকে কিছু অন্যরূপ বর্ণনা দেখা যায়। চরিতামৃতের মতে

সন্ন্যাস গ্রহণান্তে প্রেমে উন্মত্ত হইয়া গৌরচন্দ্র বৃন্দাবনে যাইবার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। পশ্চাতে নিত্যানন্দ, আচার্য্য-রত্ন ও মুকুন্দ এই তিনজন মাত্র অনুগমন করিলেন। কবি কর্ণপুর বলেন যে, সঙ্গে কেবল মাত্র নিত্যানন্দই ছিলেন; আচার্য্য রত্নকে পূর্ব্বেই বিদায় করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। মহাপ্রভু প্রেমে আত্মহারা হইয়া তিন দিন দিবা রাত্রি রাঢ় দেশের মধ্যে দৌড়িয়া বেড়াইয়া ছিলেন। গোপবালকদিগকে বৃন্দাবনে যাইবার পথ জিজ্ঞাসা করিলে, নিত্যানন্দের শিক্ষামত তাহারা তাঁহাকে গঙ্গাতীরের পথ দেখাইয়া দিয়াছিল। চরিতামৃতকার বলেন যে, এইখানে নিত্যানন্দ আচার্য্যরত্নকে নবদ্বীপে পাঠাইয়া বলিয়া দিলেন যে, "শচীমাতা ও ভক্তগণকে লইয়া তিনি শান্তিপুরে অদ্বৈত-ভবনে যাইবেন। আমি কোন রূপে প্রভুকে ভুলাইয়া তথায় গমন করিব।" এইরূপে আচার্য্য-রত্নকে বিদায় দিয়া নিত্যানন্দ প্রেম-মুগ্ধ গৌরচন্দ্রের সম্মুখে যাইয়া দর্শন দিলেন। গৌর বিস্মিতের ন্যায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "শ্রীপাদ গোঁসাই! আপনি কোথায় যাইবেন?"

নিত্যানন্দ উত্তর করিলেন "তোমার সঙ্গে বৃন্দাবনে যাইব।"

জিজ্ঞাসা— বৃন্দাবন কত দূরে?

"এই যমুনা দর্শন কর" বলিয়া নিতাই গৌরকে গঙ্গাতীরে আনিলেন: এবং কোন আগন্তুককে দেখিতে পাইয়া তাহাদের আগমন-সংবাদ অদ্বৈতের সমীপে প্রেরণ করিলেন। এদিকে গৌরচন্দ্র পূর্ব্বোক্ত প্রকারে গঙ্গাকে যমুনা জ্ঞান করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। এবং স্নান মার্জ্জন করিয়া আর্দ্র কৌপিনে নাম কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইতি মধ্যে অদ্বৈতাচার্য্য সবান্ধবে নূতন কৌপিন বহির্ব্বাস লইয়া নৌকারোহণে আগমন করিয়া নবীন সন্ন্যাসীর রূপ ও ভাবমধুরী দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। গৌরচন্দ্র অদ্বৈতকে তদবস্থায় দেখিয়া বিস্মিতের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচার্য্য, আমি বৃন্দাবনে আসিয়াছি, তুমি কেমন করিয়া জানিলে?"

অদ্বৈত ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "প্রভু! তুমি যেখানে, সেই বৃন্দাবন। আমার সৌভাগ্য, তোমার আমার দেশের গঙ্গাতীরে আগমন হইয়াছে।" এই বলিয়া আচার্য্য কাঁদিতে কাঁদিতে গৌরকে শুষ্ক কৌপীন পরাইয়া দিলেন। বিশ্বম্ভর বলিলেন, "বুঝিয়াছি, নিত্যানন্দ আমাকে বঞ্চনা করিয়া যমুনা দর্শনচ্ছলে এই গঙ্গাতীরে আনিয়াছেন"।

অদ্বৈত বলিলেন, "শ্রীপাদের কথা মিথ্যা নয়। যুক্ত বেনী প্রয়াগ হইতে গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী তিনে সম্মিলিত হইয়া এক ধারে প্রবাহিত হইতেছে, তন্মধ্যে গঙ্গার মধ্যে সরস্বতী পূর্ব্বে ও যমুনার ধারা পশ্চিমে প্রবাহিত হইতেছে। তুমি যখন সেই পশ্চিম পারে অবগাহন করিয়াছ, তখন যমুনায় স্নান করা হইয়াছে। চারি দিন উপবাসী রহিয়াছ, এক্ষণে এই নৌকায় গঙ্গা পার হইয়া আমার বাড়ীতে এক মুঠা রুক্ষা শুকা ভাত খাইতে হইবে।

নিতাই হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিলেন "রুক্ষা শুকার কর্ম্ম নয়। চারি চারি দিন উপবাসী আছি, ভোজনের আয়োজনটা ভাল না হ'লে তোমার বাড়ী যাওয়া হইবে

না।” অদ্বৈত পরিহাস করিয়া বলিলেন, “কেন তোমার আবার উপাস কিসের? যেখানে যাও, তোমার পূজা না হলে কি ছাড়।”

নিতাই উত্তর করিলেন “আর পেটপূজা! উনি না হয় হরি-প্রেমরস পানে ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করেছেন, আমার তো আর রস কস নাই, আমি কি খেয়ে বাঁচি বল দেখি? উনি দণ্ড নিয়ে দিন রাত্রি মাঠে মাঠে ঘুরছেন, আমার এ কি দণ্ড যে আমি না খেয়ে না শুয়ে পেছে পেছে ঘুরে মরি।”

অদ্বৈত মনে মনে নিত্যানন্দের অকৃত্রিম ও সরল সৌহার্দ্দ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিলেন “এখন চল্ বামনা পেটে পিটে যাহা যেখানে হয় খেতে পাইবি এখন।” এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে সকলে গৌরকে লইয়া নৌকারোহণে পর পারে চলিয়া গেলেন। এ বৃত্তান্তে ফুলিয়া যাইবার কথা নাই। এবং সন্ন্যাস হইতে শান্তিপুরে আগমন পর্য্যন্ত চারি দিন রাত্রি অতিবাহিত হইয়াছে।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

ব্যষ্টি না সমষ্টি।

“Ich dien.”* “আমি সেবক।”

হঠাৎ দেখিলে বোধ হয়, ইউরোপ ব্যক্তিত্ব-প্রধান ও ভারত সমাজপ্রধান দেশ; কিন্তু একটু ভিতরে প্রবেশ করিলেই ঠিক বিপরীতভাব নয়নগোচর হয়। একান্নবর্ত্তী পরিবারাদি নানাপ্রকার বাহিক বন্ধনের চিহ্ন থাকা সত্ত্বেও কঠোর অন্যায় সামাজিক দৌরাত্ম্যের অধীনস্থ ভারত সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিত্বপ্রধান, নিজকে লইয়াই সবাই ব্যস্ত, অপরের কথা ভাবিবার অবকাশ নাই; ইউরোপে সব রকমে ষোলআনা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সহিত আবাল বৃদ্ধ বনিতা আপনার আপনার পায়ের উপর দাঁড়াইয়া থাকিলেও, সমাজের জন্য, দেশের জন্য, এমন কি সময়ে সময়ে পৃথিবীর সীমান্তবস্থিত পরদেশী জনসমাজের হিতের জন্য বিস্তর লোক প্রাণ দিতে প্রস্তুত। সমগ্র মানবজাতির, অন্ততঃ অধিকাংশের অপারগমানে দেশের, নিতান্ত পক্ষে আপন সমাজের কল্যাণ সাধন প্রত্যেক জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত; সরল-জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেচনানুসারে যথাসাধ্য ঐ পথে চলা আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য।

অনেকে বলেন, ধর্ম্মের (formulated

---

* প্রিন্স অব্ ওয়েল্সের শিরোভূষণে “ইশ ডীন” এই দুইটী জর্ম্মান শব্দ উজ্জ্বল অক্ষরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমাদের দেশের এক জন সাধারণ ধনী এরূপ বাক্য কখন সহ্য করিবেন না— “আমি সেবক? আমি চাকর? ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ আমার সেবায় রত, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল আমার পদতলে, আমি আবার কাহার সেবক হইব?”—বাবুর কথা এই। আর পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান সাম্রাজ্যের ভাবী সম্রাট ‘সংসারের সেবক’ বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হওয়া দূরে থাকুক, পরম গৌরব বোধ করেন। পূর্ব্ব পশ্চিমে এতই তফাৎ।

religion) শাসনাভাব হইলে মানব আপন আপন পাশব প্রবৃত্তি অনুসারে যথেচ্ছাচারী হইবে, পরস্পরে গলাকাটাকাটি করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিবে না; সুতরাং যেমন তেমন একটা ধর্ম্মের ভয় ব্যতীত ঠিক রাখিতে পারা সম্ভব নয়। অপরদিকে বহু সমাজতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের মত যে, অনৈসর্গিক অমানুষী শক্তির কল্পনা দ্বারা শাসনের কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না, কঠোর প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী সমাজ আপনার অবস্থা আপনি করিয়া লইবে, যাহারা সাধারণের ক্ষতি করিয়া বা অশান্তি জন্মাইয়া আপনাদের নিকৃষ্ট স্বার্থপরতা চরিতার্থ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না, বা চেষ্টা পাইবে, তাহাদের দমন বা দূরীকরণ অবশ্যম্ভব। ইঁহারা বলেন, কেবল পুণ্যপ্রতাপ জাতীয় সমুন্নতির একমাত্র কারণ, (Righteousness alone exalteth a nation), যে সমাজে পরস্পরের মধ্যে অসদ্ভাব, অপ্রত্যয়, হিংসা, দ্বেষ, যেখানে হিতের জন্য কোন একটী সামান্য স্বার্থও ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নয়, এমন ভীরু, হীন, জঘন্য-স্বার্থপরতার দুর্গন্ধময়-অন্ধকূপস্বরূপ, আত্মঘাতী সমাজের বিনাশ অনিবার্য্য। যদি কোথাও অত্যন্ত দূষিত কদর্য্য সমাজ বিদ্যমান দেখা যায়, স্থির জানিতে হইবে, উহা দ্বারা অলক্ষিত ভাবে কোন শুভ উদ্দেশ্য সংসাধিত হইতেছে, নতুবা এতদিন নিশ্চয় লোপ পাইত। চোরেরও ন্যায়বোধ ও কর্ত্তব্যজ্ঞান আছে। প্রত্যহ নরশোণিতে কলঙ্কিতহস্ত মহাপাপগ্রস্ত সুবিখ্যাত দস্যু রত্নাকরের পাষাণসম কঠিন হৃদয়েও বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্যজ্ঞান এরূপ দৃঢ় ছিল যে, কেবলমাত্র তাহাদেরই জন্য এতাদৃশ নৃশংস কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। অপরের সঙ্গে সম্যকপ্রকারে সম্বন্ধ-বিরহিত নির্লিপ্তাবস্থার এরূপ সম্ভবে না। আমার উপর যাহাদের দাবী আছে; এমন কতকগুলি লোকের সঙ্গে সংস্রব ব্যতীত নিরবচ্ছিন্ন স্বতন্ত্রভাবে আমার ব্যক্তিত্ব সম্যক উপলব্ধি করিতে পারা অসম্ভব। ঈশ্বর * ভিন্ন সমস্তই আপেক্ষিক, সুতরাং অন্যের সহিত তুলনা বা সম্বন্ধ ব্যতিরেকে কোন বিষয়ের নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না। ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, মত-বিশ্বাসের ধর্ম্ম সংসার হইতে একেবারে গেলে কতকগুলি পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী,— অনেক বিষয় যাহা দৃঢ় সংস্কার বশত এখন ঘৃণার চক্ষে দেখি, তখন নির্দ্দোষ বলিয়া বোধ হইবে; যে কার্য্যের দ্বারা কাহারও কোন প্রকার অসুখ বা ক্ষতি হয় না, অথচ কেবল একটা ভ্রান্তমত ও অন্ধবিশ্বাস হেতু এখন দোষের বলিয়া বোধ হয়, সেগুলি তখন কাহারও আপত্তির বিষয় হইবে না, বরং অনেক সময় প্রয়োজনীয় বোধ হইবে। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, খ্রীষ্ট, পল, নানক, চৈতন্য প্রভৃতিকে তাঁহাদের জগৎ পূজ্য মহোচ্চপদ হইতে নীচে নামাইবার কোন কারণ উপস্থিত হইবে না, কিন্তু বুদ্ধ, কপিল, মিল, কোমৎ, ক্রশো, স্পাইনোজা প্রভৃতিকে নাস্তিক বলিয়া সংসার এখন যে ভাবে দেখিতেছে, তদপেক্ষা

* শাস্ত্রকারগণ বলেন, ঈশ্বর আপনাকে ব্যক্ত করিবার জন্য বিশ্ব সৃষ্টি করেন। যখন একাকী ছিলেন, তখন ব্যক্তিত্বহীন অব্যক্তাবস্থা। আপন আনন্দে আপনি ভাসিতেছিলেন, জীবকে সঙ্গী ও অংশী করিয়া সুখী হইলেন। (যদিও এমতে অনেক তর্ক উপস্থিত হইতে পারে।)

অনেক উন্নত ও পূজার্হ বলিয়া স্বীকার করিতে দ্বিধা করিবে না। একমাত্র সামাজিক হিতল্ল সম্বন্ধে (the greatest good for the largest number) উপযোগীতানুসারে নির্ব্বিশেষে সকল কার্য্যের বিচার সংসারে বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। যাহারা সমাজে অশুভ বা অহিত কার্য্য করিবে, তাহাদের সংশোধন চেষ্টা প্রথম, পরে সমাজের মর্য্যাদা ও জীবন রক্ষার্থ, যে কোন উপায়ে হউক, সম্যকশাসন সমুচিত। বিলক্ষণ দেখা গিয়াছে, যে জাতি বা সমাজ দ্বারা সংসারে ক্রমাগত অমঙ্গল আনীত হইয়াছে, তাহার অনিবার্য্য পরিণাম ধ্বংস, তাহার পরিষ্কার ধর্ম্মমত থাকুক, এবং ব্রত, নিয়ম, যাগ, যজ্ঞাদি বাহ্যিক ক্রিয়া কলাপের ঘটা যতই হউক, কিছুতেই তাহাকে রক্ষা করিতে পারে নাই; কারণ, একজনের জন্য দশজন ভুগিতে পারে না, এই উৎকৃষ্ট নিয়ম পৃথিবীর আদি কাল হইতে সমান তেজের সহিত ক্রিয়া করিয়া আসিতেছে।

অনেক ধর্ম্ম-প্রচারক, ধর্ম্ম-যাজক এবং ইহলোক ফেলিয়া রাখিয়া পরলোকের জন্য ব্যস্ত ধর্ম্মব্রতধারী মহোদয় বলেন যে, ঈশ্বরপূজা অর্থাৎ, কেবল ধ্যান ধারণা জপ তপাদি, আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য ; তাহা সারিয়া সময় থাকিলে মানুষের সেবা, জীবের প্রতি প্রেম ইত্যাদি অনাবশ্যকীয় বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া যাইতে পারে। নচেৎ আত্মার মুক্তির জন্য ও সকল ছোট কাজ সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। প্রভু [illegible] তাঁহার প্রিয় সাধুসন্তানগণ দ্বারা বারম্বার সংসারে প্রচার করিয়াছেন, "জীবে দয়া, নামে রুচি, মানব-সেবা, তিন এক রূপে চাই, কোনটী কম হইলে চলিবে না"। "আমার এই ক্ষুদ্র সন্তানগুলির মধ্যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকরটীর প্রতি যদি কোন প্রকার ত্রুটি হইয়া থাকে, তাহা আমার প্রতি হইয়াছে জানিবে"। "যে তাহার ভ্রাতাকে ভালবাসিতে না পারে, যাহাকে চর্ম্ম চক্ষুতে নিয়ত দেখিতেছে ; কি প্রকারে ঈশ্বরকে প্রেম করিবে, যিনি কখন তাহার নয়নগোচর হন নাই?" এই সকল ভগবান বাক্য দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, ঈশ্বর-দাস্য ও মনুষ্য-সেবা অভিন্ন ;—যে ভগবদ্ভক্তি উর্দ্ধ হইতে নীচে নামিয়া নরলোকের পরিচর্য্যায় রত না হয়, তাহা অসম্পূর্ণ, অসার, অলীক ; এবং যে ভ্রাতৃসেবা পৃথিবী হইতে উচ্চে উঠিয়া স্বর্গীয় পিতার আরাধনায় পরিণত না হয়, তাহাও অপূর্ণ, ভ্রান্ত, অশুদ্ধ।

ইহ জীবনে কোনই ফল নাই, এ কথা দুই জনের মুখে বেশ সাজে, পরিতৃপ্ত অথচ অসন্তুষ্ট ভোগবিলাসান্বেষী এবং ত্যাগী বাতাতপ-সহিষ্ণু সন্ন্যাসী। প্রথম ব্যক্তি বলেন, বিলাস ভাল কিন্তু বড় শীঘ্র ফুরাইয়া যায়, সুখটুকু উত্তপ্ত পারদের ন্যায় অন্তর্হিত হইয়া শেষ হিসাবে দুঃখের ভাগ বেশী দাঁড়ায় ; সুতরাং জীবন অসুখ ও অমঙ্গলের কারণ মাত্র। বিরক্ত বৈরাগী, বিলাসীর সমস্ত কথা স্বীকার করিয়া উপরান্ত বলেন, এ শরীরে যখন বাসনা তৃপ্তির কোন সম্ভাবনা নাই, তখন ইহাকে কষ্ট দিয়া ভবিষ্যতের আশা রাখাই যুক্তি-সঙ্গত। ক্ষুদ্রতা বশত ব্যক্তিত্বের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে দেখিবার অসামর্থ্য হেতু উভয়ের এরূপ সঙ্কুচিত ও অসঙ্গত মত ; ছোট বড় সর্ব্ব প্রকার বাসনার সম্বন্ধ যে সমাজের সঙ্গে, ব্যক্তির সঙ্গে নয়, ইহা দুই জনেরই লক্ষ্য নাই।

স্থূল দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে সংসারে সুখাপেক্ষা দুঃখের ভাগ অনেক বেশী বোধ হয়। তাই কবি গাইয়াছেন,

"Count o'er the joys thine hours have seen
Count o'er thy days from anguish free
And know whatever thou hast been,
'T is something better not to be."

কবি কেন? চিন্তাশীল মানুষ মাত্রেই দৈনিক হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর বিশ্রাম কালীন চারিদিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করেন, "এত খাটিয়া কি লাভ হইয়াছে?" প্রতিধ্বনি স্পষ্ট উত্তর দেয়, "কিছু না। সমস্তই গিল্‌টী, ফাঁপা, মানুষ কেবল হাওয়ার পশ্চাতে ছুটিতেছে।" পুরাকাল হইতে এই রূপ জিজ্ঞাসা চলিয়া আসিতেছে। ভারতের দর্শনাদিতে ত পিষ্ট পেষিত হইয়াছে, কর্ম্ম প্রধান পাশ্চাত্য জগতেও কম হয় নাই। * কিন্তু সমস্তই হতাশের ব্যক্তিগত চিন্তা মাত্র। নিরাশা হইতে সন্দেহের উৎপত্তি, এবং সংশয় বহু কাল পোষিত হইলে অবশেষে অশিববাদ (Pessimism) ও নাস্তিকতায় লইয়া ফেলে! এই ভয়ঙ্কর প্রবল স্রোতে গা ভাসান দিয়া (অজ্ঞাতসারে) শুপনর (Schopenhauer) হীন (Heine) লিন (Lenan), ভন হার্‌মান (Von Hartmann), বায়রণ (Byron) শাটো ব্রিয়া (Château Briand.) প্রভৃতি কত দেশের কত অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহামহোপাধ্যায়, ক্লিন্ন জন্তু বৎ, ঘোরতিমিরাচ্ছন্ন, ঝঞ্ঝা-তাড়িত, বিপদসঙ্কুল অবিশ্বাস-সাগরে নিক্ষিপ্ত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন অমঙ্গলের বিভীষিকা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান নাই। ইঁহারা যদি, মানব সমাজের ক্রমোন্নতি, ও নরলোকের দুঃখ দূরীকরণের জন্য সভ্য জগৎ দ্বারা যে সকল উপায় অবলম্বিত হইতেছে, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেন, নিরাশার কোনই কারণ ছিল না।

হইতে পারে, সুখ অপ্রাপ্য সামগ্রী, অন্তত প্রয়াস দ্বারা; তাই বলিয়া যাহাতে দুঃখ দূর বা হ্রাস হয়, এরূপ চেষ্টা কোন

* অতি প্রাচীন কালে মিদাস নৃপতির (Midas King of Phrygia) প্রশ্নোত্তরে বনদেবতা সিলিনস (Satyr Silenus) বলিয়াছেন, পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ না করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, আর যদি জন্ম হয়, যত শীঘ্র মরিতে পারা যায় ততই মঙ্গল। বর্ত্তমান যুগে কবি বায়রণ (Ryron) ঈশ্বরদ্রোহী আদম-পুত্র কেইনের (Cain) দোহাই দিয়া জীবনসম্বন্ধে বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন ঃ—

"——————I was unborn:
I sought not to be born; nor love the state
To which that birth has brought me
* * * * *
* * * They have but
One answer all questions, 'T was *his* will,
And *he* is good." How know I that? Because
He is all powerful, must all good, too follow?
I judge but by the fruits—and they are bitter—
Which I must feed on for a fault not mine"

ইহার পূর্ব্বে মানফ্রেডের (Manfred) মুখ দিয়া বলিয়াছিলেন, "But grief shall be the instructor of the wise; sorrow is knowledge;—" ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, "the gloomy heat of an unbounded and exuberant despair becomes at last oppressive to us." বায়রণ সম্বন্ধে গেটের এই কথা খুব পাকা।

অংশে সে ভাবে [illegible] হইতে পারে না। চারিদিকের [illegible] দারিদ্র্য দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে, বহু জীবের জীবন ভারবহ ও বিফল (hardly worth the living); কিন্তু ঐ সকল শোচনীয় অবস্থায় অসুখের এমন অনেকগুলি কারণ দৃষ্ট হয়, যাহা ভাগ্যবান ব্যক্তিগণ দ্বারা অনায়াসে নিরসন হইতে পারে। নৈতিক উন্নতির সঙ্গে কতকগুলি অন্তর্হিত হওয়া অবশ্যম্ভব, কিন্তু মৌলিক বহু আছে, যাহার হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া কপর্দ্দক-হীন দুঃখী দরিদ্রের নিজের সাধ্যায়ত্ত কিছুতেই নয়। অন্ধ অসহায়তা ও দারুণ নিঃসম্বল অবস্থা, এই দুই মুখ্য কারণের নিরাকরণ জন্য গরিব কাঙ্গাল ভাইগুলিকে সতৃষ্ণ নয়নে সৌভাগ্যশালী জ্যেষ্ঠ সহোদরগণের মুখের দিকে সর্ব্বদা তাকাইয়া থাকিতে হয়; অথচ সহস্রে একবারও সম্যক সহানুভূতি পাইতে দেখা যায় না। আমার বাড়ীতে লুচি মণ্ডার ভিয়ান বসিয়াছে; দশ দিন ধরিয়া সহস্র সহস্র বন্ধু বান্ধব ষোড়শোপচারে ভোগ পাইতেছেন; উপস্থিত গরিব, দুঃখী, অনাথ, অসহায়, কাঙ্গাল, ফকির, কুকুর, বিড়ালের সঙ্গে বসিয়া পাতের ত্যক্ত সামগ্রী দ্বারা জ্বলন্ত জঠর শীতল করিতেছে; কিন্তু আমার প্রাসাদের ঠিক পার্শ্বস্থ পর্ণকুটীরে উত্থান-শক্তি-রহিত রুগ্ন পিতা মাতা দুইটী শিশু-সন্তান লইয়া তিন দিন অনাহারী; খোজ খবর লইবার কেহ নাই, আমার লোক জনের অবকাশ কোথা? এরূপ মর্ম্মভেদী দৃশ্য সংসার আর কত দিন দেখিবে, জানি না। ধরা ভারাক্রান্ত হইয়াছে, সতর্কতার আবশ্যক, আর কিছুর জন্য না হউক, শান্তির জন্য; পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে এক একটী ফরাসি বিপ্লব বাঞ্ছনীয় নয়।

মোহজনিত স্বার্থপরতা হেতু সংসারে উন্নতি অবরুদ্ধ রহিয়াছে; ইতিহাস এপর্য্যন্ত আদর্শ সমাজ দেখাইতে পারে নাই; সুতরাং মানব জীবন কতদূর সুখের, প্রকাশ পাইবার অবকাশ উপস্থিত হয় নাই। একবার মনের মত সুবাতাস পাইলে এই সামাজিক জীবন-তরি যে কোন সুখ-বন্দরে পঁহুছে, পরীক্ষা করিয়া দেখিবার পূর্ব্বে জীবনের উপযোগীতার বিরুদ্ধে মীমাংসা করা নিতান্ত দোষের। যদি কোন অশিববাদী আপত্তি করেন, কবে জগতের সুখ হইবে, সে আশায় আমাদের সান্ত্বনা হয় কৈ? মানব প্রেম সম্বন্ধে তাঁহাকে ভ্রান্ত বলিতে হইবে। নিম্ন জগতে ধাড়ি শাবকের জন্য প্রাণ দিতেছে; বংশ রক্ষা করিতে গিয়া, জানিয়া শুনিয়া নিজে নিধন হইতেছে; আমাদের মধ্যে পুত্র পৌত্রের ভোগের জন্য লোকে তাল নারিকেল রোপণ করিয়া যাইতেছে; বিষয় সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়া সন্তানগণকে দিয়া যাইতে পারিলে সবাই সুখী। এই রূপ নানা বিষয় দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, অন্যের হিতের জন্য চেষ্টা ব্যতীত মানুষ নিজের প্রকৃত সত্তা (True Self.) উপলব্ধি করিতে অক্ষম। তাই সহস্র মোহাচ্ছন্ন হইলেও মানুষ ভাবে, "আমার অবর্ত্তমানে ছেলে পিলের কি হবে?" এই পরার্থ ভাবনা পরিবার মধ্যে উদ্ভূত হয়, বিশ্বে বিস্তীর্ণ হইবার জন্য; চতুর্দ্দিকে যত ছড়াইতে পারিবে, ততই জীবনে সুখ। প্রসারিত বক্ষ উদার পরার্থপর ও সঙ্কুচিত হৃদয় ক্ষুদ্র স্বার্থপরের ভিতরে দেখিবার অবকাশ

পাইলে এই সত্যের উজ্জ্বলতা বিলক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়। তখন বুঝিতে পারা যায়, "The Happiest life is one which is largely concerned with the life of others, one in which a man's thoughts are taken away form himself and fastened upon the needs and interests of those about him" শুধু সুখ দুঃখের কথা নয়। আচার্য্যগণের মতে ও রূপ না করিতে পারিলে মহা পাপ; এমন কি নিজের আত্মার পবিত্রাণের জন্য অতিরিক্ত পরিমাণে ব্যস্ত হইয়া যিনি পরের মঙ্গল চিন্তার অবকাশ পান না, তিনি সম্যক অপরাধী। ভূত, ভবিষ্যত, বর্ত্তমান তিন কালের লোক সমষ্টি আমাদের, এবং আমরা এই সমস্তের সামান্য অংশ মাত্র,—এই মুক্তিপ্রদ মহামন্ত্রে দীক্ষিত না হইলে পরিত্রাণ কোথায়? ক্ষুদ্র পরমাণু হইতে প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত সকলের নিকট আমাদের শিক্ষা করা উচিত যে

"To cut the link of brotherhood, by which
One common maker bound me to the kind."

অনৈসর্গিক, সুতরাং সর্ব্বতোভাবে দুঃখ বিপদের কারণ। "Fellowship is heaven, and lack of fellowship is hell: fellowship is life, and lack of fellowship is death" ইহাই আমাদের জপমালা হওয়া শ্রেয়।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

কবিতার দর্পণ।

(Goethe's Muse's Mirror এর অনুবাদ।)

সাজাইতে চারু অঙ্গ কবিতা সুন্দরী—
প্রভাতে তটিনীকূলে দেখিছে বিচরি';
কোথা স্থির নীর রাশি স্বচ্ছ সুবিমল!
বহে যায় প্রবাহিনী; যত চোলে যায়,
কবিতার প্রতিবিম্ব জলেতে মিশায়
আবর্ত্তে তরঙ্গ ভঙ্গে হইয়া চঞ্চল!!
ক্রোধে দেবী, নদীকূল ছেড়ে চোলে যায়,
বিদ্রূপ করিয়ে নদী, কহিল তাহায়:—
"বুঝিলাম ঠিক যাহা, চাহ না দেখিতে;
তোমার স্বরূপ ছবি আমারি দর্পণে।"
কিন্তু তার কথা দেবী, না তুলি শ্রবণে,
স্বচ্ছ সরসীর তীরে দাঁড়াল নিভৃতে;
আনন্দে নেহারি জলে রূপ আপনার,
গুঁজিল খোপায় ফুল স্বর্ণ কর্ণিকার।

শ্রীবিজয় চন্দ্র মজুমদার।

একটি নক্ষত্রের প্রতি।

"Love is a star, never sleeping,
ever bright"

কি আঁধারে কি আলোকে—সকল সময়,
সুন্দর মধুর তুমি উজল আকাশে।
বিরক্তি, বিনাশ নাই, নিত্যানন্দময়;
ভ্রান্ত পান্থ পায় পথ—তোমার বিকাশে।
নিদ্রা নাই জেগে আছ—চির জাগরণ;
অন্তরে প্রবেশ যার, তা'রেও জাগাও!

অসীম সৌন্দর্য্য কা'র কর বিকীরণ,
অজ্ঞানতা জড় ভাব অন্তরে লুকাও।

শ্রান্ত আত্মা শান্তি পায়—পরশে তোমার;
জীবনের ক্ষুদ্র আশা তৃষার মিলাই।
সসীম জগত ধরে অসীম আকার,
যেতে সে অনন্ত পানে আপনা হারাই।

পশেনা ও চিরোজ্জ্বল আলোক যেখানে,
চির অমানিশা সেথা, মরুভূমি শত!
হেরি এই 'বিশ্ব রূপ' তোমার নয়নে;
তুমি আছ বলে আছি, আছে এজগত।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভুল ভাঙ্গা।

একদিন স্বপনে ডুবিয়া
ভাবিতাম স্বরগ ধরণী,
একদিন অমানিশি কোলে
ভ্রম হ'ত চাঁদিনী যামিনী!
একদিন বরিষার বুকে
দেখিতাম বসন্তের হাসি,
গাছে গাছে ফুটিত কুসুম,
বাজিয়া উঠিত দূরে বাঁশী।
দেখিতাম জোছনায় মাখা
সুশ্যামল সুখময় ধরা,
বিকশিত প্রণয়ের বুকে
সুখ শান্তি স্বপনেতে ভরা!
হায় সেই সুখের স্বপন,
কেন আজ ভাঙ্গিল আমার?
প্রেম ভরা হৃদি গুলি হায়
দেখিলাম কপট আগার!
দেখিলাম সুখের সাগরে
তলে তলে পাপের প্রবাহ,
ভাবিতাম ভালবাসা যারে,
সেও শুধু হৃদয়ের মোহ!
ডুবে গেল বিষাদ সাগরে
ধীরে ধীরে পূর্ণিমার শশী!
সংসারের কুটিল কটাক্ষে,
মিশে গেল হরষের হাসি।
চিনিলাম কেন এ ধরণী?
কেন হায়, ভাঙ্গিল স্বপন?
ডুবে গেল বিষাদ সাগরে
কল্পনার নন্দন কানন!

শ্রীপ্রমীলা বসু।

কবি।

শারদ চাঁদিনী নিশি বহিছে মৃদুল বায়,
আকাশে মধুর শশী হেসে হেসে ভেসে যায়!
তরু লতা ফাঁক দিয়ে শ্যামল ধরার পরে
ঘুমের কুহক নিয়ে চাঁদের কিরণ ঝরে!
কোকিল কুহরে 'কুহু' ফুল-বাসে ছায় দিক,
সুনীল গগন গায় তারা গুলি ঝিক্ মিক্।
পিয়ে কুসুমের মধু, বিমল জোছনা ধারা,
স্বভাবের কোলে ব'সে ভাবে কবি মাতোয়ারা!
ঢলু ঢলু আঁখি দুটী, আবেশে মুদিয়া আসে,
হৃদয় তটিনী পরে স্বপন লহরী ভাসে!
কল্পনার সাথে প্রাণ যেন কোন্ মেঘ পুরে,
মাখিয়া শিশির কণা বেড়াইছে ঘুরে ঘুরে।
কত সাধ কত ভাব, কুসুম রেণুর মত,
হৃদয়ে সমীর সহ পশিতেছে অবিরত।
দূরে দূরে, ছায়া পথে কে যেন গাহিছে গান,
অলখিতে সুর তার ছুঁয়েছে কবির প্রাণ।
কি যেন মাধুরী ছবি ভাসিছে আঁখির পাশে,
প্রতিচ্ছায়া যেন তার প'ড়েছে হৃদয়াকাশে।
নেহারি জগতে আজ কি এক স্বপন পারা,
আপনার মাঝে কবি আপনি হয়েছে হারা!!

শ্রীবিনয় কুমারী বসু।

শিশু।

কত মহাকাব্য তোর ও মুখে বিকা'যে যায়;
কত ঈশা কত মুসা প'ড়ে আছে তোর পায়।
কত শরতের চাঁদ ও মুখেতে নিতি ওঠে,
কত বসন্তের ফুল ও মুখেতে নীতি ফোটে।
নীলিম নয়ন দুটী নির্ম্মল ললাট তলে,
শিখাইছে সারধর্ম্ম জগতে সংসারী দলে।
ও ললাট পবিত্রতা শান্তির মঙ্গল ঘট,
চিন্তার কলঙ্ক লেখা আঁকে নি ও চারু পট।
বুকে ধূলি মুখে ধূলি, ধূলি শিরোপরে বয়,
এখনও না জানিস্ ও যে ধূলি ধূলিময়।
কাল কাকা রাঙা কাকা যে ডাকে পসারি কর
ঝাঁপরি পড়িস তুই তাহারি বুকের'পর।
সরলতা শুভ্রবাসে আবরিত সর্ব্বকায়,
'আঙা কাপোল' 'আঙা জামা' ভূমে—
গড়াগড়ি যায়।
আমরা সংসারী নর, কি কব লজ্জার কথা—
বুকে ঢাকা কপটতা মুখে মাখা সরলতা।

আমার কোলের চাঁদ আকাশের চাঁদ-সনে,
কে দেয় তুলনা? তার দয়া কিরে নাই মনে।
কঠিন পাষাণ চাঁদ সদা দগ্ধ রবিকরে,
আমার ননীর চাঁদ নিঃশ্বাসে উনিয়ে পড়ে।
সুধা আছে ওর কাছে লোকে বলাবলি করে
আমার সোণার চাঁদে কথায় অমৃত ঝরে।
মূক আকাশের চাঁদ জড়পিণ্ড প্রাণহীন।
আমার কোলের চাঁদ হাসে গায় সারাদিন।
আহারে স্বর্গের জীব। তোর কি তুলনা আছে!
চুণী পান্না চাঁদ ফুল নিভে যায় তোর কাছে।
দেখাতে স্বর্গের শোভা পাপাসক্ত নরগণে,
পাঠায়ে দেছেন বুঝি বিধি তোরে এ ভবনে।
অথবা বেড়াতে ছিলি একাকী বিমান পথে,
পথভুলে এসেছিস্ আমাদের এ জগতে।
তাই বুঝি শিশু! তুই এমন লাবণ্যধার,
এ জগতে নাহি মিলে একটী উপমা যার।
কিন্তু হায় আমাদের দরশ পরশে তুই,
হইবি মোদেরি মত, বাকী মাত্র দিন দুই।
যে দিন শিখিবি তুই দর্পণে দেখিতে মুখ;
সে দিন হইতে তোর ফুরাবে লাবণ্যটুক।

শ্রীশ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রার্থনা।

দেবতাগো। ভেঙ্গে দাও দেহের বন্ধন,
দুটী প্রাণ এক সাথে দাও মিলাইয়া;
সহিতে পারিনা আর বিরহ বেদন—
বিরহ রজনী এবে—যাক পোহাইয়া!
তিল তিল করি নিশি পশিতেছে প্রাণে,
তিল তিল করে প্রাণ যেতেছে ভাঙ্গিয়া,
প্রাণের—উদয়গীতি নিরাশার তানে—
তিল তিল করি বুঝি যেতেছে মরিয়া।
বাসনা হৃদয়ে মোর ছিল কোনদিন।
রহিতে সংসারে বসি সুখের জীবন;
সে আশা ফুরায়ে গেছে, হয়ে গেছে লীন—
সংসার হয়েছে এবে—কণ্টক কানন!
পারিনা খেলিতে আর এ ভবের খেলা—
চাহিনা হইতে বন্দী—দেহ কারাগারে,
দেবতাগো! দাও দাও, মিলাইয়ে মেলা—
দেহ কারাগার মোর—যাক ভেঙ্গে চুরে!
এক আশা ছিল প্রাণে সংসার মাঝারে—
সেই আশা যদি দেব! গিয়াছে ভাঙ্গিয়া;
তবে আর কেন মায়া জীবনের তরে—
জীবনের সূত্র মম—দাওগো কাটিয়া!
আঁধারে হেরিয়ে আলো পড়িনু ঝাঁপায়ে!
ভেবেছিনু কাছে গেলে আলোকিবে প্রাণ;
কোথা হতে ঝড় এল, দিল নিবাইয়ে—
ভেঙ্গে চুরে গেল মোর—আশার স্বপন।
দেবতাগো! ভেঙ্গে দাও দেহের বন্ধন,
দুটী প্রাণ এক সাথে দাও মিশাইয়া;
সহিতে পারিনা আর বিরহ বেদন—
বিরহ রজনী এবে—যাক পোহাইয়া!

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস।

ইন্দ্র-চন্দ্র সংবাদ।

(৮ম)

২৮শে মার্চ, Houses of Parliament, Westminister, পার্লেমেণ্ট মহাসভাগৃহ। রাত্রি ৮টার সময় House of Commons সভাগৃহে উপস্থিত হইলাম। আয়র্লণ্ডের জমীসংক্রান্ত আইনের কোন প্রশ্ন লইয়া বিতণ্ডা চলিতেছিল। ১৮৩৪ খ্রীঃ অব্দের ১৬ অক্টোবর তারিখে পুরাতন গৃহ অগ্নি-দগ্ধ হয়। ১৮৪০ খ্রীঃ অব্দের ২৭শে এপ্রেল তারিখে ভিত্তি স্থাপিত হইয়া ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দে এই নূতন গৃহ প্রস্তুত হয়। সমগ্র মহাসভাগৃহ একখানি গ্রাম বলিলে চলে, প্রায় ২৫ বিঘা জমি ব্যাপিয়া দণ্ডায়মান। সর্ব্বোচ্চ ধ্বজা (tower) ২৩৫ হাত উচ্চ, এইখানে ৬৬০ মণের একটী ঘণ্টা ঝুলিতেছে। গৃহমধ্যে প্রকাণ্ড হল গালারি প্রভৃতি ১৪টী। সম্ভ্রান্ত বৃহৎ পরিবার বাস করিতে পারেন, এরূপ ৮টী মহল (official residences)। সুসজ্জিত সুপ্র-শস্ত ৩২টী কমিটী ঘর। এতদ্ব্যতীত পুস্তকালয়, আফিস, খানা-কামরা প্রভৃতি যে কত, বলা যায় না। সর্ব্বশুদ্ধ ৬০০ ভাগে (apartments) বিভক্ত। সুবিশাল ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের শাসন কার্য্যের উপযুক্ত সভাগৃহ, সন্দেহ নাই। গৃহাভ্যন্তরে পিট (Pitt), ফক্স্ (Fox) প্রভৃতি বহু মহাজীবের শ্বেত মর্ম্মরময়ী মূর্ত্তি স্থাপিত। এ স্থানের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা আমার ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের সাধ্যাতীত। সুতরাং কবির এই কয়টী কথা দ্বারা শেষ করিলাম।

"The echoes of its vaults are eloquent,
The stones have voices, and the walls do live;
It is the house of memory"
Maturin.

৩০ শে মার্চ্চ, University Boat-race; কালেজের বাইচ। চারিদিকে বসন্তের হাওয়া ছুটিতেছে, পৃথিবীর নরনারী, পশুপক্ষী, এমন কি অচেতন (?) উদ্ভিদ-জগৎ পর্য্যন্ত হর্ষে পুলকিত-তনু। স্ফূর্ত্তির বাতাস শীত-পীড়িত সংসারে নূতন জীবন সঞ্চার করিয়া অভিনব সুন্দর দৃশ্যাবলী দ্বারা জীবলোককে অনুপ্রাণিত করিতেছে। কিন্তু ভাই! দেশের বসন্তের কিছুই এখানে দেখা যায় না; ঋতুরাজের সেই প্রাণপাগলকারী ঔদাস্যময় আধিপত্য এখানে খাটে না;—ব্রিটীশরাজের দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপে সৌরজগতের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডদেব পর্য্যন্ত সর্ব্বদা জড়সড়, বসন্ত কোন্ ছার;—সেই তমাল তরুর নবীন পত্র, প্রস্ফুটিত কিংশুক পুষ্পসকল, সুগন্ধ বাতাবিলেবু ফুল, সুমিষ্ট সৌরভ প্রচার দ্বারা চতুর্দ্দিক আমোদিতকারী বিকশিত আম্রমুকুল, সুললিত চন্দ্রপ্রভা, চন্দনতরুসকুল মলয়াচল-সম্বন্ধী ফুরফুরে দক্ষিণ পবন, সুকোমল হরিতপত্র-শোভিত বৃক্ষোপরি ক্রীড়মাণ কোকিল কলাপের শ্রবণ-মনবিহ্বলকারী সুমধুর কুহুরব, একল ইউরোপে সম্ভোগ করা স্বপ্নের অগোচর ব্যাপার। আর শুনিতে পাওয়া

যায় না, বসন্তবাগে গীত শরীর মন অবসাদক জয়দেবের গান ;—

"ললিত লবঙ্গ লতা পরিশীলন কোমল মলয় সমীরে

"মধুকর নিকর করম্বিত কোকিল কূজিত কুঞ্জকুটীরে।

"বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে,

"নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে॥"

যে বসন্ত ঋতু সমাগমে ভারতে রতি ক্রীড়াহেতু নিকুঞ্জবনে কৃষ্ণসকাশে সত্বর যাইবার জন্য সখিগণ রাধিকাকে

"রতিসুখসারে গতমভিসারে মদন মনোহর বেশং

"ন কুরুনিতম্বিনি গমনবিলম্ব নমনুসর তং হৃদয়েশং॥

"ধীরসমীরে যমুনাতীরেবসতি বনে বনমালী।

"পীতপয়োধর পরিসরমর্দ্দন চঞ্চলকর যুগশালী॥"

বলিয়া উত্তেজনা করিতেছেন, সেই সময়ে পৃথিবীর প্রধান নগর লণ্ডনের লোক কবি বার্জিলের (Virgil) সহিত "Cundti adsint, meriloegue expectent proemuia palmoe." (আইস, সকলে উপস্থিত হই, এবং উপযুক্ত পুরস্কার আশা করি।) গান গাইতে গাইতে কলেজ বাইচের জন্য বিশেষ উদ্যোগী। ইংলণ্ডের চক্ষুস্বরূপ অক্সফোর্ড (Oxford) ও কেম্ব্রিজ (Cambridge) বিশ্ববিদ্যালয়ের বাছা বাছা ১৬ জন বলিষ্ঠ যুবক (তন্মধ্যে লর্ড আম্‌থিল.)—Ampthill এক জন) কেপণী চালনায় শক্তি ও নৈপুণ্য প্রকাশ দ্বারা বীরত্বের পরিচয় দিবেন, ইহারই জন্য এক মাস হইতে নানাবিধ আয়োজন। মানসিক উৎকর্ষতার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক বল বিক্রমাদির বিকাশের প্রতি যাহাদের এরূপ লক্ষ্য, তাহাদের জাতির উন্নতি না হইবে কেন? শুধু শরীর বা মনের বর্দ্ধন দ্বারা প্রকৃত উন্নতি লাভ অসম্ভব, যুগপৎ উভয়ের পুষ্টিসাধন প্রত্যেক বিজ্ঞজাতির বাঞ্ছনীয় ও কর্ত্তব্য। আর্য্যদিগের অভ্যুদয় কালে হঠযোগের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ছিল। প্রাচীন গ্রীকগণ এ বিষয়ে ইউরোপের আদর্শ স্থল। বর্ত্তমান সময়ের ইউরোপ ও আমেরিকা, বিশেষ জন্বুলিয়া ইহা বিলক্ষণ বুঝেন। *

অক্সফোর্ডের চিহ্ন ঈষৎ নীল, কেম্ব্রিজের ঘন নীল। আবাল-বৃদ্ধ বনিতা;—দোকানী, পসারি, গাড়োয়ান, রাস্তার মুটে, গরিব দুঃখী সন্তানগণ, (Children of the gutter) পর্য্যন্ত সবাই দুইয়ের এক প্রকারের ফিতা (Ribbon), গলাব বন্ধ (Neckti) বা ফুল (Rosette), পরিয়াছে; এমন কি, যাহারা কেম্ব্রিজ অক্সফোর্ড কোথায়, বা বিশ্ববিদ্যালয় কাহাকে বলে, কোন কালে জানে না। † নৌকায় কখন চড়ে

* এই কালেজ বাইচ ১৮২৯ খ্রীঃ অব্দে স্থাপিত হয়। সেই অবধি এ পর্য্যন্ত হিসাব করিলে অক্সফোর্ডের একবার জিত আছে। গত চারিবার ক্রমাগত কেম্ব্রিজের জয়।

† Grand daughter—Grand ma, What they mean by these light and dark blue?

Grand-mother,—Eton and Harrow are going to row a cricket match.

বালিকা নাতিনী।—ঠাকুর মা! এই সব ঈষৎ নীল ও ঘন নীলের মানে কি?

বৃদ্ধা পিতামহী।—ইটন ও হ্যারো (লণ্ডনের নিকটস্থ দুইটি এন্ট্রেন্স স্কুলের নাম) ব্যাটবলের বাইচ খেলিবে।

কলেজ বাইচ সম্বন্ধে অনেকের এইরূপ জ্ঞান।

নাই, বাইচ কখন দেখে নাই, তাহারা পর্য্যন্ত এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া উচ্চিহ্ন ধারণ করিতে ছাড়ে নাই। কত লোক কেম্ব্রিজের উপর, কত লোক অক্সফোর্ডের উপর রাশি রাশি টাকা বাজি রাখিয়াছে। ‡

নানাদিক হইতে নানাবঙ্গের লোক নানা প্রকার যানে ও পদব্রজে প্রাতঃকাল হইতে বাইচ স্থলাভিমুখে ধাবমান। বেলা ১০ টার মধ্যে পাট্‌নি (Putney) হইতে মোর্‌লেক (Mortlake) পর্য্যন্ত সাড়ে চারি মাইল নদীর দুইধার লোকে লোকারণ্য। বাইচের ৩ ঘণ্টা পূর্ব্বে ওয়েষ্টমিনিষ্টর সেতু. (Westiminister Bridge) হইতে মোর্‌লেক পর্য্যন্ত ৫ ক্রোশ নদীবক্ষ নানা শ্রেণীর নানা সাজের বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, যুবক, যুবতী, বালক, বালিকা পূর্ণ, বৈদ্যুতিক, বাষ্পীয় হইতে গাধাবোট পর্য্যন্ত, নানা রকমের জলযানে আকীর্ণ। জলযান সমূহ মধ্যে, কেম্ব্রিজের একখানি, অক্সফোর্ডের এক খানি, আম্পায়ার (Umpire) একখানি ও সংবাদ পত্রের একখানি বিশেষ গাম্ভীর্য্যের সহিত ধীরে ধীরে উজান বাহিয়া মোর্‌লেকাভিমুখে যাইতেছে। ব্যবসায়ীগণ বিজ্ঞাপন প্রচারোদ্দেশে নানা প্রকার নৌকা নানা ছন্দে সাজাইয়া লোকের চিত্তাকর্ষণে যত্নবান। তীরে ৭।৮ জায়গায় প্রায় ২০ হাজার দর্শকের জন্য দাঁড়াইবার ও বসিবার বাবস্থা করা হইয়াছে; দেখিতে দেখিতে সকল স্থান পূর্ণ হইয়া গেল; টিকিটের মূল্য ২৲ হইতে ১৫৲।

নির্দ্দিষ্ট কালে বেলা ৪ টার সময় সুন্দর সুস্থ সবল ১৬ জন দাঁড়ীসহ অতি পরিস্কার দুইখানি ছোট ডিঙ্গি পাট্‌নি হইতে ছাড়িল। ১০ মিনিটের মধ্যে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। যে রূপ শান্ত সমাহিত ভাবে, গাম্ভীর্য্য ও মর্য্যাদার সহিত আসন রক্ষা করিয়া দাঁড় ফেলা হইতেছে, দেখিলে বোধ হয় না যে, কোন প্রকার প্রতিদ্বন্দীতা আছে। আর আমাদের দেশের বাইচে সপ্তশির উন্নতি করত দাঁত মুখ সিঁট্‌কাইয়া আসন হইতে এক হাত উচ্চে উঠিয়া সজোরে দাঁড়ে ধাবা দ্বারা জল ছিটাইয়া নদী তোলপাড় না করিলে বিক্রম প্রকাশ হয় না। যেখানে বিধাতার কৃপা বর্ষে, সেখানে নিম্বও সুমিষ্ট হইয়া দাঁড়ায়। অল্পক্ষণ পরে প্রচারিত হইল, কেম্ব্রিজের জিত, ১০ হাত আগে; পাট্‌নি হইতে মোর্‌লেক পঁহুছিতে ২০ মিনিট ১৪ সেকেণ্ড লাগিয়াছে। যেমন শেষ হইল অমনি আমরা ঘরে ফিরিলাম; পথে দেখি বাইচের সমস্ত বৃত্তান্ত সহ বহু সংবাদ পত্র বাহির হইয়াছে। দেখ ভাই! কি ভয়ানক এই উদ্যম।

এই জলে স্থলে ৪।৫ লক্ষ লোকের উৎসাহ, উদ্যম, বিমল প্রফুল্লতা দেখিয়া বড় আনন্দ পাইলাম। এরূপ বিরাট জনতার এ প্রকার আমোদ আহ্লাদ প্রকাশ দ্বারা দেশের যুবকবৃন্দকে শারীরিক ব্যায়ামাদির সম্বন্ধে যে পরিমাণে উৎসাহ প্রদান করা হইল, তাহার ফল অতি উপাদেয় এবং সেরূপ উৎসাহ সহস্র সহস্র পুস্তক বা উপদেশ দ্বারা কখন সম্ভবে না। আর একটী বড় সুখ-

‡ এখানকার লোক বাজি রাখিতে খুব মজবুত। এই বাইচ উপলক্ষে ৮।১০ কোটী টাকার খেলা হইয়া গেল। আমাদের হোটেলের আমি ছাড়া আর সবাই কোন একপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন।৫।৬ জন বাজিও রাখিয়াছিলেন। ঘোড়দৌড়, বাইচ, পার্লামেন্টের সভ্য নির্ব্বাচন প্রভৃতি ব্যাপারে খুব বাজির ধুম।

প্রদ ভাব এই সময়ে মনে হইল। শুনিয়াছি, পুরিতে জগন্নাথের মন্দিরে পাণ্ডাদের বালকগণ দেবতার সম্মুখে করযোড়ে প্রার্থনা করে, "সংসার সুখী কর, ঠাকুর।" বাস্তবিক ইহা অপেক্ষা উচ্চ কামনা মানুষ প্রকাশ করিতে পারে না। ব্যক্তিগত স্বার্থপরতাপ্রধান দেশের দেবমন্দিরে "ধনং দেহি, পুত্রং দেহি" র স্থানে এরূপ উদার উন্নত প্রার্থনা সম্ভবে, পূর্ব্বে বিশ্বাস ছিল না; তাই সংবাদটী শুনিবা মাত্র হৃদয় রাজ্যে এক অভিনব আনন্দ তাড়িত-বেগে সঞ্চারিত হইয়াছিল। কথাগুলি প্রাণে এত মিষ্ট লাগিয়াছে যে, যখন তখন মনে হয়, এবং প্রাণ ভাবিয়া উচ্চারণ করিলে বিপুল সুখ পাই। এই প্রকাণ্ড জনতার সমারোহে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইলাম, এত লোককে একত্রে পবিত্র সুখ সম্ভোগ করিতে দেখিলে নিজে কি অতুল অনির্ব্বচনীয় সুখ পাওয়া যায়। যদি সমগ্র সংসার এই ভাবে চিরসুখী হয়, সুরলোক ইহার নিকট নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

সাঁওতাল কাহিনী।

যে দিকে সূর্য্যের উদয় হয়, সে দিকে মনুষ্যের জন্ম হইয়াছিল। প্রথমে কেবল জল ছিল, জলের নীচে মাটী ছিল। ক্রমে রাঘব বোয়াল কাঁকড়া চিংড়ী প্রভৃতি জলজন্তুর সৃষ্টি হয়; তাহার পরে পক্ষীর সৃষ্টি হয়। পক্ষীগণ জলের উপর ভাসিয়া বেড়াইত, কিন্তু আহার পাইত না। তখন ঠাকুর কুম্ভীর চিংড়ীমাছ ও বোয়াল মাছের সাহায্যে সমুদ্রের নীচের মাটী উপরে তুলিতে চেষ্টা করিলেন। তাহারা কেহই সফল হইল না। এই অপরাধে বোয়াল মাছের আঁইস হয় না। তখন ঠাকুর কচ্ছপকে জলের মধ্যে পায়ে শিকল বাঁধিয়া রাখিয়া দিলেন। একটা কেঁচো সেই কচ্ছপের উপর লেজ রাখিয়া মুখ দিয়া সমুদ্রের তল হইতে মাটী তুলিয়া মলদ্বার দিয়া সেই মাটী কচ্ছপের উপর জমা করিল। তাহাতে পৃথিবী সৃষ্টি হইল। ঠাকুর মই দিয়া সেই মাটী সমান করিয়া দিলেন। মই দিয়া যে মাটী ভাঙ্গিল না, তাহাই পাহাড় হইল।

জমী সমান হইলে ঠাকুর তাহাতে বেণাবীজ বপন করিয়া দেন। ক্রমে অন্যান্য বৃক্ষ জন্মে, বেণা বনে হংসডিম্ব হইতে নর নারী উৎপন্ন হয়। বড় ঠাকুরের আদেশে পাখী দুটী আপনারা যাহা খাইত, তাহার রসে তুলা ভিজাইয়া নর নারীর মুখে চাপিয়া দিত। এইরূপে শিশু দুটী বড় হইলে তাহারা পূর্ব্ব দিকে হিহিড়ী পিপিড়ী দেশে নর নারীকে রাখিয়া প্রস্থান করিল। এই নর নারীর নাম পিলচু বুড়া ও পিলচু বুড়ী। সামা ঘাসের বীজে তাহারা জীবন ধারণ করিত। তখন তাহাদের পরিধেয় ছিল না, লজ্জাও ছিল না।

লিটা তাহাদিগকে ভাতে বাখর মিশাইয়া মদ প্রস্তুত করিতে শিখাইয়া দেয়।

এবং মারং বুরুকে (বড় পর্ব্বতের প্রেত) উৎসর্গ করিয়া মদ খাইতে পরামর্শ দেয়। তাহারা সেই উপদেশমত মদ প্রস্তুত করিয়া তিনটী শালপাতের দোনায় মদ রাখিয়া এক দোনা মারং বুরুকে দিয়া দুই দোনা দুজনে খায়। এবং উন্মত্ত অবস্থায় সহবাস করে। রাত্রি প্রভাত হইলে তাহারা আপন নগ্নতায় লজ্জাবোধ করে। তখন বট পত্র পরিধান করিয়া নগ্নতা নিবারণ করিয়াছিল।

পিলচু বুড়া ও পিলচু বুড়ীর সাত পুত্র ও সাত কন্যা হয়। বুড়া যুবা পুত্রদিগকে লইয়া শীকারে যাইত ও বুড়ী কন্যাগণকে লইয়া শাক তুলিত। শাক তুলা শেষ হইলে একদিন যুবতীরা চাপাকিয়া নামক বট বৃক্ষের তলে বিশ্রাম করিয়া ঝুরি ধরিয়া ঝুলিতে নাচিতে এবং গাইতে লাগিল। ইত্যবসরে যুবকেরা একটী মৃগ শিশু লইয়া সেইখানে উপস্থিত হইল এবং ক্রমে যুবতীগণের সহিত নাচিতে লাগিল, ক্রমে বয়স মত এক একজন এক এক জনকে বাছিয়া লইল। যখন তাহারা আপনি পছন্দ করিয়া লইল, বুড়া বুড়ী কোন আপত্তি করিল না। তাহাদের অনেক সন্তান সন্ততি হইয়াছিল। কিন্তু আর কেহ সগোত্র বিবাহ করিতে না পারে, এজন্য গোত্র বা পারিশ ভিন্ন হইল।

প্রথমে সাত গোত্র হইয়াছিল (১) হাঁসদা (২) মুর্ম্মূ (৩) কিস্কু (৪) হেম্ব্রোম (৫) মাড়ণ্ডী (৬) সরেণ (৭) টুডু। সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে সে দেশ ছাড়িয়া তাহারা খোজকামান দেশে প্রস্থান করে। এখানে তাহাদের অনাচার বৃদ্ধি হইলে ঠাকুর অগ্নি জল বর্ষণ করিয়া সকলকে নাশ করেন। কেবল যাহারা হারাতা পর্ব্বতের গুহায় আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারাই রক্ষা পাইয়াছিল। কিছু কাল হারাতা পর্ব্বতের নিকট বাস করিয়া শেষে শশানবেড়ার বিস্তৃত মাঠে যাইয়া বাস করে। এখানে আর ৫ পাঁচটী পারিশের নিয়ম হয়।

(৮) বাসকে (৯) বেসরা (১০) পাঞ্জরিয়া (১১) চঁড়ে এবং (১২) বেদেয়া। এই বেদেয়া পারিশের লোক এখন আর দেখা যায় না।

"হিহিড়ী পিপিড়ীরে বোন জনমলেন
খোজকামান রে বোন খোজ লেন
হারাতারে বোন হারা লেন
শশানবেড়ারে বোদ জাতে না হো।"

শশানবেড়া হইতে সাঁওতালেরা হুজরপি দেশে এবং তথা হইতে জঙ্গলের মধ্য দিয়া সিংতুয়ার গিরিসঙ্কটে পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া আইরে দেশে আসে, তথা হইতে কায়ণ্ডে, কায়ণ্ডে হইতে চাই দেশে আইসে। চাইদেশে আসিয়া তাহারা অনেক দিন বাস করিয়াছিল। অনন্তর জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে সাতনদী চাম্পা দেশে উঠিয়া যায়। এখানে শত্রু আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য এক একটী গড় নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে এক এক পারিশ বাস করিত। ভিন্ন ভিন্ন দেবতার ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কিস্কুরা রাজা ছিল, মুর্ম্মুরা পৌরহিত্য করিত, সরেণেরা প্রহরীর কার্য্য করিত, হেম্ব্রোমেরা যুদ্ধে যাইত, মারাণ্ডীরা ধনপতি, টুডুরা বাদ্যকর এবং বাস্কেরা ব্যবসা করিত। এইরূপে অন্যান্য পারিশের এক একটী কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। চাম্পা দেশে তাহারা বহুযুগ ছিল, তজ্জন্য চম্পাকে সাঁওতালের আদিম নিবাস বলিয়া উল্লেখ করে। এখান হইতে (হিন্দু?) খেরো-

যায় সাঁওতালেরা রাজা রামচন্দ্রের সঙ্গে লঙ্কায় গিয়াছিল। তদবধি অনেক দিন পর্য্যন্ত দিকু (বিদেশী)দিগের সহিত তাহাদের কোন বিবাদ হয় নাই। সাঁওতালেরা জঙ্গলে ও দিকুরা মাঠে বাস করিত। কিন্তু ভবিষ্যতে দিকুদের সহিত অনেক বার বিবাদ হইয়াছিল। "আমরা অরণ্য পরিষ্কার করি, দিকু আসিয়া কাড়িয়া লয়।

"যদি সাহেবেরা তাহাদের সপক্ষতা না করিত, এতদিনে আমরা তাহাদিগকে গঙ্গা পারে তাড়াইয়া দিতাম।" একবার দিকুরা চাম্পাগড় জয় করিয়াছিল, সাঁওতালেরা পুনরায় তাহা কাড়িয়া লয়। এই সময় দিকুরা এই গানটী করিয়াছিল।

দাদাযা ইনদান সিন মন্দান সিন
দাদাযা ছুটলন চাম্পাকা গড়
বহিন গে না কাঁদো না খিজো
বহিন গে হাতে কা শাঁকা বিচৌ
বহিন গে কানেকা সোণা বিচৌ
বহিন গে তাউ হোনা লেবো চাম্পাকা গড়।

চম্পা হইতে সাঁওতালেরা তোড়ে পোখোরী বাহা বাঙ্গেলায় উঠিয়া যায়। এখানে থাকিবার সময় মৃত দেহ দাহ করিবার ও জলে অস্থি দিবার কিম্বা বিবাহে স্ত্রীলোকদের মাথায় সিন্দুর দিবার প্রথা তাহাদের মধ্যে ছিল না। তখন মৃত দেহের কবর হইত। এ প্রথা পরে তাহারা হিন্দুদের নিকট শিক্ষা করিয়াছিল।

কেহ কেহ বলে, "মুসলমানদিগের ভয়ে সাঁওতালেরা তোড়ে পোখেরী বাহা বঙ্গেলা হইতে জোনা জগপুর পলাইয়া যায়। সে স্থানে অধিক দিন থাকিতে না পারিয়া খাকপাড় খোণ্ডকাতে পলায়ন করে। এখান হইতে তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দিকে যায়। কেহ শিখার দেশে, কেহ নাগপুরে যায়। শিখার দেশে ইহারা ছাক্রা পর্ব্ব শিখে। শিখার দেশে স্থান অভাব হইলে টুণ্ডি দেশে উঠিয়া যায়। অজয় পার হইতে পূর্ব্ব পুরুষ নিবারণ করিয়াছিল, কিন্তু পেটের জ্বালায় সে নিয়ম ভঙ্গ করিয়াই সাঁওতাল দেশে আসিয়াছি, এখন আবার কোন দিকে চলিয়া যাইব।"

রাজমহলের পথে অনেকে গঙ্গা পার হইয়া গিয়াছে। জানিনা ঠাকুর কোন দোষে আমাদিগকে শাস্তি দিতেছেন। কেহ কেহ বলে, চম্পা হইতে সাতদেশে গিয়া বাস করিয়াছিল বলিয়া ইহাদের নাম সাত বা শান্ত হইয়াছিল, তাহা হইতেই সান্তাল নাম হইয়াছে। অন্যেরা বলে, সাঁওতালিতে বাস করিয়াছে বলিয়া ইহাদের নাম সান্তাল হইয়াছে। অনেকের বিশ্বাস, পশ্চিম দিক হইতে সাঁওতালেরা এখানে আসিয়াছে। সাঁওতাল পরগণার পূর্ব্ব নাম তুড়ুক দেশ। আরমানদের ন্যায় সাঁওতালেরা অপনাদিগকে হোড় বা মনুষ্য বলিয়া ডাকে। হোড় বীরহোড় মুণ্ডা, বা কুড়ুখী চম্পা বাস কালে সকলকে খেরয়ার বলিত। ক্রমে কুড়ুখীরা দিকু হইয়া কুর্ম্মী হয় এবং বীর হোড়েরা বানরের মাংস খাইয়া পতিত হয়। সাঁওতাল ও দিকুর মিশ্রণে সিংহ ঘাটোয়াল জাতির সৃষ্টি। এই জাতীয় মধ্যে সিংহ চাম্পা হইতে সাঁওতালদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছিল।

কয়েক বৎসর হইল পারশোতার ভাগবত মাঝি (সাঁওতাল) স্বজাতীয়দিগকে শূকর ও কুক্কুট মাংস পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু হইতে শিখাইয়াছিল। তদবধি সাঁওতালেরা সাধু বা সাফা, বুটা এবং বেদিয়া এই তিন শ্রেণী হইয়াছে। সাফা সাঁওতালেরা হিন্দুর মত আচরণ করে।

শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র রায়চৌধুরী।

মহাত্মা জর্জ মুলারের জীবনচরিত।

প্রথম অধ্যায়।

বাল্য জীবন।

ব্রিষ্টলের নিকট এ্যাসলিডাউনের উপরে নির্ম্মিত অনাথাশ্রম নামক সুন্দর অট্টালিকা শ্রেণী দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। পাঁচটী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকায় দুই সহস্রের অধিক অনাথ বালক বালিকা প্রতিপালিত হইতেছে। এই আশ্রমগুলি তাহাদিগের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা জর্জমুলারের দয়া ও সহৃদয়তার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

কিন্তু বাস্তবিক মুলারের শৈশব ও যৌবন কাল কোন অসাধারণ কার্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ নহে। মুলার নিজ বিবরণীতে স্বীকার করেন যে, তাহার বাল্য জীবন অতি গর্হিত কার্য্যে অতিবাহিত হইয়াছে। পরিণামে সেই সকল স্মরণ করিয়া তিনি অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়াছিলেন।

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসের সপ্তবিংশ দিবসে প্রুসিয়া দেশের অন্তর্গত ক্রপেনষ্ট্যাড নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে জর্জমুলার কলেবর পরিগ্রহ করেন। তাঁহার পিতার নাম হার মুলার। হার মুলার রাজ সম্পর্কীয় কোন কার্য্য করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। মুলারের পাঁচ বৎসর বয়ক্রম কালে তাঁহার পিতা তাঁহাকে হিমারসলবেন লইয়া যান। ক্রপেনষ্ট্যাড হইতে হিমারসলবেন দুই ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

জর্জের এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। হার্ মুলার অধিক বেতন না পাইলেও পুত্র দুইটীকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ দিতেন। পুত্রগণ টাকা খরচ না করিয়া সঞ্চয় করিবে এবং এইরূপ সঞ্চয় করা অভ্যাস থাকিলে অর্থ ব্যবহারে পটু হইবে, এই আশায় তিনি তাহাদিগকে বহুল পরিমাণে অর্থ দিতেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহারা অযথা ব্যয় করিয়া ফেলিতেন, এবং পিতার বিরক্তিভাজন হইতেন ও তাঁহার নিকট মধ্যেমধ্যে শাস্তি প্রাপ্ত হইতেন।

একাদশ বর্ষে জর্জের পিতা জর্জকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করণাভিপ্রায়ে হ্যালবারষ্ট্যাডের ক্লাসিকেল বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিলেন। জর্জ উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই তাঁহাকে পুরোহিতের কর্ম্মে নিয়োজিত করিবেন, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। সুতরাং তিনি তাঁহার পুত্রকে সম্পূর্ণ শিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন।

মুলারের স্বকীয় বিবরণ হইতে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এই সময়ে তিনি পাঠে সম্পূর্ণ অমনোযোগী হইয়া ছিলেন ও উপাসনায় তাঁহার কিছু মাত্র অনুরাগ ছিল না। মুলারের পিতা বোধ হয় মুলারকে পরজীবনে সুখী দেখিবার জন্য তাঁহাকে পৌরহিত্যে বিনিয়োগ করিতে বাসনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পৌরহিত্যের দায়িত্ব ও যোগ্যতার বিষয় একবারও স্মরণ করেন নাই। মুলার পিতার অভিপ্রায়নুযায়ী জার্ম্মেনীর পুরোহিত হইতে না পারিলেও, ঈশ্বরেচ্ছায় এরূপ মহৎ কার্য্য করিয়াছেন, যাহা প্রচলিত সময়ের কোন ধর্ম্মযাজক করিতে সমর্থ হন নাই।

পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে জর্জ মাতৃহীন হইলেন। মাতার আদর্শ যে মুলারের জীবনের কোন উন্নতি সাধন করিয়াছিল, এরূপ বোধ হয় না। কিন্তু মাতৃবিয়োগ হওয়ায় মুলার অবশ্য শোকবিহ্বল হইয়াছিলেন। তিনি অল্পদিন মধ্যেই মাতার মৃত্যুশোক বিস্মৃত হইলেন এবং অল্প বয়সেই তিনি পান্থনিবাসে যাইয়া তাস ক্রীড়া ও সুরাপানে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তাহার ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হওয়ায় ধর্ম্মমন্ত্রে দীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইল। দীক্ষাগ্রহণের পর কিছুদিনের জন্য তিনি অত্যন্ত দুঃখিত ও অনুতাপিত হইলেন। কিন্তু অসৎসঙ্গের কুহকে পড়িয়া তিনি পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় একেবারে বিস্মৃত হইলেন। এবং এরূপ ভাবে সময় ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন যে, পরে সেই সকল স্মরণ করিয়া তাঁহাকে অনেক মর্ম্মপীড়া পাইতে হইয়াছিল। কুসঙ্গে থাকিয়াও বালক মুলার বিবেকের দংশন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি উদ্ধারের উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, নূতন স্থানে গিয়া নবসহচরগণের সহিত মিলিত হইলে তাঁহার চরিত্র সংশোধিত হইতে পারে। দীক্ষার পর তিনি কিছুদিন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। শেষে দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইলেন। তিনি বলেন—"এ সময় আমি পরমপিতা পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিতে শিখি নাই, তাঁহাকে জীবনের ধ্রুবতারা জ্ঞান করি নাই বলিয়া আমার সকল প্রতিজ্ঞা বৃথায় পর্য্যবসিত হইল। আমি ক্রমেই অসৎ হইতে লাগিলাম।"

এই সময়ে মুলারের পিতা ম্যাকডিবর্গের নিকট শোনবেক নগরে একটী কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। জর্জ তাঁহার পিতার নিকট তাঁহাকে হ্যালবারষ্টাডের স্কুল হইতে ছাড়াইয়া ম্যাকডিবর্গের স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার পিতা কয়েকটী অসৎ বালকের সঙ্গ পরিত্যাগ করাইবার অভিপ্রায়ে তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিলেন, এবং হীমারসলবেনে একজন গ্রীক্‌রোমক ইত্যাদি ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতের অধীনে রাখিয়া দিলেন।

ষোড়শ বর্ষ বয়সের সময় একদিন মুলার ব্রানসিক্ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া তথায় সপ্তাহকাল অতিবাহিত করিলেন। একটী হোটেলে প্রবেশ করিয়া অত্যন্ত বড়মানুষী ধরণে আহারাদি করিলেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার সমস্ত টাকা খরচ হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহাকে অর্থের বিনিময়ে উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ দিতে হইল। আর একবার উলফেনবাটেলের হোটেলে ইহা অপেক্ষা অধিক বিপদে পতিত হন। এইবার তিনি তাঁহার দেয় টাকা না দিয়া হোটেল হইতে পলায়ন করিবার চেষ্টা করায় পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইলেন, এবং রাজদ্বারে দণ্ডিত হইলেন। অবশেষে তাঁহার পিতার প্রেরিত অর্থ আসিয়া পৌঁছিলে, হোটেলের ঋণ পরিশোধ হইল, জর্জ মুক্ত হইলেন। তিনি বাটী প্রত্যাগমন করিলে, তাঁহার পিতা তাঁহাকে যথোচিত শাস্তি প্রদান করিলেন। এই সময় হইতে তাঁহার পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। পূর্ব্বকৃত পাপ সকল স্মরণ হওয়ায় তাহার অন্তর অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে

লাগিল। তিনি এরূপ পরিশ্রম সহকারে বিদ্যাভ্যাসে রত হইলেন যে, অল্পদিনের মধ্যেই ফ্রেঞ্চ, ল্যাটিন ও জর্ম্মান ভাষায় এবং অন্য বিদ্যায় পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। কয়েক মাস অত্যন্ত পরিশ্রমের পর, তিনি ... হইলেন এবং তথাকার বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেন। সার্দ্ধ দ্বিবৎসর কাল এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া, মুলার হিব্রু ও গ্রীক্ ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইলেন। এই সময় এরূপ পরিশ্রম করিতেন যে, প্রত্যহ প্রাতে চারি ঘটিকার সময় শয্যাত্যাগ করিয়া রাত্রি দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত পুস্তক পাঠ করিতেন।

এক্ষণে মুলারের বয়ক্রম বিংশতিবৎসর। তাঁহার এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল যে, তিনি নবজীবন লাভ করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহার শত শত পুস্তক সমন্বিত একটি সুন্দর পুস্তকাগার ছিল। কিন্তু তাঁহার এক খানিও ধর্ম্মপুস্তক ছিল না। তিনি অন্যান্য সহচরগণের সহিত বৎসরে দুইবার খ্রীষ্টীয় ভোজে (Lord's Supper) উপস্থিত থাকিতেন। কিন্তু বাহ্যিক পরিবর্ত্তনে কোন ফল দর্শিল না। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন;—"আমি এক্ষণে মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক হইয়া উঠিলাম। অধিকন্তু আমি কতদূর দুর্ব্বিনীত হইয়াছিলাম, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। আমি লোকের নিকট হইতে অনেক টাকা ঋণ করিলাম। ঋণ গুলি পরিশোধ করা আমার পক্ষে বড়ই কষ্টকর হইল, এমন কি সেগুলি পরিশোধ করিবার আদৌ উপায় ছিল না, কারণ পিতা আমাকে আমার ভরণ পোষণের উপযোগী অর্থ ব্যতীত অধিক আর কিছুই দিতেন না। এক দিন পিতার নিকট হইতে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া আমার কয়েকটি বন্ধুকে তাহা দেখাইলাম। পর দিন আমি আমার বাক্সের তালা ভগ্ন করিয়া, যেন কতই ভীত হইয়াছি এই ভাবে, বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের গৃহে দৌড়িয়া গিয়া বলিলাম 'কে যেন আমার টাকা চুরি করিয়াছে!' কয়েকটী বন্ধু আমাকে উদ্বিগ্ন দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং আমি যত টাকা চুরি গিয়াছে ভাণ করিয়াছিলাম, তত টাকা আমাকে দিলেন। এই ঘটনা উপস্থিত হওয়ায় কিছুদিন আমার উত্তমর্ণদিগের মুখ বন্ধ করিবার সুন্দর উপায় হইল।

মুলার পরিণামে এইসকল দুষ্কর্ম্মের জন্য অনেক কষ্ট পাইয়াছিলেন। তাঁহার পীড়ার সময় অধ্যক্ষের পত্নী অনেক দিন তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। সেই হেতু তিনি অধ্যক্ষ-পত্নীর সম্মুখে স্বচ্ছন্দে দাঁড়াইতে পারিতেন না; কারণ তাহা হইলে তাঁহার পূর্ব্বের প্রতারণার কথা মনে পড়িত। যাহা হউক, তিনি এই বিদ্যালয় ছাড়িয়া হল-বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করিলেন। কিছু দিন পরে তিনি এই বিদ্যালয়ের সভ্য হইলেন এবং সম্মান-সূচক প্রশংসা পত্র প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর তিনি জর্ম্মানীর ধর্ম্মমন্দিরে প্রচারক হইবার ক্ষমতা পাইলেন। এই ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া তিনি তাঁহার চরিত্র সংশোধনে দৃঢ়সংকল্প হইলেন। কারণ সচ্চরিত্র না হইলে কোন প্রদেশের লোক তাঁহাকে যাজক কার্য্যে মনোনীত করিবে না। প্রুসিয়াতে কোন যাজক সম্মানের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে, সচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন না। ইহা বিবেচন

করিয়া মুলার যাজকতা কার্য্যের উপযোগী শিক্ষা আরম্ভ করিবার সময়ে অনেকগুলি প্রতিজ্ঞা করিলেন। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা বিফল হইল। হল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াই পূর্ব্বকার কুকার্য্য সকল অনুসরণ করিলেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে সমস্ত অর্থব্যয় করিয়া ফেলিলেন, পরে বস্ত্র এবং ঘড়ি বন্ধক দিয়া টাকা কর্জ করিয়া পাশকাদি ক্রীড়ায় প্রমত্ত হইলেন। এই রূপে কয়েক মাস কাটিয়া গেল।

কখন কখন মুলার ও কয়েকটী সহপাঠী একত্র হইয়া সমস্ত মূল্যবান পুস্তক বন্ধক রাখিয়া দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। একবার ভ্রমণে তাঁহারা ত্রয়োশ্চত্বারিংশ দিবস অতিবাহিত করেন। মুলার স্বীকার করেন যে, তিনি নিজের খরচ কমাইবার জন্য সাধারণের টাকা হইতে কিছু কিছু আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া, ভ্রমণকালীন যে অর্থব্যয় হয়, তাহার হিসাব বুঝাইবার সময় অনেক গুলি অসত্য বলেন। বোধ হয়, যে কয় সপ্তাহ মুলার বাটীতে ছিলেন, সে সময় অত্যন্ত মনে কষ্ট পাইয়া ছিলেন এবং অনুষ্ঠিত পাপাচরণের জন্য অনুতাপ-দাহন অনুভব করিয়া সৎ হইবার জন্য অন্তরের সহিত প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। পরন্তু বিদ্যালয়ে প্রত্যাগমন করিয়া সে সমুদয় প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় দুষ্কর্ম্মে রত হইলেন।

এখন হইতে তাঁহার সকল পাপ ও ক্রটী সত্ত্বেও তাঁহার জীবনের যথার্থ পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। মুলার বিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিলেন। তিনি পুরোহিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, ইতি মধ্যেই ধর্ম্ম প্রচারে অনুমতি পাইলেন; কিন্তু এ পর্য্যন্ত ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করেন নাই,— বাস্তবিক ধর্ম্ম পুস্তকের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ অতি অল্পই ছিল। তিনি বলেন, জগৎপিতা জগদীশ্বর তাঁহাকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত জীবনের পাপ সকল তাহার সম্মুখে সাজাইয়া রাখিয়া ছিলেন, এবং তাঁহার বিবেক কে এরূপ তাড়না করিয়াছিলেন যে, তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। এপর্য্যন্ত তিনি ধর্ম্মপুস্তকের উপদেশ শ্রবণ করেন নাই, অথবা ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে জীবন অতিবাহিত করিতে অভিলাষী কোন ধর্ম্ম-যাজকের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। মুলার উদ্দেশ্য-বিহীন হইয়া কখন লেখা পড়ায় অবহেলা করিতেন, কখন বা পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইতেন, আবার কোন কোন সময় অনুষ্ঠিত অসদাচরণের বিষয় আন্দোলন করিয়া, পরিণামে সাধু ও সজ্জন হইবার নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতেন। এই রূপে তাঁহার বাল্য ও যৌবনের সমগ্র সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার বাল্য-জীবন কোন ক্রমেই আশাপ্রদছিল না। চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের নিকট ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব বোধ হইয়াছিল যে, এই অলস ও অনৃতবাদী বালক, এই আমোদপ্রিয় দুঃশীল ছাত্র একদিন ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য, সহৃদয়-শ্রেষ্ঠ, ধর্ম্মভীরু, প্রার্থনাশীল খ্রীষ্টিয়ান প্রবর বলিয়া পরিগণিত হইবে! মুলার এই সকল ঘটনা স্বকীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার এই সকল ঘটনাবলী উল্লেখের উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহার ন্যায় অবস্থাপন্ন যুবকগণ উৎসাহিত হইবে এবং ঈশ্বরানুগ্রহে হতাশ হইবে না। যে মহান পরমেশ্বরা

তাঁহাকে পাপের অন্ধকূপ হইতে পুণ্যময় জ্যোতিতে আনিয়াছেন, সেই ঈশ্বরের মহিমা প্রকটিত করাও অপর এক উদ্দেশ্য। তাঁহার সমস্ত ইতিহাস উপদেশে পূর্ণ; কারণ বাল্যকালে চিন্তা শূন্য ও অসৎ কার্য্যানুরক্ত হইলেও, তিনি করুণা উপাসনাশীলতা ও পরোপকারের নিমিত্ত প্রথিত-নাম হইয়াছেন। অধিকন্তু পূর্ব্বে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে এবং পরে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হইবে, সে সকল সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে, কারণ এই সকল ঘটনা তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত।

শ্রীরাখাল চন্দ্র মিত্র।

মাঘভট্ট।

সংস্কৃত ভাষা, পুরাতন ও অপ্রচলিত হইলেও, আজ কাল দেশীয় বিদেশীয় কৃত বিদ্যমাত্রেই এই ভাষার অসাধারণ মাধুর্য্যে বিমুগ্ধ। কি প্রাচীন কি নব্য শ্রেণী, কে না ইহার রসাস্বাদন করিতে পারিলে কৃতার্থম্মন্য হন? সেই সংস্কৃত ভাষায় যে সকল মনীষা-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মাঘভট্ট এক জন সুবিখ্যাত। এই কবির এতদূর সৌভাগ্য যে মাঘের শিশুপাল বধ কেন, যাঁহারা কোন দিন কোন ভাষার কোন কাব্যের রসাস্বাদন করেন নাই, তাঁহারাও মাঘের নাম ধ্বনিত হইবামাত্র আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠেন। এই কবির সম্বন্ধে কতকগুলি শ্লোক ও শ্লোকাংশ শিষ্ট সমাজে প্রচলিত, সেগুলি এই,যথা,—"উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থ গৌরবং। নৈষধে পদ লালিত্যং মাঘেসন্তি ত্রয়োগুণাঃ॥ অপিচ। কাব্যেষু মাঘঃ কবি কালিদাসঃ। অপিচ। তাবদ্ভা ভারবে র্ভাতি যাবন্মাঘস্য নোদয় ইত্যাদি।

এই কবির জীবনচরিত আলোচনা করা অপেক্ষা ইঁহার কৃত কাব্যের আলোচনায় সমধিক ফল; কেননা ভারতীয় কোন কবির বা গ্রন্থকারের ধারাবাহী ইতিবৃত্ত পাইবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং সামান্য কিঞ্চিৎ অবগত হইয়া সমস্ত অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া লেখা অপেক্ষা অন্য প্রকার উপন্যাস লেখা বরং ভাল। আমাদের দেশে মাঘ নামে যে কাব্য প্রচলিত, উহার প্রকৃত নাম শিশুপাল বধ, মাঘভট্টের রচিত বলিয়া মাঘনামেই সচরাচর পরিচিত। শিশুপাল বধ বিংশতি সর্গে বিভক্ত। এই কাব্য বীররস প্রধান, ইহার নায়ক কৃষ্ণ, প্রতিনায়ক শিশুপাল। চেদিরাজ শিশুপালের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া দেবতারা, দেবর্ষি নারদকে কৃষ্ণের নিকট দ্বারকায় প্রেরণ করিলেন। নারদের মুখে পিতৃস্বস্রীয় ভ্রাতা শিশুপালের অত্যাচার কাহিনী শুনিয়া দ্বারকা-পতি কৃষ্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং দেবর্ষিকে বিদায় দিয়া ইহার প্রতিবিধানের জন্য বলদেব ও উদ্ধবকে ডাকিয়া মন্ত্রণা করিতে বসিলেন। শেষে স্থির হইল, ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে শিশুপালকে বধ করা হইবে। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের দূত নিমন্ত্রণ পত্র লইয়া আসিয়াছিল। কৃষ্ণ সপরিবারে ইন্দ্রপ্রস্থ

যাত্রা করিলেন, পথি মধ্যে রৈবতক পর্ব্বতে কিছু কাল বিহার করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত হইলেন। ভীষ্মের পরামর্শে কৃষ্ণকেই যজ্ঞীয় অর্ঘ্য প্রদত্ত হইল। তাহাতে শিশুপাল ও তৎপক্ষীয় রাজন্যবর্গ কুপিত হইয়া উঠিল, এবং ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা আর কৃষ্ণকে শিশুপাল গালি দিতে লাগিল। পরে উভয় পক্ষের দূতের মুখে কথোপকথন হওয়ার পর যুদ্ধারম্ভ হইল। সেই যুদ্ধে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক শিশুপাল নিহত হইল।

এই মহাভারতীয় ঘটনাই মাঘকাব্যের মূল, সামান্য বিবরণ অবলম্বন করিয়া কবি বিস্তৃত কাব্যরচনা করিয়াছেন। দেখা যাউক, এই কবি কত দিন হইল এই কাব্যরচনা করিয়াছেন। এই তত্ত্ব নির্ণয়ের জন্য পুরাতন কোন লেখকের বাক্য উদ্ধৃত করিবার সম্ভাবনা নাই, অনুসন্ধানের চক্ষে পাঠ করিলে বলা যাইতে পারে, যে কালিদাস ও ভারবির পরে এবং নৈষধকারের পূর্ব্বে মাঘকবি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। প্রমাণের জন্য নিম্নে রঘুবংশ ও মাঘ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।—

প্রসাধিকালম্বিত মগ্র পাদ
মাক্ষিপ্য কাচিদ্দ্রবিরাগমেব।
উৎসৃষ্ট লীলাগতিরাগবাক্ষা
দলক্তকাঙ্কাং পদবীং ততান॥ ৭।

কালীদাস, রঘুবংশ, ৭ম সর্গ।

দাসী আলতা পরাইতেছিল, কোন মহিলা আর্দ্র অলক্তযুক্ত অগ্রপাদ আকর্ষণ করিয়া লইয়া দ্রুতগতি গবাক্ষ পর্য্যন্ত গমন করায় (অজ দর্শনের আকাঙ্খায়) সমস্ত পথ অলক্ত চিহ্নিত হইয়াছিল।

রাভসোনদপাস্য চরণং প্রসাধিকা
করপল্লবাদ্রসবশেন কাচন।
দ্রুতযাবকৈক পদচিহ্নিতাবনি
পদবীং গতেবগিরিজা হরার্দ্ধতাং॥৩৩।

মাঘ, শিশুপালবধ, ১৩শ সর্গ।

দাসী বেশবিন্যাস করিতেছিল, কোন মহিলা (হরির দর্শন লালসায়) কৌতূহল বশতঃ অধীর হইয়া দাসীর হস্ত হইতে চরণ টানিয়া লইয়া হরার্দ্ধদেহা গৌরীর ন্যায় আর্দ্র অলক্ত দ্বারা গবাক্ষ পর্য্যন্ত পথ চিহ্নিত করিয়াছিল।

এই দুইটী শ্লোকের মর্ম্ম পাঠ করিয়া কেনা বলিবেন যে, কালিদাসের শ্লোকটি আদর্শ আর মাঘের শ্লোকটী উহারই অনুকরণ-প্রসূত। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, মাঘ যে ভারবির পরবর্ত্তী, তাহার প্রমাণ কি? এ বিষয়ে মতভেদও অলক্ষিত হয়। তথাপি মাঘ যে পরবর্ত্তী, তাহা প্রদর্শন করা তত কঠিন নহে। যদিচ মাঘ ও ভারবির কাব্য এক প্রণালীতে লিখিত, এবং উভয়েই মহাভারত হইতে প্রায় একপ্রকার ঐতিহাসিক মূল পরিগ্রহ করিয়াছেন, তথাপি ভারবির ভাষার সারল্য ও বর্ণনার সংক্ষিপ্ততা প্রভৃতিই প্রাচীনতার হেতু। মাঘ কবি ভারবির সম্পূর্ণ অনুকরণ করিয়াছেন। ভারবিতে যেমন ব্যাসের সহ যুধিষ্ঠিরাদির সাক্ষাৎকার ও দ্রৌপদীর ওজস্বিনী বক্তৃতা, বনবিহার, জলবিহার, ইন্দ্রকিল পর্ব্বতের বর্ণনা, কিরাতরূপী মহাদেবের সহ অর্জ্জুনের সংগ্রাম, পাশুপতাস্ত্র লাভ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে, মাঘেও অবিকল ঐরূপ কৃষ্ণের সহ নারদের সাক্ষাৎকার, বীররসের অবতারস্বরূপ বলদেবের তেজস্বিনী

ক্রীড়া, বনবিহার, জলবিহার, রৈবতক পর্ব্বতের বর্ণনা, শিশুপালের সহ কৃষ্ণের যুদ্ধ ও শিশুপালবধ। এমন কি, ভারবি গ্রন্থারম্ভে অথ শব্দপ্রয়োগ করিয়াছেন। মাঘও তাহাই করিয়াছেন, ভারবির প্রথম সর্গ বংশস্থবিলছন্দে রচিত, মাঘেরও প্রথম সর্গ উক্ত ছন্দেই লিখিত। অনেক স্থলে ভারবির ভাব মাঘে অনুকৃত হইয়াছে। কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল, তাহাতেই একথা বেশ বুঝা যাইবে।

তথাপি কল্যাণকরীং গিরং তে
মাং শ্রোতুমিচ্ছা মুখরী করোতি ॥ভারবি॥

তাহা হইলেও মঙ্গলময় আপনার বাক্য শ্রবণের ইচ্ছাই আমাকে বলাইতে বাধ্য করিতেছে।

তথাপি শুশ্রুষুরহং গরীয়সী
গিরোঽথবা শ্রেয়সি কেনতৃপ্যতে। মাঘ।

তথাচ আপনার গরীয়সী বাক্যপরম্পরা শ্রবণে আমি অভিলাষী, কল্যাণবিষয়ে কে তৃপ্ত হইতে পারে।

যদিচ মাঘ তাঁহার উর্দ্ধতন কবিদিগের অনুকরণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনায় তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী দেখা যায় না। তিনি অনন্ত জলরাশি সমুদ্রের ও সর্ব্ববিধ সুষমার আকর রৈবতক পর্ব্বতের যেরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হয়।

মাঘের ধীরোদাত্ত নায়ক কৃষ্ণ নৃপতিগণের আধার, মহাভারতে কৃষ্ণের সহস্র কূটনীতির পরিচয় থাকুক, কিন্তু মাঘের কৃষ্ণ সরলতার প্রতিমূর্ত্তি, যেন সর্ব্ববিধ রজোচিত গুণ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে। মাঘের বলদেব বীররসের জ্বলন্ত ছবি, সতেজে প্রদীপ্ত অগ্নিরাশির ন্যায় বিরাজমান। পৃথিবীর মধ্যে তিনি বিক্রমে কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেছেন না, পৃথিবীর রাজন্যবর্গ তাঁহার নিকট তৃণবৎ। মাঘের উদ্ধব ইউরোপের জর্ম্মান বিষমার্কের ন্যায় মন্ত্রনা-কুশল ও ধীর, কিন্তু ইংলণ্ডীয় মন্ত্রী বার্কের ন্যায় ভবিষ্যদ্বক্তা। মাঘ তাঁহার ভীমকে যে বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। সেরূপ তেজস্বিতা ও মহত্বের ছবি কোথাও খুঁজিয়া পাইলাম না। যমক ও অনুপ্রাস সৃষ্টিতে মাঘ অসাধারণ ক্ষমতাশালী। ভট্টিকাব্যের লেখক ভট্টিকবি ব্যতীত তাহার তুল্য শব্দালঙ্কারের মাধুরী কেহই দেখাইতে পারেন নাই। কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

নব পলাশ পলাশ বনং পুরঃ
স্ফুট পরাগ পরাগত পঙ্কজং।
মৃদু লতান্ত লতান্ত মলোকয়ৎ
স সুরভিং সুরভিং সুমনোভরৈঃ॥
নব কদম্বরজোরুণিতাম্বরৈ
রধি পুরন্ধ্রি শিলীন্ধ্র সুগন্ধিভিঃ।
মনসি রাগবতা মনুরাগিতা
নব নব বন বায়ুভিরাদদে।
জগতি নৈশ মশীতকরঃ করৈ
র্বিয়তি বারিদবৃন্দ ময়ন্তমঃ।
জলজরাজিষু নৈদ্রমদিদ্রব
ন্নমহতা মহতাঃ কুচ নারয়ঃ॥

৬ষ্ট সর্গ, মাঘ।

যে উচ্চ কবিহৃদয়ের পরিচয় দিয়া মাঘ প্রাচীন পণ্ডিতগণের হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন এবং প্রাচীনেরা যাঁহাকে সংস্কৃত কবিগণের সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন, তাহার পরিচয় মাঘ ১৬শ সর্গের ২১ হইতে ৩১ শ্লোকে বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহা হইতে দুটী মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম।

সুকুমার মহো লঘীয়সাং
হৃদয়ং তদ্গতমপ্রিয়ং যতঃ।
সহসৈব সমুদ্গিরন্ত্যমী
ক্ষপয়ন্ত্যেব হি তন্মনীষিণঃ॥ ২১।

উপকার পরঃ স্বভাবতঃ
সততং সর্বজনস্য সজ্জনঃ।
অসতামনিশং তথাপ্যহো
গুরুহৃদ্রোগকরী তদুন্নতিঃ॥ ২২।

২১ শ শ্লোক হইতে ২৫ শ শ্লোক ভিন্ন ৩১ শ্লোক পর্য্যন্ত বঙ্গানুবাদ এই:—

আহা লঘুব্যক্তিদের অন্তঃকরণ কি ক্ষুদ্র? যে হেতু হৃদয়স্থ অপ্রিয় ভাব গুলি তাহারা সহসা প্রকাশ করিয়া ফেলে, কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তিরা উহা অতিযত্নে গোপন করেন।২১। সাধু শীল ব্যক্তি সর্ব্বদা সকলের উপকারী, তথাপি তাঁহার উন্নতিতে অসাধুদিগের হৃদয়ে সন্তাপ উপস্থিত হয়, কি আশ্চর্য্য।২২। অন্যের উন্নতি হইলে উত্তম ব্যক্তিরা কিছুমাত্র ব্যথিত হয়েন না, মধ্যম শ্রেণীর লোকেরা কিঞ্চিৎ সন্তপ্ত হইলেও মনোভাব গোপন করেন, কিন্তু অধম ব্যক্তিরা তাহাদের পরশ্রীকাতরতারূপ অসদ্ভাব প্রকাশ করিয়া ফেলে।২৩। রৌদ্র বা তাপ নাশে অক্ষম ফলহীন বা প্রয়োজন বিরহিত পুষ্প কিম্বা সদাশয় ব্যক্তি কর্ত্তৃক ত্যক্ত অবিদ্যমান-রূপিণী গগনলতিকার ন্যায় খলতা কেন বিজ্ঞব্যক্তি অবলম্বন করিবেন।২৪। মহান্ ব্যক্তিরা ক্রোধকে জয় করিয়াছেন, ক্রোধ লঘুব্যক্তিকে বলে জয় করিয়াছে, অতএব পরাজিত ক্রোধ কর্ত্তৃক অভিভূত দুর্ম্মতি ব্যক্তির সহ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি-দের আবার প্রতিদ্বন্দ্বীতা কি? ।২৬। অসাধুদিগের উদ্ধত বাক্যে কি কখন মহান্ ব্যক্তিদের গৌরব নষ্ট করিতে পারে? ধূলি দ্বারা আচ্ছন্নমণির মহামূল্যত্ব কি দূর হয়।২৭। অন্যের পরিতোষ জন্মাইতে পারে, যাহার এমন কোন গুণ নাই, সেই লঘুব্যক্তিই অন্যের দোষ কীর্ত্তন করিয়া আত্মীয় জনকে পরিতুষ্ট করিতে ইচ্ছা করে।২৮। অসাধুরা নিজের দোষ অতিমহৎ হইলেও স্বভাবতঃই উহা দেখিতে পায় না, কিন্তু অন্যের দোষ দর্শনে সূক্ষ্ম দৃষ্টি এবং আত্ম-প্রশংসায় বড় প্রগল্ভভাসী, অপিচ অন্যের প্রশংসার অবসর উপস্থিত হইলেই মৌনাব-লম্বন করিয়া থাকে।২৯। উন্নতমনা ব্যক্তিরা অন্যের দোষ প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়াও উহা চিরকালের জন্য গোপনের নিমিত্ত অতিশয় নৈপুন্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু আত্মগুণ প্রকাশের জন্য কোনই কৌশল করেন না।৩০। মহাত্মা ব্যক্তি সর্ব্বলোকে প্রখ্যাত আত্মগুণ কেনই বা প্রকাশ করিবেন, ক্ষুদ্রব্যক্তির গুণের বক্তা অন্য কেহ নাই, তজ্জন্যই সে আত্মপ্রশংসা নিজেই করিতে বাধ্য হয়।৩১।

মাঘ, কবি ছিলেন বলিয়া যে বিজ্ঞান বা দর্শন শাস্ত্র জানিতেন না, এমন নহে, তিনি স্বরচিত গ্রন্থে বিজ্ঞান ও দর্শনজ্ঞতার সুন্দর পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। দিবসে গগনাবলম্বী নক্ষত্রগণ কেন অদৃশ্য হয়, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে ইউরোপীয় বিজ্ঞান খুজিবার আবশ্যক হয়, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই, কবি উক্ত বিজ্ঞান না জানিয়াও উহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

দদৃশে ভাস্কর রুচাংহ্রি নভঃ
সতমীস্তমোভিরভিগম্যতত্তাং।
দ্যুতিমগ্রহো দগ্রহ গণোলঘবঃ
প্রকটি ভবন্তি মলিনাশ্রয়তঃ॥

৯ম সর্গ, ম,ঘ।

যে গ্রহগণ সূর্যের কিরণে দিবসে পরিলক্ষিত হয় না, সেই গ্রহগণ অন্ধকারময়ী রজনী প্রাপ্ত হইয়া দীপ্তিলাভ করিয়া থাকে, ক্ষুদ্রেরা প্রায়ই নীচের আশ্রয়ে প্রকাশিত হইয়া থাকে। *

মাঘ প্রথম সর্গে সাঙ্খ্যমতাবলম্বী হইয়া কৃষ্ণকে প্রকৃতি ও পুরুষের অন্যতর পুরুষ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। যথা,—

উদাসিতারং নিগৃহীতমানসৈ
গৃহীত মধ্যাত্ম দৃশা কথঞ্চন।
বহির্বিকারং প্রকৃতেঃ পৃথক্বিদুঃ
পুরাতনং ত্বাং পুরুষং পুরাবিদঃ॥ ৩৩।

১ম সর্গ, মাঘ।

পূর্ব্বজ্ঞ কপিলেরা তোমাকে পুরাতন পুরুষ বলিয়া জানেন, সংযতচেতাঃ যোগীরা তোমাকে অধ্যাত্মনয়নে কথঞ্চিৎ সাক্ষাৎকার করিয়াছেন। তুমি উদাসীন (অর্থাৎ প্রকৃতি স্বার্থ প্রবৃত্ত হইলেও তুমি স্বয়ং অপ্রাকৃত বলিয়া প্রকৃতি কর্তৃক অস্পৃষ্ট) এবং বিকার হইতে বহিঃস্থ ও মহদাদি হইতে পৃথক্॥

মাঘকৃত শিশুপালবধ পাঠ করিয়া যেমন আনন্দ, তেমন ক্ষোভও উপস্থিত হয়। যদি ১৯শ সর্গের একাক্ষরী, দ্ব্যক্ষরী সমুদ্গ, গোমূত্রিকাবন্ধ, অতালব্য, নিরোষ্ঠ্য, অসংযোগ, অর্থত্রয়বাচী, সর্ব্বতোভদ্র, প্রভৃতি রচনা করিয়া তিনি মূল্যবান্ সময় ও চিন্তা ব্যয় না করিতেন, তাহা হইলে মাঘকৃত আরও কত কাব্য পাঠ করিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিতাম! পূর্ব্বতন কবিদিগের রুচি প্রদর্শনের জন্য কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল।

একাক্ষরী।

দাদদো দুদ্দ দুদ্দাদী
দাদাদো দূদদী দদোঃ।
দুদ্দাদং দদদে দুদ্দে
দদা দদ দদো দদঃ॥ ১৪৪।

সর্ব্বতোভদ্র।

স কা ব না না ব কা স
কা য সা দ দ সা য কা
ব সা হ বা বা হ সা ব
না দ বা দ দ বা দ না। ২৭।

১৯শ সর্গ মাঘ।

এই চিন্ময় শ্লোকটীর যে দিক হইতেই পাঠ করা যাউক না কেন, এক রূপ অর্থ উদ্ভাবিত হইবে।

উদ্ধৃত দুইটী কবিতা ও ষষ্ঠ সর্গের কয়েকটী কবিতায়, শব্দের বৈচিত্র্য ব্যতীত তত ভাবের মাধুর্য্য নাই, সুতরাং অনুবাদ করা নিষ্প্রয়োজন। প্রাচীনেরা মাঘকে কালিদাস ভারবি অপেক্ষা উচ্চতম স্থান প্রদান করিলেও ফলতঃ তিনি এই উভয় কবির নিম্নে ও অন্যান্য কবির উচ্চে আসন পাইবার যোগ্য। সংস্কৃত সাহিত্য সংসারে কালিদাস অদ্বিতীয়, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই, তাঁহার নিম্নেই ভারবি, কারণ মাঘের বর্ণনার আতিশয্য প্রভৃতি যে সকল দোষ আছে, ভারবিতে উহা নাই—"ভারবেরর্থ গৌরবং" এই কথাটী পক্ষপাত শূন্য ও সার্থক। কিন্তু যদিও মাঘ সংস্কৃত সাহিত্যের তৃতীয় কবি কিন্তু ভবভূতি ভিন্ন অন্য কেহই তাঁহার নিকটে আসন পাইবার যোগ্য নহে। নৈষধকার শ্রীহর্ষ তাঁহার অনেক নিম্নবর্ত্তী। শিশুপাল বধের শেষ ভাগে কবির যে বংশাবলী লিখিত হইয়াছে, উহা হইতে আমরা প্রবন্ধান্তরে মাঘ ভট্টের আবির্ভাব কাল ও সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত প্রকটনের চেষ্টা করিব।

শ্রীশরচ্চন্দ্র কাব্যরত্ন।

---

* সূর্য্য কিরণে নক্ষত্রগণের অদৃশ্য হওয়ার বিষয় ভাস্করাচার্য্য কৃত সিদ্ধান্ত শিরোমণি (প্রাকৃতিক বিজ্ঞান) নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

ত্রিপুরারাজ্য, বর্ত্তমান মহারাজা ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কুকিদিগের অত্যাচার কাহিনী বর্ণন করিব বলিয়া আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। কুকিদিগের জাতীয় ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা আমাদের অভিপ্রায় নহে। সুতরাং রণ-দুর্ম্মদ কুকিদিগের দ্বারা ব্রিটীস ভারতের পূর্ব্ব সীমান্তে যে সকল লোমহর্ষণ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, এস্থলে তাহাই সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। *

ভাষাতত্ত্বালোচনা দ্বারা অনুমিত হইয়াছে যে বাঙ্গালার পূর্ব্বদিকস্থ পর্ব্বতবাসী মানবগণ সকলেই এক বংশ সম্ভূত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহাদিগকে তিব্বতি-ব্রহ্মবংশজ বলিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ইহাদিগকে "লৌহিত্য" বংশজ বলিয়া উল্লেখ করা সঙ্গত বোধ হইতেছে। এই লৌহিত্য বংশের একটি প্রধান শাখা "তাঔংতা" শব্দে আখ্যাত হইয়া থাকে। তাঔংতাগণ অনেকগুলি শ্রেণী বা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া থাকে, যথা, মরুং (ত্রিপুরা,) রিয়াং, রাংখল চিলু, পৈতু, গজাক (খচাক) তাঙ্গন, কামহাউ, হাউলং, সাইলু, সিন্দু প্রভৃতি। পূর্ব্বকালে তাঔংত বংশীয় মরুংগণ বিশেষ পরাক্রমশালী ছিল। ত্রিপুরার মহারাজ মরুংজাতির সরদার। সুতরাং পরাক্রমশালী মরুংদিগের সাহায্যে তিনি সমস্ত তাঔংতা বংশকে স্বীয় করতলস্থ করিয়াছিলেন। তাঔংতা বংশীয়দিগের মধ্যে মরুংদিগকে ত্রিপুরা ও অন্যান্য মানবগণকে বঙ্গবাসীগণ কুকি আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু কাছারবাসীগণ ইহাদিগকে লুচাই নামে পরিচিত করিতেন, আমাদের রাজপুরুষগণ কাছারীদিগের নিকট হইতে "লুসাই" শব্দটী গ্রহণ করিয়াছেন।

মুসলমানদিগের সহিত অবিশ্রান্ত কলহ করিয়া যখন ত্রিপুরেশ্বর দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন, তখন ত্রিপুররাজবংশীয়গণ আত্ম কলহ দ্বারা রণ-দুর্ম্মদ কুকিদিগকে অধীনতা-শৃঙ্খল ছিন্ন করিবার পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন। বিগত শতাব্দীর অন্তভাগে ইহার সূত্রপাত হয়। তদবধি দুর্দ্দান্ত কুকিগণ পার্ব্বত্য প্রদেশ অতিক্রম করিয়া বঙ্গীয় সমতলক্ষেত্রে প্রবেশ করত নানা প্রকার অত্যাচার করিয়া আসিতেছে।

রামগঙ্গা ও দুর্গা মানিক্যের কলহ কালে ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে পৈতু কুকিগণ ত্রিপুরা আক্রমণ করে। তৎকালে ব্রিটীস গবর্ণমেণ্ট সৈন্য দ্বারা ত্রিপুরেশ্বর রামগঙ্গা মাণিককে সাহায্য না করিলে রামগঙ্গা সপরিবারে কুকিদিগের দ্বারা নিহত হইতেন।

১৮২৪—১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী কালে শম্ভুচন্দ্র ঠাকুরের প্ররোচনায় কুকিগণ ত্রিপুরার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল।

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কুকিগণ ত্রিপুরা রাজবংশীয় রামকানু ঠাকুরের সহিত সম্মিলিত

---

* কুকিদিগের অত্যাচার কাহিনী বিস্তৃত ভাবে লিখিতে গেলে এক বৎসরের নব্যভারতেও তাহার স্থান সঙ্কুলন হইবে কিনা সন্দেহ, এজন্য আমরা সংক্ষেপে লিখিতে মনস্থ করিয়াছি।

হইয়া ত্রিপুরার অন্তর্গত খণ্ডল পর্য্যন্ত নর-রুধিরে পৃথিবী রঞ্জিত করিয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত লোমহর্ষণ ঘটনাগুলি এবং তৎপরবর্ত্তী আরও কয়েকটা ঘটনা প্রধানত পৈতু কুকি দ্বারা হইয়াছিল, এজন্য এস্থলে আমরা তাহাদের রাজবংশের একটী বংশাবলী অঙ্কিত করিতেছি। বিগত শতাব্দীর অন্তকালে পৈতু কুকির প্রধান সরদার শিব্‌বুত ২৫ হাজার কুকি পরিবার লইয়া স্বীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল। কিন্তু তাহার উত্তর পুরুষদিগের মধ্যে অদ্যাপি কেহ কেহ স্বাধীন রহিয়াছে; অন্যেরা ত্রিপুরেশ্বরের অধীনতা স্বীকার পূর্ব্বক তাহাদের জাতীয় প্রথা অনুসারে কর প্রদান করিয়া থাকে।
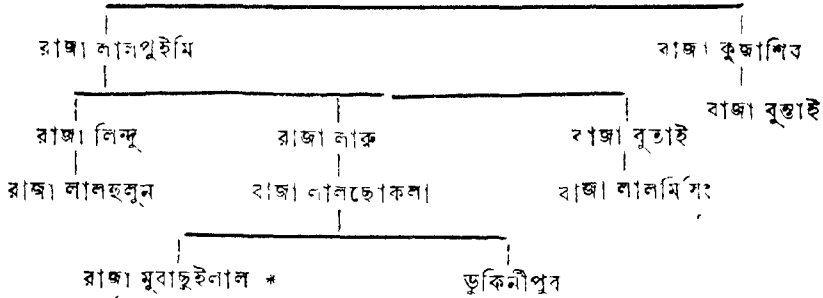
১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের অন্তভাগে পরাক্রমশালী পৈতু কুকিসরদার লারুর মৃত্যু হয়। তাহার উপযুক্ত পুত্র লালচোকলা পিতার ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য উপযুক্ত রূপ সম্পন্ন করিবার জন্য মানস করিলেন। এরূপ এক জন পরাক্রমশালী বীরের শ্রাদ্ধ কার্য্য কখনই নরমুণ্ড ও দাসদাসী ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারে না। বিশেষত ব্রিটীশ রাজ্যের অস্ত্র শস্ত্র বিহীন অধিবাসী না হইলে নরমুণ্ড কিম্বা দাসদাসী সংগ্রহের সুবিধা হয় না। সুতরাং বীরবর লালচোকলা ত্রিপুরা পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ এপ্রিল রাত্রে শ্রীহট্টের অন্তর্গত প্রতাপগড় পরগণার মধ্যগত কচুবাড়ী নামক গ্রাম আক্রমণ করিয়া ২০টি নরমুণ্ড ও ৬টি দাসদাসী সংগ্রহ করিলেন। শ্রীহট্টের মাজিষ্ট্রেট এই লোমহর্ষণ ঘটনার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিলেন। গবর্ণমেণ্ট অত্যাচারকারীগণকে ধৃত করিবার জন্য ত্রিপুরার মহারাজকে লিখিলেন, মহারাজ ত্রিপুরেশ্বরদিগের চিরঅভ্যস্থ প্রথানুসারে তদুত্তরে লিখিলেন যে, "ইহারা তাহার অধীনস্থ নহে।" * কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া পুনর্ব্বার মহারাজকে অত্যাচারী কুকিদিগকে ধৃত করিবার জন্য লিখিলেন। অগত্যা মহারাজ বাধ্য হইয়া এক জন দারোগাকে ১০ জন বরকন্দাজের সহিত লাল চোকলা'কে ধৃত করিবার জন্য প্রেরণ

* মুরছাইলালের রাণীবাচুথাঙ্গী সুবিখ্যাত "লুসাই" সরদার হুকপুইলালের ভগিনী।

* অনেক সময় ত্রিপুরেশ্বর কুকিদিগকে তাহার অধীনস্থ নহে বলিয়া গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছিলেন। কিন্তু এবম্প্রকার অবস্থায় মণিপুরেশ্বরগণ ইহা কখনও স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের ইঙ্গিত পাইলেই কুকিদিগের দমনজন্য সৈন্য প্রেরণ করিয়া আপনাদের রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতেই রাজ্যের বর্ত্তমান আয়তন ত্রিপুরা রাজ্যের দ্বিগুণ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এরূপ উত্তর প্রদান পূর্ব্বক ত্রিপুরেশ্বরগণ তাহাদের রাজ্য নিতান্ত খর্ব্ব করিয়া লইয়াছেন।

করিলেন। ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষগণ তৎসংবাদ শ্রবণে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। ইহাকে তাঁহারা একটী প্রহসন বলিয়া মনে করিলেন।

প্রবন্ধ-লেখক ইহা বিশেষরূপে অবগত আছেন যে, কুকিরাজ লাল ছোকলা কিয়ৎ পরিমাণে ত্রিপুরেশ্বরের অধীন ছিলেন। লালছোকলার পুত্র মুরছইলালের নাম পাঠকগণ মৎপ্রণীত ত্রিপুরার ইতিবৃত্তে দেখিতে পাইবেন।

গবর্ণমেণ্ট ত্রিপুরেশ্বরের আচরণে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে লিখিলেন যে, আগামী ১লা ডিসেম্বরের পূর্ব্বে প্রকৃত অত্যাচারীকে ধৃত করিয়া গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ না করিলে ব্রিটিস সৈন্যদল তাঁহার রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া অত্যাচারকারীকে ধৃত করিবে। এই ঘটনার পর ত্রিপুরেশ্বর ৪জন কুকি অপরাধীকে ২৭ জন সাক্ষীর সহিত শ্রীহট্টের মেজেষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাহারা মাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রকাশ করিল যে, তাহারা ইহার কিছুই অবগত নহে। এই সকল ঘটনায় কিছু কাল অতিবাহিত হইল, অবশেষে নিরূপিত ১লা ডিসেম্বরে কাপ্তেন ব্লেকউড একদল পদাতি সৈন্য লইয়া ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করত লাল ছোকলার গ্রাম অবরোধ করিলেন।

ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষগণের রিপোর্টে প্রকাশ যে, ৪ঠা ডিসেম্বর লালছোকলা কাপ্তেন ব্লেকউডের হস্তে আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু প্রবন্ধলেখক বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত আছেন যে, ত্রিপুরেশ্বর জনৈক (সেনাপতি কেলি কেরিজী) লালছোকলাকে ধৃত করিয়া ব্লেকউডের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীহট্টে লাল ছোকলার বিচার হয়। সেই বিচারে লাল ছোকলা দ্বীপান্তরে প্রেরিত হইয়াছিল।

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কুকিগণ শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্ত স্থানে ভীষণ অত্যাচার করিয়াছিল, দেড়শতের অধিক প্রজা তাহাতে বিনষ্ট হইয়াছিল। এই সংবাদ গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর হইলে কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু মহারাজ গবর্ণমেণ্টকে জানাইলেন যে, এই ভীষণ হত্যাকাণ্ড তাঁহার রাজ্য মধ্যে হইয়াছে, সুতরাং ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবার, গবর্ণমেণ্টের কোন অধিকার নাই। কিছু কাল এই কথা লইয়া গণ্ডগোল চলিয়াছিল। অবশেষে কাপ্তেন ফিসারের মানচিত্র দ্বারা ঘটনা স্থানে ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত নির্ণীত হওয়ায় গবর্ণমেণ্টের সৈন্যগণ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদিষ্ট হইয়াছিল। তৎপর মহারাজ এই দুর্বৃত্তদিগের দমন জন্য আর কোন উপায় অবলম্বন করেন নাই।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে সিন্দু, খচাক ও লুসাই প্রভৃতি কুকিগণ, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট ও কাছার দেশে প্রবেশ করিয়া অনেক গুলি লোকের প্রাণ সংহার ও কয়েকখানি গ্রাম ভস্মীভূত করিয়াছিল। এই সময় কুকিগণ প্রায় ৪২ জন লোককে ধৃত করিয়া লইয়া যায়।

আমাদের গবর্ণমেণ্ট কুকিদিগের দ্বারা এই রূপ জ্বালাতন হইয়া তাহাদিগের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিতে মনস্থ করেন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে যখন কর্ণেল লেষ্টার সৈন্য লইয়া কাছার হইতে কুকিদিগের বাসস্থানাভিমুখে যুদ্ধ যাত্রার আয়োজন করিতেছিলেন, সেই সময় পূর্ব্বদিক হইতে

প্রায় ৪০০ কুকি চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশে ও কাছারের দক্ষিণদিকস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে আর একদল কুকি শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাতু থানার নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রবেশ করিয়া, তাহাদের চিরঅভ্যস্থ নরহত্যা গৃহ দাহ প্রভৃতি কার্য্যগুলি সম্পাদন করিয়া পলায়ন করে। লাতুর নিকটবর্ত্তী স্থান ত্রিপুরা-রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া মহারাজ বিশেষ আপত্তি উত্থাপন করিলেন, এবং আক্রমণকারী কুকিগণও ত্রিপুরেশ্বরের অধীনস্থ বলিয়া প্রকাশ হইয়াছিল।

কর্ণেল লেষ্টারের যুদ্ধ যাত্রার ফল মোটের উপর এই হইয়াছিল যে, বিখ্যাত কুকি সরদার স্নুকপাইলাল গবর্ণমেণ্টের আনুগত্য স্বীকার করত বন্ধুত্ব সংস্থাপন করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট কুকিদিগের এই সকল স্বীকৃত বাক্যের প্রতি আস্থা প্রদর্শন করিলেও আমরা এই সকল অসভ্য বর্ব্বরদিগকে কিছু মাত্র বিশ্বাস করিতে পারি না। যাহা হউক, ইহার পর প্রায় দশবৎসরকাল কুকিদিগের দ্বারা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য কোন ঘটনা হয় নাই। কেবল ১৮৫০—৫১ সালে চট্টগ্রামের সীমান্ত কতক গুলি গ্রাম কাঠুরিয়া কুকিগণ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিল। যাহা হউক, আমাদের গবর্ণমেণ্ট নিশ্চিন্ত ছিলেন না। সীমান্ত প্রদেশ রক্ষার জন্য এই সময় যে সকল উপায় অবলম্বন করা হয়, তন্মধ্যে চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য জেলা সৃষ্টি করিয়া তথায় এক জন ইংরাজ সুপারিটেণ্ডেণ্ট সংস্থাপন করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্য বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে খণ্ডলের বিখ্যাত হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হয়। আমরা বাল্য কালে এই ভীষণ হত্যাকাণ্ডের বিবরণ যাহা শ্রবণ করিয়াছি, অদ্যাপি তাহা স্মরণ করিলে দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। পাঠকগণ, সেই দুঃখের কথা কি বলিব। কানপুরে বিদ্রোহী সিপাহিগণ যে লোমহর্ষণ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল, তাহা অনন্তকাল ইতিহাস পটে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। কিন্তু কানপুরের হত্যাকাণ্ডের দ্বিতীয় অভিনয় স্বরূপ খণ্ডলের হত্যাকাণ্ডের বিবরণ কতজন পাঠক অবগত আছেন? আমাদের কর্ত্তৃপক্ষগণের বিজ্ঞাপনীতে এই ঘটনা এই রূপ সামান্য আকারে বর্ণিত হইয়াছে।

"Early in January 1860, reports were received at Chittagong, of assembling of a body of 400 or 500 Kookis at the head of the River Fenny, and soon the tale of burning villages and slaughtered men gave token of the work they had on hand. On the 31st January, before any intimation of the purpose could reach us, the Kookis, after sweeping down the course of the Fenny, burst into the plains of Tipperah at Chagalneyah, burnt or plundered 15 villages, butchered 185 British subjects, and carried off about 100 captive."

এই ভীষণ হত্যাকাণ্ড অবলম্বন করিয়া রাধা মোহন নামক জনৈক গ্রাম্য কবি একটি গীতি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। আমরা বাল্য কালে ইহা শ্রবণ করিয়াছি। সেই কবিতা সম্পূর্ণ রূপে এক্ষণে আমাদের স্মরণ নাই। * তাহার

* এই কবিতার কিয়দংশ যাহা স্মরণ আছে, এস্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল,—

শুন সর্ব্ব সাধু ইহার নির্ণয়,
যেন মতে খণ্ডলেতে কাটা কাটি হয়।

সারাংশ মাত্র স্মরণ রহিয়াছে। তৎকালে যাহারা পলায়ন পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহাদের নিকট এই ঘটনা যেরূপ শ্রুত হওয়া গিয়াছে, এইস্থলে তাহাই প্রকাশ করা গেল।

দেখ মাঘ মাসে শনিবারে শ্রীপঞ্চমী ছিল।
মুনসীর থীল বাজারে বাবু ধুবন্ধর * আছিল।
সেদিন প্রভাত কালে,
করেছিল পূজার আয়োজন,
চিনি শর্করাদি যত লয় মন।
পূজা আরম্ভিল, হেন কালে প্রমাদ ঘটিল।
অকস্মাৎ তিপ্রাকুকি এসে দেখা দিল।
তারা দাও সেল হাতে, বন্দুক কান্ধে দেখিতে ভয়ঙ্কর।
দেখে প্রাণ ভয়ে কাঁপে কালা ভুসঙ্গর।
রণে প্রবেশিল।
যারে পায় কাটিয়ে ফেলায়,
অবনিতে কাটা পরি ধুলাতে লুটায়।
রুধির আবেসিল।
আকাশেতে উড়িছে শকুন। ঘর নিচয় লুঠ করি চালে দেয় আগুন।
তারা খন্তা নিল, কুড়ল নিল আর নিল দাও কাঁচি।
সিন্দুক ভাঙ্গি কাপড় নিল ভাল ভাল বাচি।
* * * *
ঠিক দুপর বেলা হল পুড়ে মুনসী বাড়ী।
সেদিন ফিরে যায়। রাত পোহাল ছিল রবিবার।
কাটা গ্রামে কাটি আসিলেন পুনর্ব্বার।
* * * *
চৈলেছে কোলা পাড়া।
কোলা পাড়া যেতে তারা করেছে গমন।
বাউনালীর † কোলে আনি দিল দরশন।
দেখে গুণাগাজি,
গুণাগাজি এল সাজি, সিকাই সঙ্গে করি।
তিপ্রা কুকি ফিরাইল, বন্দুক আওয়াজ করি।

* কাপ্তেন ধরনীধর সিংহ, ত্রিপুরেশ্বরের এক জন সেনাপতি।

† বাউনালী নদী।

মুনসীবথীল নামক গ্রামস্থ বাজারে ত্রিপুরেশ্বরের জনৈক সেনাপতি—কাপ্তেন ধরণীধর সিংহ কতিপয় সৈন্যের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। ১৬ই মাঘ শনিবার শ্রীপঞ্চমী পূজা ছিল। কাপ্তেন তাহার সঙ্গীয় অস্ত্রশস্ত্রাদি ধৌত ও পরিষ্কার করিয়া পূজার জন্য সুসজ্জিত করিয়া রাখিলেন। এই সময় সংবাদ আসিল যে, ৪০০। ৫০০ কুকি নিকটবর্ত্তী গ্রাম আক্রমণ করিয়াছে। কাপ্তেন মহাশয় এই সংবাদ প্রাপ্ত মাত্র অস্ত্রাদি লইয়া পলায়ন করিলেন। কুকিগণ নির্ব্বিঘ্নে গৃহে অগ্নি প্রদান পূর্ব্বক গ্রামবাসীদিগকে খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিল! যে সকল রমণী শিশু সন্তানের সহিত কুকিদিগের হস্তে ধৃত হইল, কুকিগণ সেই সকল শিশুকে মাতার বক্ষ হইতে কাড়িয়া লইয়া শূন্যে নিক্ষেপ করত নিম্নে সুতীক্ষ্ণ সেল ধারণ করিয়া শিশুগুলিকে বিদ্ধ করিতে লাগিল! হতভাগিনী জননীগণ এই রূপ নির্দ্দয়তার সহিত অপত্য নিধন দর্শনে নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। কুকিগণ পুরুষ মাত্রকেই নির্দ্দয়তার সহিত হত্যা করিয়া যুবতী রমণীগণকে পশুর ন্যায় বন্ধন করত আপনাদের সঙ্গে লইয়া চলিল। তাহারা এই রূপে ১৫ খানা গ্রাম লুণ্ঠন ও ভস্মীভূত ও ১৮৫ জন মনুষ্যের প্রাণ সংহার করত প্রায় একশত জন মনুষ্যকে বন্ধন করিয়া লইয়া যায়। বলা বাহুল্য যে, তন্মধ্যে অধিকাংশ স্ত্রীলোক, বিশেষতঃ যুবতী। এই ১৫ খানা গ্রাম লুণ্ঠন করিয়া তাহারা যে সমস্ত স্বর্ণ, রৌপ্য, ও লৌহ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাই লইয়া গিয়াছিল।

এই সময় গুণাগাজি নামক গ্রামস্থ এক জন প্রধান ব্যক্তি চতুর্দ্দিকস্থ পল্লি সমূহ

অনুসন্ধান পূর্ব্বক প্রায় ২৫।৩০টি বন্দুক সংগ্রহ করিয়া বাউনালী নদীর তটে কুকিদিগকে আক্রমণ করে। কুকিদিগের অধিক বন্দুক ছিল না, সুতরাং তাহারা বন্দুকের মুখে নদী পার হইতে সাহসী না হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে। বিশেষত কুকিগণ প্রায়ই সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হয় না। ভাগ্যিস এরূপ সাহস অবলম্বন না করিলে যে আরও কত গ্রাম ভস্মীভূত এবং কত লোক কুকিদিগের দ্বারা বিনষ্ট হইত, তাহা কে বলিতে পারে?

জেলা ত্রিপুরার মেজিষ্ট্রেট সাহেব এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র পুলিস সৈন্য খণ্ডলাভিমুখে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া কেবল মাত্র কুকিদিগের অত্যাচারের জ্বলন্ত চিহ্ন প্রত্যক্ষ করিলেন। কুকিগণ ইহার পূর্ব্বেই জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছিল।

এই ভীষণ হত্যাকাণ্ডের কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া আমাদের কর্তৃপক্ষগণ যাহা অবগত হইয়াছিলেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি;—

"It was at first supposed that this extended movement on the part of these tribes was directed by certain near relatives of the Tipperah Raja, and was intended to involve that chief in trouble with the English Government. But it was afterwards ascertained, with considerable certainty, that the main instigators of the invasion were three or four Hill Tipperah refugees, Thakurs who had lived for sometime among Kookis, and who took advantage of the ill-feeling caused by ana ttack made by the Raja's subjects upon some Duptung Kookis, to excite a rising, that unfortunately became diverted to British territory. Driven by the Raja from his dominions, these men had formed alliance among the various Kooki tribes of the interior, and year by year villages, supposed to be friendly to the Raja, had been attacked and plunderd, vague rumours of which disturbances had reached our ears. Some of the Raja's own subjects, moreover, exasperated by his constant exactions, were believed to have invited the Kookis to ravage his territories."

উল্লেখিত ভীষণ হত্যাকাণ্ডের মূল কারণ আমরা যাহা অবগত আছি, পাঠকগণ তাহা শ্রবণ করুন। ত্রিপুরার পার্ব্বত্য প্রদেশে রিয়াং নামক সম্প্রদায় আছে, ইহারা কুকিদিগের ন্যায় তত ভীষণ প্রকৃতি না হইলেও, নিতান্ত নিরীহ জাতি নহে। রিয়াংগণ খণ্ডলের বাঙ্গালী মহাজনগণ হইতে সর্ব্বদা টাকা কর্জ লইত। পার্ব্বত্য প্রদেশে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন প্রায় দুই তিন বৎসর শস্য জন্মে নাই। সুদে আসলে অনেক টাকা হইয়া দাঁড়াইল। মহাজনেরা সর্ব্বদা রিয়াংদিগকে টাকার জন্য তাগাদা করিত। তাহারা ইহা অসহ্য বোধে দুথাং ও অন্যান্য কুকিদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া এই কার্য্য সম্পাদন করে। ইহাতে কৃষ্ণ চন্দ্র ঠাকুর প্রভৃতি রাজ বংশীয় কয়েক জন ব্যক্তি সংসৃষ্ট ছিলেন। মতান্তরে পূর্ব্ব দিকস্থ পর্ব্বতবাসী রতনপুইয়া নামক সরদারও ইহাদের সহিত যোগ দিয়াছিল।

কুকিদিগের অত্যাচারে যে সকল খণ্ডবাসী সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল, গবর্ণমেণ্ট

তাহাদিগকে ১৩৭০০ টাকা ক্ষতি পূরণ স্বরূপ প্রদান করেন। ইহার অর্দ্ধাংশ ত্রিপুরেশ্বর হইতে আদায় করা হইয়াছিল।

গবর্ণমেণ্ট উল্লিখিত ভীষণ হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ লইবার মানসে তৎ পর বৎসর শীতকালে একটি যুদ্ধ যাত্রার উদ্যোগ করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে (১৮৬১ খ্রীঃঅঃ জানুয়ারিতে) ও একদল কুকি ত্রিপুরেশ্বর-দিগের প্রাচীন রাজধানী উদয়পুর আক্রমণ করে। উদয়পুরে ত্রিপুরেশ্বরের একটী সেনা-নিবাস ছিল। তাহাতে এক জন হাওলদার ও ২৫ জন সিপাই থাকিত। ইহারা কুকিদিগের নাম শ্রবণ মাত্র, "মেগেজিন" ফেলিয়া পলায়ন করে। কুকিগণ সেই মেগেজিনরে বারুদ ও গুলি গোলা প্রাপ্ত হইয়া প্রবল বিক্রমে উদয়পুর ও তাহার নিকটবর্ত্তী দুই থানা গ্রাম ও একটি প্রকাণ্ড রাজার ভস্মীভূত ও কতকগুলি লোকের প্রাণবধ করিয়া পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করে। তথায় চাকমা সরদার কালিন্দী রাণীর অধিকৃত কয়েক থানা গ্রাম অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের একদল পুলিস সৈন্যের সহিত তাহাদের একটি ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে কুকিগণ বিশেষ রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পর্ব্বতে পলায়ন করিয়াছিল।

এই সকল ঘটনার পর কুকিদিগকে বিশেষ রূপে নির্য্যাতন করিবার মানসে ত্রিপুরেশ্বরের সহিত উপযুক্ত পরামর্শ করিবার জন্য কাপ্তান গ্রেহাম সাহেব আগড়তালায় প্রেরিত হন। সেই সকল বৃত্তান্ত ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

তৎপর বৎসর বর্ত্তমান মহারাজ রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। (১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে) চট্টগ্রামের নিকটবর্ত্তী স্থানে কিম্বা ত্রিপুরা রাজ্যের দক্ষিণাংশে কোন গণ্ডগোল হয় নাই, কিন্তু উত্তরাংশে শ্রীহট্ট জেলায় সীমান্তবর্ত্তী স্থানে আদমপুরের বিখ্যাত হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হয়।

ইতি পূর্ব্বে পৈতু কুকির যে বংশাবলী প্রদর্শিত হইয়াছে, পাঠকগণ তাহাতে দেখিতে পাইবেন যে, লাল ছোকলারপুত্র মুরছুইলাল বিখ্যাত লুসাই সরদার ছুকপাই-লালের ভগিনী ভাঙ্গুইথাঙ্গীকে বিবাহ করেন। কোন কারণ বশতঃ মুরছুই লাল স্বীয় পত্নী ভাঙ্গুইথাঙ্গীকে অপমানিত করেন। উপযুক্ত ভ্রাতার উপযুক্ত ভগিনী সেই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া স্বীয় ভ্রাতা ছুকপাইলালকে তৎ সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তাহাতেই কুকিদিগের মধ্যে একটি গোণ্ডগোল উপস্থিত হয়। মতান্তরে মুরছুই-লালের সহিত ভাঙ্গুথাঙ্গীর বিবাহ কালে, কন্যার যৌতুক প্রদান করিবার জন্য আদমপুর আক্রমণ করিয়া কতকগুলি দাস দাসী সংগ্রহ করা হইয়াছিল। প্রকৃত ঘটনা যাহাই হউক না কেন, মুরছুইলাল, ছুকপাইলাল, রাংবুং ও লালহুলন নামক ৪ জন কুকিরাজা সম্মিলিত হইয়া ত্রিপুরারাজ্যের অন্তর্গত কতকগুলি গ্রাম ও শ্রীহট্টের অন্তর্গত আদমপুরের নিকটবর্ত্তী তিন থানা গ্রাম অগ্নি দ্বারা দগ্ধ ও কতকগুলি লোক নির্দ্দয় ভাবে হত্যা ও কতকগুলি লোক বন্দী করিয়া লইয়া যায়। এই ৪ জন সরদার মধ্যে মুরছুইলাল ও রাংবুং ত্রিপুরেশ্বরের অধীনস্থ এবং ছুকপাইলাল সম্পূর্ণ স্বাধীন, লালহুলুন মুরছুইলালের খুল্লতাত ভ্রাতা ইহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

আদমপুরের হত্যাকাণ্ডের পর ১৮৬২-

৬৩ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্টে বলে ও কৌশলে কুকি সরদারদিগকে বাধ্য করিয়া পূর্ব্বসীমান্তে শান্তি সংস্থাপন করিতে যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছিলেন।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের তদানীন্তন সুপারিটেণ্ডেণ্ট গ্রেহাম রতন পুঁইয়ার সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। তৎকালে ইহা অবধারিত হয় যে সীমান্ত প্রদেশে শান্তি রক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর রতন পুঁইয়াকে ৪০০ টাকা, হাউলংদিগের ৮০০ টাকা ও সাইলো কুকিগণ ৮০ টাকা বার্ষিক প্রদান করিবেন।

উত্তরদিক কাছারের ডিপুটী কমিসনর ষ্টুয়ার্ট সাহেব বিখ্যাত সর্দার ছকপাইলাল ও মোল্লা সরদার বনপুইলালের সহিত সামান্য প্রকারের সন্ধি সংস্থাপন করিয়াছিলেন। স্থকপাইলাল গবর্ণমেণ্টের আনুগত্য স্বীকার করত শান্তি রক্ষা করিলে তাহাকে বার্ষিক ৬০০ টাকা গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রদত্ত হইবে, এরূপ প্রস্তাব হইয়াছিল।

আদমপুরের হত্যাকাণ্ডের সময় কুকিগণ যে সকল স্ত্রীলোককে ধৃত করিয়া লইয়া যায়, তন্মধ্যে কয়েকটি পালাইয়া কাছারে উপস্থিত হইয়াছিল। অন্যান্য স্ত্রীলোকগুলিকে কুকিগণ বিবাহ করে।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশে কুকিগণ নানা প্রকার উৎপাত আরম্ভ করে। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, তাহারা বাঙ্গলার সমতল ক্ষেত্রে প্রবেশ করে নাই।

১৮৬৫ এবং ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কুকিগণ বঙ্গীয় সমতল ক্ষেত্রে কোন অত্যাচার করেনাই। কিন্তু তৎকালেও যে তাহারা তাহাদের চিরঅভ্যস্থ কার্য্যে বিরত ছিল, এমত নহে, কারণ সেই সময় তাহারা আত্মকলহে নিযুক্ত ছিল। সৌভাগ্য বশত আমাদের কর্ত্তৃপক্ষগণের সতর্কতায় তাহারা সমতল ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হয়নাই।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চমাসে প্রায় ৫০০ শত হাউলাং তাহাদের রাক্ষস বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিল। কর্ত্তৃপক্ষগণ রতন পুঁইয়ার দ্বারা এই সংবাদ শ্রবণমাত্র চট্টগ্রামের পূর্ব্ব সীমান্ত রক্ষার জন্য যত্নবান হইলেন। হাউলংগণ সেই দিকে সুবিধা প্রাপ্ত না হইয়া ত্রিপুরা রাজ্যাভিমুখে ধাবিত হইল। সৌভাগ্যবশত হাউলংগণ এবার ত্রিপুরা রাজ্যে কোনরূপ উপদ্রব করিতে সক্ষম হয় নাই।

১৮৬৮—৬৯, ৬৯—৭০, ৭০—৭১ খ্রীষ্টাব্দে ক্রমান্বয়ে তিন বৎসর কুকিদিগের অত্যাচার কার্য্য সমভাবে চলিয়াছিল। কাছারের চাক্ষেত্র হইতে আরম্ভ করিয়া পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত যে সময় যেস্থানে সুবিধা পাইয়াছে, সেই সময় সেই স্থানেই তাহাদের চির অভ্যস্থ গৃহ দাহ,নর হত্যা প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা আপনাদের রাক্ষস বৃত্তি চরিতার্থ করিতে কিছু মাত্র ত্রুটি করি নাই। আমাদের গবর্ণমেণ্ট এই সকল অত্যাচার নিবারণ জন্য যথাসাধ্য যত্ন, পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। কাছারও পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে সৈন্য স্থাপন করিলেন। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের অভ্যন্তরে কি হইতেছে, সেই রাজ্যের পূর্ব্ব দিকস্থ দুর্দ্দান্ত কুকিদিগের সহিত ত্রিপুরেশ্বর কি রূপ ব্যবহার করিতেছেন, গবর্ণমেণ্ট তাহার নিশ্চয় সংবাদ কিছুই প্রাপ্ত হন না। অথচ দুর্দ্দান্ত কুকিজাতিকে দমন জন্য আশু একটী যুদ্ধযাত্রায়

প্রয়োজন হইয়াছে, তৎকালে ত্রিপুরারাজ্যে জনৈক গবর্ণমেন্ট কর্ম্মচারী না থাকিলে তাহার ফল সন্তোষজনক হইবে কিনা, তাহা স্থির বলা যাইতে পারে না। এই সকল কারণে বাধ্য হইয়া গবর্ণমেন্ট ত্রিপুরারাজ্যে একজন পলিটিকেল এজেন্ট নিযুক্ত করেন। কুকি অত্যাচারে জ্বালাতন হইয়া ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালার তদানীন্তন লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সার উইলিয়ম গ্রের প্রস্তাব অনুসারে লর্ড মেও ত্রিপুরা রাজ্যে জনৈক পলিটিকেল এজেন্ট নিযুক্তের প্রস্তাব অনুমোদন করেন। কিন্তু ইহা কার্য্যে পরিণত হইতে আরও দুই বৎসর অতীত হইয়াছিল।

প্রকৃত পক্ষে ত্রিপুরা রাজ্যে পলিটিকেল এজেন্ট নিযুক্ত না করিলে, কাছার ও চট্টগ্রাম প্রান্তে সৈন্য স্থাপন করিয়াও গবর্ণমেন্ট কুকিগণকে সম্পূর্ণরূপে নির্যাতন করিতে পারিতেন না। আভ্যন্তরিক ঘটনা অবগত না হইয়া গবর্ণমেন্টের কার্য্যে দোষারোপ করা বঙ্গীয় সম্পাদকদিগের মধ্যে একটি রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সামরিক বিভাগের প্রতি ত্রিপুরেশ্বরদিগের উপযুক্ত দৃষ্টি না থাকাতেই কুকিগণ এরূপ প্রবল হইতে সক্ষম হইয়াছিল। এসম্বন্ধে মণিপুর পতি-দিগের কার্য্য কলাপ বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। রাজস্ব সম্বন্ধে তুলনা করিতে গেলে মণিপুর-পতি ত্রিপুরেশ্বরের অধীনস্থ প্রধান তালুকদারের সহিত একসঙ্গে স্থা[illegible] প্রাপ্ত হইতে পারেন। মণিপুর-প[illegible] রাজস্ব প্রায় পঞ্চবিংশতি সহস্র মুদ্রা মা[illegible] তথাপি তাঁহার অধীনে চারি [illegible] সুশিক্ষিত সৈন্য রহিয়াছে। কুকি[illegible] মণিপুর রাজ্যে কোনরূপ সামান্য অত্যা[illegible] করিলে মণিপুরেশ্বর স্বীয় উপযুক্ত ও সুশি[illegible] সৈনিকদিগের সাহায্যে তৎক্ষণাৎ তাহা[illegible] প্রতিশোধ লইয়া থাকেন। আর আমা[illegible] ত্রিপুরেশ্বরগণ সেই সকল অত্যাচার [illegible] অপমান নীরবে সহ্য করিয়া থাকেন। ত্রিপুরেশ্বর গীত বাদ্য ও চিত্র বিদ্যা প্রভৃ[illegible] অকর্ম্মণ্য কার্য্যের জন্য এবং পৌ[illegible] দুই গণ্ডা দেওনের কল্যাণ প্রভৃতি বৎ[illegible] যে অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন, সে[illegible] অর্থ সৈন্য বিভাগে ব্যয় করিলে তাঁহার কত উন্নতি ও সম্মান বৃদ্ধি হইতে পারে। তাঁহার ৪০০।৫০০ শত মাত্র সৈন্য আছে, সে গুলিও তত উপযুক্ত নহে। তাহারা আবার নিয়মিত রূপে বেতন প্রাপ্ত হয় না। মহারাজের সৈন্য-গণ নিয়মিত রূপে বেতন না পাইয়া তাহা-দের দুঃখের কাহিনী পলিটিকেল এজেন্টকে জ্ঞাপন করিয়া থাকে। এই সকল দুঃখের কথা কাহাকে বলিব!

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৈলাস চন্দ্র সিংহ।

বিরহ-সঙ্গীত।

১

সিন্ধু ভৈরবী—আড়া।

বলিতে দিয়াছে বিধি, যত সাধ ব'লে যাও।
হাসিয়া মুনার হাসি, যত সাধ হেসে চাও।
এ ভুল ক'রেছি যবে,
সকলি সহিতে হবে;
যা কর তা শোভা পাবে, কর যাতে সুখ পাও।

তোমার সুখের লাগি,
কি না পারি হা অভাগি।
প্রাণ ল'য়ে তুচ্ছ খেলা, হেসে হলাহল দাও।

---

(২)

বেহাগ খাম্বাজ—আড়া।

যত—কর উপহাস,
ভাঙ্গা প্রেম জোড়া দিতে মিছে এ প্রয়াস।
যে স্বপন গেছে দূরে,
সে নেশা আর কি ফিরে।
উড়া পাতা আরো উড়ে লাগিলে বাতাস।

---

(৩)

খাম্বাজ—মধ্যমান।

সুখ সাধে প'ড়ে ভুল-ফাঁদে—
অবোধ মন সদা কাঁদে।
ভাবিয়া না পায় কিছু কি দিয়ে পাষাণ বাঁধে।
বোঝেনি বিভল মন—
প্রেমে আছে বিস্মরণ,
স্বপনেতে জাগরণ, দহন শীতল চাঁদে।

---

(৪)

বাগেশ্রী—আড়া।

ফিরিতে হইবে যদি মিলন-সাগরে এসে,
তা হলে এ খর-স্রোতে কে সাধে—
আসিত ভেসে!
উজানে আধেক বহি,
হৃদে আর বল নাই!
কেমনে ফিরিয়া যাই, সে চির-বিরহ-দেশে।
মিছে ভাঙা গিরি-বাঁধা,
মিছে ত্যজা গুহা-আঁধা,
ভালবেসে ছিনু কাঁদা সেই যদি আগে শেষে।

---

(৫)

টোরি, কাওয়ালী।

আর—সহে না যাতন,
ধরণী হয়েছে পুরাতন।
হেরি উষারূপ-রাশি
মনে পড়ে তার হাসি;
বিধু-কোলে সে বিধু-বদন।
হেরিলে কাননে ফুল
মনে পড়ে সেই ভুল,
সে আকৃতি, সে প্রীতি-নয়ন।
কাঁপে বায়ু ফুলবাসে
মনে হয় সেই শ্বাসে;
বিহগ কূজনে সে বচন।
নবীনতা-হারা ধরা,
স্মৃতি পুরাতনে ভরা!
দাও ভেঙে এ ধরা এ মন—
তবে রে মরণ!

---

(৬)

সফর্দা, আড়া।

কাটে না সময় আর, আসে না মরণ,
বেঁচে আছি—পড়ে আছি জড়ের মতন।
কিছুতে বসে না আশা,
ধরা যেন পর-বাসা;
কোথা পর-ভালবাসা, কোথা সে স্বপন!
কোথা সে সুখের সাধ,
সাধের অবসাদ,
সাধা-সাধি কাঁদা-কাঁদি বাঁধিতে জীবন;
স্রোত-হারা নদী মত,
প'ড়ে আর রব কত!
শুকাতেছি পলে পলে, মরিব কখন?

৭

ঝিঁঝিট, মধ্যমান।

কাঁদিব কত আর
বাঁধিব কত হিয়ে—
যন্ত্রনা সুধু সার
আপনা পরে দিয়ে।
বোঝে না পরে মন,
খোঁজে না পর জন (এ মন)
কেমন সুখ-পণ
স্বপন-খেলা নিয়ে
কাঁদিব কত আর।

৮

সাহানা, যৎ।

সুধু-আঁখির পিপাসা,
হ'তো যদি আজি হায় আমার এ ভালবাসা।
কত ফুল, কত ছবি,
আধ শশী, নব রবি,
কত গিরি, কত নদী মিটাত নয়ন-আশা।
এ যে রে প্রাণের ভুল,
অকাল মরণ-মূল।
শূন্য-পানে চেয়ে চেয়ে শূন্য প্রাণে —
কাঁদা-হাসা!
নহে আঁখির পিপাসা
আমার এ ভালবাসা।

৯

পিলু, যৎ।

সাঙ্গ-পথ দিয়ে ধীরে পথিক গেলো।
মুখ-পানে চেয়ে তার, কার মুখ মনে এলো!
মানুষ মানুষ-কাছে
কি বাঁধনে বাঁধা আছে।
সে আছে সবার পাছে, একি স্মৃতি, একি—
খেলো!
মোরে সুধু দূরে রাখি,
সে আছে সবারে ঢাকি,
যা দেখি তারেই দেখি, একি বেঁধা—
মারা শেল।

১০

হাম্বির, কাওয়ালী।

কোথা তুমি ধ্রুব-তারা।
অকূল বিরহ মাঝে আমি আজি লক্ষ্য-হারা।
গরজে নিরাশা-ঝড়,
অভিমান কড় কড়,
ডোবে ডোবে হৃদি-তরী, ঝর ঝর নিন্দা-ধারা।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

উৎকল-ভ্রমণ।

(পুরীর রাস্তা ও পিপ্‌লী চটী।)

সেই উচ্চ ধূলিময় রাস্তা দিয়া, ফাল্গুন মাসের প্রচণ্ড রৌদ্রের তেজ মাথায় করিয়া গাড়ী, ঈষৎ শব্দ করিতে করিতে চলিল। দুই দিনের অর্দ্ধাহার বা অনাহার, রাত্রের দারুণ পথ-কষ্ট, প্রাতের ভ্রমণ—এ সকলে শরীর অবসন্ন হওয়ারই কথা। এক গাড়ীতে দুই জন, এক জন পীড়িত—গাড়ীর পার্শ্ব ১।।,১৮ হাত বই নয়—তাতে শরীর অবসন্ন, তাতে

পা শুনকণা চতুর্দ্দিকে, তাব ধূলিবাশি ...ীব চতুর্দ্দিকে সদাই উড়িতেছে—কষ্টের ...র সীমা নাই।' কিন্তু এই বিষম কষ্টের মধ্যেও সুখ পাইলাম। পুবীর প্রশস্ত সুদীর্ঘ পথ এক অলৌকিক কীর্ত্তিস্তম্ভ। হিন্দু রাজা-...দের সময়ে এই প্রকাণ্ড পথ নির্ম্মিত। ...সামের ট্রঙ্ক রোড দেখিয়াছি, পরেশনাথ পাহাড় ও বগডরের নীচ দিয়া ভারতের যে প্রকাণ্ড প্রশস্ত ট্রঙ্ক (Great trunk road,) গিয়াছে, তাহাও দেখিয়াছি, কিন্তু তুলনায় পুরীর রাস্তাকে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর বলিয়া বোধ হইল। শুনিলাম, অনেক ইংরাজ-ভ্রমণকারী এই রাস্তাটীকে ভারতের একটী আশ্চর্য্য কীর্ত্তিস্তম্ভ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই রাস্তা নিম্ন ভূমি হইতে অনেক উচ্চ। রাস্তার দুই পার্শে নানা বৃক্ষ সারি সারি বিদ্যমান থাকিয়া প্রাচীন কাহিনী নীরবে ঘোষণা করিতেছে। কোন কোন স্থানের বৃক্ষগুলি আধুনিক। এই সুদীর্ঘ রাস্তা মেদিনীপুর হইতে বালেশ্বর, বালেশ্বর হইতে কটক, এবং কটক হইতে পুরী পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং রাস্তাটী বহুদূর বিস্তৃত। মধ্যে মধ্যে যে সকল বড় বড় নদী পড়িয়াছে, সে সকল নৌকায় পার হইতে হয়, তদ্ভিন্ন ছোট ছোট নদীর উপর বিস্তর প্রস্তর-নির্ম্মিত পুল বিদ্যমান। কটক হইতে পুরী পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে, তাহাতে কয়েকটী অপেক্ষা-কৃত বড় নদী পড়িয়াছে, কিন্তু যে নদী শীত কালে জল-শূন্য, সুধু বালুময়, গরুর গাড়ী তাহার উপর দিয়া চলিয়া যায়। বর্ষাকালে নৌকায় গাড়ী পার হয়। এই রাস্তার মধ্যে যে সকল পুল আছে, সেই সকলের প্রত্যেক পুলেই স্মারক-লিপি ছিল, কিন্তু ইংরাজ-বাহাদুর যে সকল স্মারক-লিপি অন্তর্হিত করিয়া আপন গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্ন করিতেছেন। পুরীর রাস্তা প্রস্তর-নির্ম্মিত। পাহাড় হইতে রাশি রাশি প্রস্তর খণ্ড আনয়ন করিয়া রাস্তার উপরই ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইতেছে, দেখিলাম। সে প্রস্তর অপেক্ষা-কৃত কোমল, ঈষৎ লালবর্ণ, যেন মা-মাটী-না-পাথর। পুরীর রাস্তায় যত যাত্রীর ভিড় হয়, এত আর ভারতের কোন রাস্তায় হয় কি না সন্দেহ। অসংখ্য লোক, অসংখ্য মালের গাড়ী, যাত্রীর গাড়ী—অনবরতই চলিতেছে। দোল ও রথ যাত্রার সময়ের ত কথাই নাই। তখন সময়ে সময়ে রাস্তার লোক ঠেলিয়া চলা দুষ্কর হইয়া উঠে। এই প্রকাণ্ড রাস্তার স্থানে স্থানে যাত্রী-নিবাস বা চটী আছে। চটীতে খড়ের ঘর, পাতকুয়া, কোথাও দুই একটী পুকুর, কোথাও নদী, যাত্রীদিগের ক্লান্তি দূর করিবার জন্য বিদ্যমান আছে। ইংরাজ-বাহাদুর অনেক চটীতে যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য পায়খানা প্রস্তুত করিয়া মহৎ উপকার করিয়াছেন। পূর্ব্বে স্ত্রী পুরুষ অবিভেদে এক মাঠে, পাশাপাশী হইয়া, মল মূত্র ত্যাগ করিত। চাঁদবালীতে এ রূপ দৃশ্য এখনও দেখা যায়,—আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। চাঁদবালী ভদ্রকের অধীন; এইটী জাহাজ হইতে অবতরণের স্থান—এখানে পায়খানার বন্দোবস্ত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। গবর্ণমেণ্ট যে সকল পায়খানা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার একদিকে পুরুষ ও একদিক স্ত্রীলোকের জন্য নির্দ্দিষ্ট,—ঠিক যেন রেলওয়ে ষ্টেসনের বন্দোবস্ত। বড় বড় চটীতে বড় বড় পায়খানা। কিন্তু এই পায়খানার ধারেই—স্থানে স্থানে অসংখ্য নর-কঙ্কাল দেখা যায়। পুরীর পথে যখন কলেরা বা ওলাউঠার ধুম পড়ে,—তখন সৎকার করি-

বার লোক থাকে না। রাস্তার ধারে মৃত, অর্দ্ধমৃত লোকদিগকে ফেলিয়া যাত্রীরা পলায়ন করে। সে অতি ভীষণ দৃশ্য। আমরা স্থানে স্থানে এই রূপ রাশি রাশি নর কঙ্কাল দেখিয়া অনেক বার অশ্রুপাত করিয়াছি, এবং ভাবিয়াছি, যে তীর্থের জন্য এত আয়োজন—সেই তীর্থের পথে চিকিৎসালয়ের কোন বন্দোবস্ত হিন্দু রাজারা কেন করেন নাই? আমাদের দেশের দানের ব্যবস্থা অন্যরূপ। যে পথে সহস্র সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয় সে পথে ঔষধের কোন বন্দোবস্ত নাই, দেখিয়া হৃদয়ে দারুণ ব্যথা পাইলাম। কত ধনী ব্যক্তি এই ভারতে বিদ্যমান, কিন্তু কেহই ইহার সুব্যবস্থা করিতেছেন না; এ দুঃখ আর রাখিবার ঠাঁই নাই। এখন দুই একটী স্থানে গবর্ণমেণ্ট চিকিৎসালয় প্রস্তুত করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার সংখ্যা এত অল্প এবং তাহার বন্দোবস্ত এত সামান্য যে, মানুষ-সাগরের উপর দিয়া যখন প্রবল পরাক্রমে মারিভয়ের ঢেউ চলে, তখন কিছুই প্রতিবিধান করিতে পারে না। যাক। এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে ও সুন্দর রাস্তার শোভা দেখিতে দেখিতে, শারীরিক কষ্টের কিছু লাঘব হইল। গাড়ী চলিতে চলিতে বেলা আনুমানিক দুই ঘটিকার সময় পিপ্‌লীতে পৌছিল। পিপ্‌লী একটী প্রকাণ্ড চটী, এখানে দাতব্য-চিকিৎসালয়, ডাকঘর, থানা, রেজেষ্ট্রারের আফিস পুকুর, বাগান ও বহু দোকান পসারী আছে। এটী যেন একটী ছোট সহরের মত। মধ্যদিয়া পুরীর রাস্তা চলিয়া গিয়াছে;—দুই ধারে সারি২অসংখ্য ঘরবাড়ী। পুরীর সকল চটীতেই বাজার আছে, কিন্তু এখানকার বাজারটী কিছু বড়। বাজারে চিড়া, গুড়, চাউল, ডাইল,তৈল, লবণ,কাষ্ঠ,—এবং সর্ব্বস্থানেই—প্রচুর পরিমাণে পান পাওয়া যায়। পিপ্‌লীতে পৌছিয়াই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিলাম। পথে ভাবিতেছিলাম, পীড়িত বন্ধুকে কি পথ্য দিব, পিপ্‌লীতে পৌছিয়াই দেখি, গাড়ীর নিকট গরম দুধ লইয়া দুই তিনটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক হাজির। এ এক অপরূপ ব্যাপার। পুরী হইতে ফিরিবার সময় এই খানে কত চেষ্টা করিয়াছি, দুধ পাই নাই। কিন্তু আজ দারুণ অভাবের দিনে, বিধাতা অসহায়দিগের জন্য যেন এই মহা আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন! দেখিয়া অবাক হইলাম, চক্ষু হইতে জল পড়িল। বিধাতার এই অযাচিত দান, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে, বন্ধুকে কতক পান করিতে দিলাম, কতক রাখিয়া দিলাম, আমিও কিছু পান করিলাম এবং ভাবিলাম, এই জন্য বুঝি বা সেই কোপিলেশ্বরের পুরীষময় সাগু আনা ঘটে নাই। কতক ক্ষণ পর দেখিলাম, সেখানে মৎস্য ও উপস্থিত। বন্ধুকে কতক সুস্থ করিয়া স্নান করিলাম এবং গাড়োয়ান ভায়ার যত্নে কিছু অন্নাহার করিলাম। এই পিপ্‌লীতে বন্ধুর কয়েকবার দাস্ত হইল। তাহাতেই যেন দারুণ জ্বর পলায়ন করিতে লাগিল। ঔষধ-পথ্যহীন নর-কঙ্কালপূর্ণ সেই রাস্তায়, বিধাতা আমাদিগের প্রার্থনা শুনিয়া যেন আপনি অবতীর্ণ হইলেন। বন্ধুর আরো অনেকবার জ্বর হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু কোন বারই এত অল্পে ছাড়ে নাই। বিধাতার কৃপা স্মরণ করিয়া মোহিত হইলাম দেহের ও মনের ক্লান্তি এই পিপ্‌লী সহরের বাজারে ফেলিয়া বেলা ৫ টার সময় আবার গাড়ীতে উঠিলাম। পিপ্‌লী সহর বহুদূর বিস্তৃত—অর্থাৎ এই রাস্তার বহুদূর পর্য্যন্ত পিপ্‌লীর সজ্জিত গৃহরাজি পরিশোভিত। পিপ্‌লীতে অনেক নারিকেল গাছ আছে, দেখিলাম। এই স্থান হইতে নারিকেল গাছ আরম্ভ। পুরী জেলায় নারিকেল গাছের যেরূপ আমদানী, উড়িষ্যায় আর কোথাও তেমন নাই। পুরী জেলা সমুদ্রের তীরে স্থাপিত, সুতরাং লবণাক্ত, এই জন্যই বুঝি নারিকেলের কিছু অধিক স্ফূর্ত্তি। পুরীর রাস্তা দিয়া গাড়ী ক্রমাগত চলিতে লাগিল। পথে স্থানে স্থানে দস্যুর ভয়, কিন্তু গাড়ীতে যে বিপদ—দস্যুর ভয় করিবার অবসর ছিল না;—সে বিষয় ভাবিবারও সময় ছিল না। গাড়ী ক্রমাগত

চলিল। রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় আর একটী চটীতে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া অল্প বিশ্রাম করা হইল; এবং কিয়ৎ কাল পরেই গাড়ী ছাড়া হইল। গরুভায়াদের আহার খড় ও কুড়া (কুণ্ড) অথবা চূর্ণীকৃত তুষ। এই কুড়া সকল চটীতেই প্রায় পাওয়া যায়। কুড়া জলে মিশাইয়া দিলে গরু-ভায়ারা মহাহ্লাদে তাহা উদরস্থ করে। ইহাতে অধিক সময়ও লাগেনা আছে, অথচ গরু খুব সবল ও সুস্থ থাকে। সমস্ত রাত্রি গাড়ী চলিল। বেলা আট ঘটিকার সময় রাস্তায় যাত্রীর ভিড় বাড়িল। বেলা বৃদ্ধির সহিত ক্রমে ক্রমে বুঝিলাম, আমরা পুরীর নিকটবর্ত্তী হইয়াছি। যাত্রীগণের আনন্দ, উৎসাহ দেখিয়া মোহিত হইলাম, আপনাদিগের ধর্ম্মজীবনকে শত ধিক্কার দিলাম। জগন্নাথের মন্দির দেখিলেই যেন সকল কষ্ট দূর হইবে—এই আশায় তাহারা—সকল কষ্ট ভুলিয়া তীববেগে রুধিরাক্ত পায়ে ছুটিয়াছে। কেহ ছিন্নবস্ত্র জড়াইয়া পায়ের রক্ত নিবারণ করিতেছে, কেহ মস্তকে মলিন বস্ত্রে রৌদ্রের তেজ নিবারণ করিতেছে;—পথকষ্টে শরীর জীর্ণশীর্ণ হইয়া গিয়াছে—কিন্তু তবুও তাহাদের মুখ প্রসন্ন। এমন দৃশ্য দেখিলেও নবজীবন লাভ হয়। আমরা জীবনে আর কখনও এমন দৃশ্য দেখি নাই। জীবন যেন এই পবিত্র দৃশ্য দেখিয়া ধন্য হইল। ক্রমে জগন্নাথ-মন্দিরের গগনস্পর্শী চূড়া দৃষ্টিগোচর হইল। সর্ব্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত নিশান গগনে বাহু তুলিয়া তুলিয়া তুলিয়া যেন যাত্রীদিগকে কত আশার কথা বলিয়া ডাকিতেছে। যখন মন্দিরের নিশান ও শ্বেত চূড়া দৃষ্টিগোচর হইল—তখন চতুর্দ্দিক হইতে মহা কল্লোলে "জয় জগন্নাথ" শব্দ উচ্চারিত হইতে লাগিল। সে যে কি আনন্দের ব্যাপার, সে যে কি উৎসাহের সংবাদ, ভাষায় ব্যক্ত হয় না। আমারা যাত্রীগণের মূর্ত্তিতে ধর্ম্মজীবনের অনন্ত তত্ত্ব পাঠ করিতে করিতে সেই শ্রেষ্ঠতীর্থাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। জনতা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, নানা রূপ বেশধারী পাণ্ডাদের যাতায়াত বাড়িতে লাগিল, অনেক অনেক ছোট ছোট মন্দির সকল দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। এই রূপ মহা সুখ উপভোগ করিতে করিতে গাড়ী ৯ টার সময় আঠারনালার নিকট পৌছিল। লোকে বলে এবং হন্টার সাহেবের পুস্তকে লেখা, আঠার, কিন্তু দুটী রাখাল বালকের কথানুসারে গণিয়া দেখিয়াছি, এই প্রকাণ্ড পুলে আঠার খিলানের পরিবর্ত্তে ১৯টী খিলান আছে। এই পুলটী মারহাট্টাদিগের কীর্ত্তিস্তম্ভ। এত বড় পুল পুরীর রাস্তায় আর নাই। সমস্ত খিলান গুলি প্রস্তর নির্ম্মিত। কখনও যে ধ্বংস হইবে, মনে হয় না।

সাহিত্য-বাজার। (৩)

(সংবাদ ও সাময়িক পত্র।)

গত দুইবারে সাহিত্যের উন্নতি ও অবনতির কথা বলিয়াছি, কিন্তু সংবাদ ও সাময়িক পত্রের কথা কিছুই বলি নাই। সংবাদ ও সাময়িক পত্র সাহিত্য-বাজারের অতি প্রয়োজনীয় জিনিস, জাতীয় অভ্যুত্থানের মূলশক্তি। সর্ব্বদেশের জাতীয় ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায়, সংবাদ ও সাময়িক পত্র ভিন্ন কোন দেশ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। এজগতে সাময়িক পত্রের ন্যায় জাতীয় ভাষার পুষ্ঠ পোষক আর দ্বিতীয় নাই। এই অত্যাবশ্যকীয় জিনিস বাঙ্গালায় কেমন উন্নতিলাভ করিতেছে, বর্ত্তমানে তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা উচিত। পত্রিকাদি সম্বন্ধে সময়ে সময়ে মতামত প্রদানের জন্য আমরা বিশেষরূপ অনুরুদ্ধও হইয়া থাকি। কিন্তু নানা কারণে এ সম্বন্ধে দীর্ঘকাল আমরা কোন কথা বলি নাই। কিন্তু সাহিত্যের উন্নতি অবনতি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় এ সম্বন্ধে দুইচারিটী কথা না বলিলে প্রস্তাবটী

অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। অতি অরুচিকর হইলেও, সেই জন্য, এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন। পূর্ব্বে সংবাদ পত্রের বর্ষ-সমালোচনায় এ কার্য্যটী এক রূপ নির্ব্বাহ হইত। কিন্তু, কি জানি কেন, এখন কোন সংবাদ-পত্রকেই এসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিতে দেখি না। ইহার কারণ কি, জানিনা। অন্যের প্রশংসা অসহ্য, অন্যের উন্নতি-ঘোষণা নিজের পক্ষে অনিষ্টকর, অথবা অন্যকে ভাল বলিলে নিজে ছোট হইতে হয়, সেই সকল কারণ ঘটা সকলের পক্ষে সম্ভব নয় বলিয়াই মনে হয; কিন্তু কোথাও যে এরূপ ঘটে না, তাহাও বলা কঠিন। এই সকল কারণেই হউক, বা অমনোযোগিতার জন্যই হউক, সময়ের অল্পতা প্রযুক্তই হউক, অথবা লোকের অপ্রিয় হইবার ভয়েই হউক,— এখন আর বর্ষ-সমালোচন কালে সম্পাদকগণ সংবাদ ও সাময়িক পত্র সম্বন্ধে আলোচনা করেন না। অমুক রাজা জাগিল, কি অমুক রাজা মরিল, ইহাপেক্ষা সাহিত্য সেবক ও জাতীয় উন্নতি-প্রয়াসীদিগের পক্ষে, কোন পত্রিকার কিরূপ অবস্থা হইল, কোন্ কাগজ নূতন সৃষ্ট হইল, কোন্ কাগজ প্রাণত্যাগ করিল, এই সকল সংবাদ অধিক আকর্ষণের জিনিস। আমাদের দেশে পত্রিকার উন্নতিহইতেছে না কেন? অনেক কাগজই অসময়ে প্রাণত্যাগ করে কেন? এ সকল তত্ত্বের আলোচনা নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এখন এ সম্বন্ধে অনেকেই নীরব। অন্য সকলকে নীরব থাকিতে দেখিয়া আমাদেরও নীরব থাকা উচিত ছিল। কিন্তু এক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া শেষ করিয়া ছাড়া উচিত, বিবেচনায়, এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম।

মানুষ যেসকল কাজ করে, সেসকল কাজেরই একটা লক্ষ্য বা একটা উদ্দেশ্য থাকে। পৃথিবীতে যে সকল মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া যশোমন্দিরে স্থায়ী-আসন লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের লক্ষ্য বাল্যকালেই নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। পৃথিবীতে যত বড় বড় সম্পাদক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সকল সম্পাদকই একটা লক্ষ্যস্থির করিয়া এই কার্য্যে ব্রতী হইয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশটা, কিছু স্বতন্ত্র ভাবে চলিয়াছে। এদেশে লক্ষ্য স্থির অতি অল্প ব্যক্তির হইয়াছে। স্রোতে ভাসমান তৃণ বা বায়ুতে উড্ডীয়মান ধূলিকণার ন্যায় আত্ম-লক্ষ্যশূন্য আমাদের দেশের বহু লোক ঘটনাস্রোতে গা ভাসাইয়া চলিয়াছেন। পরিণাম কেহ ভাবে না, কেহ গণে না। লক্ষ্য স্থির করিয়া অগ্রসর হওয়া যে উচিত, একথা বড় একটা গণনার বিষয় নয়। ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিতে বসিলে, এত অকৃতকার্য্যতা আমাদের দেশের ভাগ্যে ঘটিত কিনা, সন্দেহ।

ধীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে একথা স্বীকার করিতেই হইবে, লক্ষহীনতা বশতই আমাদের দেশের সংবাদ-পত্র বাজারের এত হীনাবস্থা। সম্পাদকীয় কার্য্যটা একটা সখের জিনিসের ন্যায় হইয়াছে। অনেকের পক্ষেই এটা একটা জীবনের ব্রত নয়। কোন রূপ ব্রত গ্রহণ করিলে অল্পে কেহই ছাড়ে না। বাঙ্গালীর গ্রাহকগণের ঘোরতর ঔদাসীন্য এসম্বন্ধে আছে বটে কিন্তু নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিতে গেলে বলিতেই হইবে, দোষ গ্রাহক অপেক্ষা দায়িত্বহীন সম্পাদকগণের অধিক। এই দোষেই অনেক কাগজ দুই এক মাস পরেই উঠিয়া যায। নাম কিনিতেও ইচ্ছা, অথচ দায়িত্ব বোধ নাই, উপযুক্ত আয়োজন নাই, অর্থবল নাই। এরূপ হইলেউন্নতি হইবে কেন, বলত?

অনেক ভাল কার্য্যের সূত্রপাত এদেশে হইয়াছে, কিন্তু বিজ্ঞান-সভা ভিন্ন একটারও ভাল ফল ফলে নাই। বেঙ্গল ব্যাঙ্কিং করপোরেসন হইতে আরম্ভ করিয়া ইণ্ডিয়ান লিগ, রিপন-মেমোরিয়াল-কমিটি প্রভৃতির অকৃতকার্য্যতা স্মরণ করিলে মনে হয় না, কুষ্টাশ্রম (Leper Asylum) ভিক্টরের স্থায়ী মেমোরিয়াল কমিটির দ্বারা সংস্থাপিত হইবে। সকল কাজেই অপরিণামদর্শিতা, বাহ্যাড়ম্বর ও চিন্তাহীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। ভাবিয়া চিন্তিয়া, যে লক্ষ্য স্থির করিয়াকাজ করে, সে অকৃতকার্য্য হইবে কেন,

মোটেই বুঝি না। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই যেন উদ্দেশ্য-হীন লক্ষ্যহীন। জাতীয় সাহিত্যের, যাঁহারা সেবক, তাঁহার সকলই আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। যাঁহারা দেশের উন্নতির জন্য কায়মনোবাক্যে পরিশ্রম করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু বলিতে দুঃখ এবং লজ্জা হয়, বৎসরের মধ্যে কত হিতৈষীর অভ্যুত্থান হয়, আবার পতন হয় ;—কত সাহিত্য-সেবক জন্মগ্রহণ করেন, চক্ষের পলক পড়িতে না পড়িতে, আবার অন্তর্হিত হন ; খুঁজিয়া আর বাজারে পাওয়া যায় না। বৎসরের মধ্যে কত নূতন কাগজ জন্মগ্রহণ করে, কত কাগজ কলেবর ত্যাগ করে, ভাবিলে বিস্ময়ে ডুবিতে হয়। গ্রাহকেরা টাকা দেয় না, লোকেরা সাহায্য করে না, বন্ধুগণ সহানুভূতি প্রকাশ করেন না, একথাত সর্ব্ববাদীসম্মত, জানিয়া শুনিয়া কি-ব্রত গ্রহণ করা উচিত? দোষ গ্রাহকদের, না চিন্তাবিহীন অপরিনামদর্শী সম্পাদকগণের? গত বৎসর এইরূপ চিন্তাবিহীন কত সম্পাদক অভ্যুদিত হইয়া যে জীবনলীলা শেষ করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। দুই দশদিন সখ মিটাইবার জন্য কেন যে এরূপ কার্য্যে সকলে ব্রতী হন, বুঝি না। বর্ত্তমান সময়ে দেশের এরূপ অবস্থা উপস্থিত যে, কোন নবসহযোগীকে জন্ম গ্রহণ করিতে দেখিলে আর আনন্দ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হয় না,—কখন তাহার পতন হয়, এই কথাই মনে জাগে। যে সকল সহযোগীগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া সাহিত্যের সেবা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে স্থির লক্ষ্য ব্যক্তি অনেক আছেন। কেহ কেহ লক্ষ্য পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, এমনও আছেন। কেহ কেহ লক্ষ্য-শূন্য হইয়া রহিয়াছেন, এমনও আছেন। সে সকলের ধারাবাহিক ইতিহাস দেওয়া বড় সোজা কথা নয়, এবং তাহা সকলের প্রিয় হইবারও কথা নয়। আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবে প্রধান প্রধান পত্রের অবস্থা যথাযথ রূপ প্রকাশ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব, কোন পত্রিকার দ্বারা দেশের কিরূপ উপকার হইতেছে। দায়িত্ব-হীন, ভাষা-জ্ঞান-হীন, অন্যের অনিষ্টকারী, "হাম-বড়", যে সকল সম্পাদক বিদ্যমান আছেন, তাঁহারা এ কার্য্যে খুব বিরক্ত হইবেন, জানি। কিন্তু তাঁহাদের বিরক্তির জন্য আমাদের কোনই উপায় অবলম্বনের পথ নাই।

ফুলরেণু।

বিরহ।

মিলন হইতে দেবি! বরঞ্চ বিরহ ভাল,
দেখিব বলিয়া আশা মনে থাকে চিরকাল!
নিরাশা নাহিক জানি,
সদা শুনি দৈববাণী,
মৃত সঞ্জীবনী ভাষা-"বাসি ভাল! বাসি ভাল!"

যে দিকে—যে দিকে চাই,
তোমারে দেখিতে পাই,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব বিশ্ব-রূপে করে আ'ল।

মিলনে বিরহ ভয়,
আকুল করে হৃদয়,
চুম্বিতে চমকি উঠি, নিশি বা পোহায়ে গেল!

সামান্য নারী।

সামান্য নারীটা তার কত পরিমাণ?
শূন্য ক'রে গেছে যেন সমস্তটা প্রাণ?
একটু গিয়েছে হাসি,
একটু গিয়েছে কান্না,
একটু আঁখির জলে মাখা অভিমান!
একটু চুম্বন গেছে,
একটু নিশ্বাস দীর্ঘ,
একটুকু আলিঙ্গন—তৃণের সমান!
যা গেছে সে ক্ষুদ্র গেছে,
প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড আছে,
তবে যে ভরে না কেন তার শূন্য স্থান?
সামান্য নারীটা তার কত পরিমাণ!

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাস

বিদ্যালয়ের নীতিশিক্ষা ও গবর্ণমেণ্ট।

টমসন বাহাদুর যখন বাঙ্গলার তক্ত জলুস করিতেছিলেন, তখন কৃষ্ণনগর, যশোহর ও ঢাকা প্রভৃতি স্থানের বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে লইয়া কয়েকটী মোকদ্দমা হয়। তাহাতে অনেক গৌরাঙ্গ সম্প্রদায়ের চিহ্নিত মহাত্মারা বালকদিগের উপর বড়ই চটিয়া যান। স্বয়ং ছোট লাট টমসন বাহাদুর কলিকাতা সিটি বিদ্যালয়ের গৃহপ্রতিষ্ঠা সভায় যখন প্রবেশ করেন, তখন ছাত্রেরা নাকি তাঁহাকে করতালী দিয়া অভ্যর্থনা করে নাই; আর বড়লাট রিপণ বাহাদুর পৌঁহুছিতে না পৌঁহুছিতে করতালীর বজ্রনির্নাদ হইয়াছিল। তাহাতে ছোটলাট একটু খানি মুখ ভারি করেন। ইহা ছাড়া মফঃস্বলের অনেক বাঙ্গা হুজুর হাটে বাটে মাটে ঘাটে পরিভ্রমণের সময় বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের সেলাম বহুৎ বহুৎ কার্য্যনঞ্চাগে প্রাপ্ত হন নাই, ইহাও শুনিতে পাওয়া যায়। গয়াক্ষেত্রে এক দিন পিণ্ড না পড়িলে গয়াসুর মাথা তোলেন, মা মনসার দুধ কলার বরাদ্দ না হওয়াতে "বেউলা কেঁদে রাঁড় হ'ল"; পূজ্য পূজকের সম্বন্ধ এমন বাঁধাবাঁধি থাকিতেও এত বিভ্রাট কেন ঘটিয়াছিল, বুঝি না। হাজার হইলেও গয়া-ক্ষেত্রে আমাদেরই পিতৃপুরুষের ভূত; মা মনসা আমাদেরই ঘরের ঠাকুর; তাঁহাদিগকে বরং একদিন চটান যায়, কিন্তু যে দেবতা-দিগের সঙ্গে এক সূর্য্যে ধান ভানিয়া খাই-বার সম্পর্কটাও নাই, তাঁহাদিগকে এমন করিয়া ঘাঁটানটা ভাল কি? কাজটা বড় ভাল হয় নাই। এক বৎসর ধরিয়া প্রথমে কাণাঘুসা চলিল, তাহার পর সহসা একদিন লাটের সভায় স্থির হইয়া গেল যে, বিদ্যালয়ের ছাত্রগুলি বড় দুর্বিনীত। নীতিহীনতার পরিচয় আরও দেখা গিয়াছে; রাজপুত্রের অভ্যর্থনায় ছোটলাট বেণী কেলির পক্ষে, বাইনাচের দিকে, বাজীপোড়ানের অনুকূলে; আর চেঙ্গড়া ছেলেগুলি কুষ্ঠরোগীদিগকে দুটী পয়সা দিতে চায়। আর সহ্য হইল না, বালকদিগকে নীতিপরায়ণ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। নীতি-শিক্ষার গ্রন্থও রচিত হইয়াছে; The Government of India নামে এক খানি পুস্তকও বুঝি এই উদ্দেশ্যে।

যে কারণেই হউক, সরকার বাহাদুর যে নীতিশিক্ষার পক্ষপাতী হইয়াছেন, এটা শুভ লক্ষণ। শারীরিক শিক্ষা, মানসিক শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষা, এ সকলি চাই, নহিলে প্রকৃত শিক্ষা হয় না, শিক্ষা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ থাকে, একথা সকলেই মানে। কিন্তু এতদিন দেশীয় লোকের ধর্ম্মের উপর পাছে হাত দেওয়া হয়, এই আশঙ্কায় নীতিশিক্ষার বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট উদাসীন ছিলেন; এখন কিন্তু বেশ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। বড় গভর্ণমেণ্ট হইতে প্রদেশীয় গভর্ণমেণ্ট সমূহের নামে চিঠি জারি হয় যে, বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা অবাধ্য, দুর্বিনীত, বে-আড়া; ইহার কারণ অনুসন্ধান করা চাই এবং প্রতিকারের ঔষধির ব্যবস্থাও করা চাই। লাট সভার নির্দ্ধারণে এ কথা কয়টী এইরূপ আছে:—"In the letter addressed by the Home department

to Local Governments and Administrations, their attention was drawn to the growth of tendencies unfavourable to discipline and favourable to irreverence in the rising Generation in India". প্রদেশীয় গভর্ণমেণ্ট-সমূহ, বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, পবিদর্শক প্রভৃতি মান্যগণ্য ১০ দশ জনের মত জানিয়া পাঠান। এই সকল মত সংগৃহীত হওয়ার পর বড় লাটের নির্দ্ধারণ সহ সেগুলি এক সঙ্গে ২৫৫ পৃষ্ঠার একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়া দুটাকা মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। এগ্রন্থে দেখিবার ও শিখিবার অনেক কথা আছে। এদেশে যাঁহারা শিক্ষা কার্য্যের সহিত সংসৃষ্ট, যাঁহারা বাস্তবিকই দশজনের মধ্যে একজন, এরূপ অনেক ব্যক্তির মত এ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আছে। তাঁহাদিগের মত ও অভিপ্রায়ে নূতনত্ব বড় একটা থাকুক আর নাই থাকুক, খুব বৈচিত্র্য আছে।

বঙ্গদেশের শিক্ষা বিভাগের পরিচালক শ্রীমান ক্রফট্ ও মান্দ্রাজের সরকারী বড় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীমান ডানকান যাহা বলিয়াছেন, এ প্রকাণ্ড গ্রন্থের মধ্যে তাহাই খুব আলোচনার যোগ্য। বালকদিগের দুর্বিনয় রোগের কারণ সম্বন্ধে ডানকান (Duncan) যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতি সার কথা। ডানকান বলেন যে, এ রোগ যে কেবল ভারতবর্ষীয় বালকদিগকেই আক্রমণ করিয়াছে, তাহা নহে। এ সংক্রামক রোগ সমগ্র সভ্য পৃথিবীময় ছড়াইয়াছে। যাহা কালের লক্ষণ, কালের ধর্ম্ম, কালের গতি, তাহা ভারতবর্ষেও দেখা দিয়াছে, তাহার বিচিত্র কি? এ যুগের দর্শন, বিজ্ঞান প্রাচীন কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে; সুতরা নব্য শিক্ষিতেরা প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধাহীন; কোন কথায় আর পীর পয়গম্বর মানে না, দোহাই মানে না। কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি ধর্ম্মনীতি, সকল বিভাগেই গুরুতর বিপ্লব চলিতেছে। ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী একটী বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, নূতন শিক্ষা পদ্ধতি, বিচার পদ্ধতি প্রভৃতি ধীরে ধীরে হিন্দুজাতির চিত্তে এক বিপুল পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে; ইংরাজের ধর্ম্মাধিকরণে ব্রাহ্মণ শূদ্রে, রাজা প্রজায় প্রভেদ নাই; ইংরাজি পাঠশালায় প্রাচীন সংস্কারের নীচ জাতীয় বালক উচ্চ জাতীয় বালককে পরাভূত করিয়া সম্মান লাভ করিতেছে; সুতরাং নূতন ভাব-তরঙ্গের অভিঘাতে চারিদিকে উচ্ছৃঙ্খলতা খুব দেখা দিয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, এই উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ করিয়া যিনি প্রাচীন প্রথার মধ্যে এই যুগের যুবকদিগের মাথা গুঁজিয়া দিতে চান, তিনি প্রবহমান গঙ্গার শ্রোত বাম হস্তে ঠেলিয়া গোমুখীর ক্ষুদ্র গর্ত্তে পূরিবার অভিলাষী। বালকেরা শাস্ত্র মানে না, দোহাই মানে না; বিচার করিয়া আপনার পথ আপনি দেখিয়া লইতে চায়, এসকল কুলক্ষণ নহে, সুলক্ষণ। তবে ইহার সঙ্গে সঙ্গে যে স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা চলিয়াছে, বিচারের নামে দুর্বিনয় স্থান পাইতেছে, তাহার অবশ্যই প্রতিকার চাই। আসল কথা এই, স্বাধীন ভাব বিনষ্ট করিতে না দিয়া বরং যাহাতে স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার হয়, এরূপ শিক্ষা চাই। উচ্ছৃঙ্খল বালকদিগের চিত্ত নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র নেতা চাই। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়, সুসংস্কৃত বিজ্ঞানানুমোদিত নবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া বালকদিগকে নিয়-

মিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন ও পাইতে-ছেন; এবং এবিষয়ে তাঁহার কৃতকার্য্যতা কতদূর, তাহা তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ছাত্রসভার যাঁহারা খবর রাখেন, তাঁহারা বিশেষ সাক্ষ্য দিতে পারেন। ব্রাহ্মদিগের এই সাধু উদ্যমের কথা ক্রফট্ বাহাদুর স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু তিনি বলেন যে, ব্রাহ্মদিগের প্রভাব বালকদিগের উপর খুব বহু বিস্তৃত নহে। এ কথা এ ব্রাহ্মলেখকও স্বীকার করেন। এখন দেখা যাউক, গভর্ণমেণ্ট এই নীতি শিক্ষার ভার লইতে গিয়া যাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহাতে ফলবত্তার আশা কত দূর।

একথা বিচারের পূর্ব্বে, ক্রফট্ মহোদয়ের অভিপ্রায় হইতে দুই একটী কথা তুলিব। ক্রফট্, বহরমপুর বিদ্যালয়ের সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেন্দ্র নাথ শীল মহাশয়ের সারগর্ভ কথা গুলিতে সায় দিয়া সেই গুলি তুলিয়া বলিয়াছেন যে, এদেশের গৃহ সুসংস্কৃত না হইলে বালকদিগকে সুনীতিপরায়ণ করিবার চেষ্টা দুরাশা মাত্র। যে গৃহের পিতামাতার শিক্ষা, রুচি ও মতের প্রতি সন্তানেরা শ্রদ্ধাহীন, সে সংসারের বালকেরা যে বিদ্যালয়ের শিক্ষকের প্রতি বড় একটা শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিতে পারিবে, এ আশা নাই। যেখানে শ্রদ্ধা ভক্তির প্রকৃত শিক্ষা-স্থল, সেখানে যদি তাহা না হয়, তবে বাহিরে হইবে কি প্রকারে? আরও কথা আছে; ছাত্রেরা বিদ্যালয়ে উচ্চ উচ্চ মত শিক্ষা করে, কিন্তু গৃহে সমাজের খাতিরে সে গুলি চাপিয়া রাখিয়া, যাহা মানে না, তাহারই বাধ্যতা স্বীকার করে। এইরূপে গভীর কপটতায় চরিত্রের গ্রন্থি শিথিল হইয়া পড়ে; সুতরাং তাহারা নিজে দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়া আরও ১০ জনকে দুর্নীতি-পরায়ণ করিয়া তুলে। কোন স্থলে পৃথিবী টলিয়া গেলেও আত্মবিশ্বাসের আদর ও সম্মান করিতে হইবে, এবং কোন স্থলে প্রাণ পাত করিয়াও বাধ্য হইয়া চলিতে হইবে, তাহা বড় লোকে বিবেচনা করিয়া দেখিতেছে না; সুতরাং ইহাদের স্বাধীন মন্ত্রে একে আর ফল হইতেছে। একথাও ব্রাহ্মসমাজের নেতাগণ অনেক বার বলিয়া বলিয়া শ্রান্ত হইয়াছেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট কিছু গৃহ সংস্কার করিতে পারিবেন না। তবে বিদ্যালয়ের বালকদিগকে সৎসাহসে অনুপ্রাণীত করিতে চেষ্টা পাইতে পারেন। অবশ্যই ইহা নীতিশিক্ষার একটা প্রধান কথা।

এখন প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে ক্রফটের অভিপ্রায়টা বলি।

ক্রফট্ বলেন যে, যদি বিদ্যালয়ে নীতি-শিক্ষা দিবার প্রয়োজন হয়, তবে ভাল শিক্ষক নিযুক্ত করা চাই। কিন্তু অল্প টাকায় যে ভাল শিক্ষক পাওয়া দুরূহ, সে কথা ক্রফট্ স্বীকার করিয়াও সে সম্বন্ধে আর কথা তুলেন নাই। টাকা খরচ করিতে ক্রফট্ রাজি নহেন; গবর্ণমেণ্টও বলেন যে, ক্রফটের কথা খুব ঠিক। বিদ্যা-লয়ের জন্য অতিরিক্ত টাকা খরচ অপব্যয়; অথচ ভাল শিক্ষকও চাই!! কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে, দিনে দিনে ব্রাহ্মণের গোক্ষুর কিছু অপ্রতুল হইতেছে; টাকার অভাবে অনেক সুযোগ্য শিক্ষকই শিক্ষকতা ছাড়িয়া অন্য বিভাগে যাইতেছেন; কেবল যাহাদের অন্য কোথাও পয়সা হয় না, তাঁহারাই এ বিভাগ উজ্জ্বল করিতেছেন! ভাল শিক্ষকের কথা ঐ পর্য্যন্ত। তার পর ক্রফট্ বলেন যে, নীতিশিক্ষা বলিয়া নীতিশিক্ষা দিতে গেলে

শিক্ষাটা তিক্ত হইয়া উঠিবে, কিছু ফল হইবে না। একথা আমরাও মানি। ওরূপ করিলে নীতিশিক্ষার শ্রেণী, ঠিক পাদরী বিদ্যালয়ের বাইবল শ্রেণীর মত তামাসার জিনিষ হইয়া দাঁড়াইবে। ক্রফটের মতে আমরা সায় দিয়া বলি যে, পড়িবার গ্রন্থই এরূপ স্থির করা উচিত, যাহাতে পরোক্ষভাবে বালকদিগের হৃদয় সাধুতার দিকে আকৃষ্ট হইতে পারে। কিন্তু এরূপ পুস্তক নির্ব্বাচন বড় সহজ নহে। এই অভিপ্রায়ে "Golden Deeds" প্রবেশিকার পাঠ্য করা হইয়াছিল; কিন্তু সে গ্রন্থে যেরূপ খ্রীষ্টানি গোঁড়ামী, এবং অযথা অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে ফল উল্টা দাঁড়াইতে পারে। যাহা হউক, মানিয়া লওয়া গেল যে, ভাল পুস্তক নির্ব্বাচিত হইবে; কিন্তু সর্ব্বত্র শিক্ষা দিবার শিক্ষক কই। টাকা না দিলে ভাল লোক হয় না; গভর্ণমেণ্টও সে বিষয়ে সংযত-হস্ত, তবে উপায় কি? সুতরাং দেখিতে পাইতেছি যে, গভর্ণমেণ্টের এত আয়োজন, এত বাক্য, কালি কলম এবং কাগজ ব্যয়, যেন একটু বৃথা হইবার দিকে চলিল। সুধু কুস্তি করিয়া এবং নির্ব্বাচিত গ্রন্থ পড়িয়াই বালকেরা ভাল হইয়া যদি যায়, ভাল কথা, কিন্তু তাহার আশা আছে কি? †

—o—

জীবন সম্বন্ধে দুই একটী কথা।

'Death doth lurk always in life's delicious cup,
The mulberry leaf must bear the biting of a worm,
That so it may be raised to wear a silken form"

Ruckert.

শৈশবের বিমল জোৎস্না দেখিতে দেখিতে ডুবিয়া যায়; যৌবনের মনোমোহন মাধুর্য্য ও বলবিক্রম স্বপ্নময় জোয়ারের জল; প্রৌঢ়াবস্থা তিন দিনের খেলা, সংসার পাতিতে ও গুছাইতেই ফুরাইয়া যায়; উচিত ব্যবস্থায় ভাল করিয়া জীবন কাটান হয় নাই, সময়ের সদ্ব্যবহার রীতিমত হয় নাই, এই আপশোষে "হায়" "হায়" করিতে করিতে চকিতের ন্যায় বার্দ্ধক্য শেষ হয়; জরা মৃত্যুর পূর্ব্ববর্ত্তী মুহূর্ত্তমাত্র; সকলই ক্ষণস্থায়ী। এই কয়টী আশুপরিবর্ত্তনশীল অবস্থার সমষ্টিকে আমরা মানবজীবন বলি। পশ্চাতে অনাদি ভূত, সম্মুখে অনন্ত ভবিষ্যত, মাঝখানকার এই কয় বৎসরকে বিশেষ মূল্যবান জ্ঞান করিয়া উক্ত আখ্যা প্রদান করি, যেন অগ্রপশ্চাৎ উভয়দিক কিছুই নয়, কেবলই শূন্যময়। এই অতি স্বল্পকাল মধ্যে আমরা কতই দেখি, কতই শুনি, কতই নাচি, কতই গাই। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, প্রত্যেক সুদীর্ঘজীবী মনুষ্য জন্মাবধি মৃত্যু

† হউক বা না হউক, সে কথার বিচার পরে। গভর্ণমেণ্টের একাজটা যে মন্দের ভাল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমরা গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করি, একাজে একটু মুক্ত হস্ত হউন। ন, স।

পর্য্যন্ত গড়ে প্রায় ১৬০০০০০০০০০ ভাব (Impressions) গ্রহণ করিয়া থাকেন। * এই প্রকাণ্ড সংখ্যক ভাবের ছবি কোন্ স্থানে সমাবিষ্ট, চর্ম্মচক্ষুতে তাহা দেখিবার জো নাই। এই ভাবসমষ্টির আধার মানবাত্মা। ভুক্ত, পীত, এবং নিশ্বাস ত্বকাদি দ্বারা গৃহীত পদার্থ নিচয় যেমন সুসূক্ষ্ম অবস্থায় দেহ ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে, ভাবসমূহ সেইরূপ আত্মাতে স্থান পাইয়া তাহার পোষণ ক্রিয়া সম্পাদন করে। প্রভেদ এই যে, যাহা কিছু বাহ্য জগতের অবস্থাধীন, তাহা সর্ব্বদা রূপান্তরিত হইতেছে, এবং কোন এক সময়ে—শত, সহস্র, লক্ষ, কোটী, লক্ষ কোটী, কোটী কোটী বৎসরে হউক—বর্ত্তমান অবস্থার সুদূর চিহ্নমাত্রও ধারণ করিবে না; কিন্তু আত্মা ভাবে পুষ্ট হইবে, অথচ ভিন্ন রূপে পরিণত হইবে না, সুতরাং ইন্দ্রিয়াদি গোচর সংসারিক অবস্থার অতীত বস্তু। চারিহাজার বৎসরের বৃদ্ধ তরুবর কালে ভূতলশায়ী হইয়া আপন তনু প্রকৃতির সর্ব্বভুক বিশ্লেষণ শক্তির হস্তে সমর্পণ করিবে; পিরামিড চিরকাল থাকিবে না, ভূষণ্ডি হিমালয় এক দিন ধূলিসাৎ হইবে, ঐ কোমল কিরণ সুধাকর পূর্ব্বে জীব জন্তুর আবাসভূমি ছিল, এখন প্রাণীশূন্য মরুময় জড়পিণ্ডমাত্র, ক্রমে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর, এই প্রাণপ্রিয় পৃথিবী, যাহাকে বিশাল বিশ্বের সার বলিয়া আমাদের আপাততঃ ভ্রম জন্মে, ইহাও ধীরে ধীরে সহযোগী চন্দ্রের পথে চলিতেছে, সম্পূর্ণ জীর্ণ হইয়া করে ভুশ্ করিয়া বায়ুতে মিশাইয়া যাইবে; সূর্য্যদেব জ্যোতিহীন হইয়া আকাশ পটে আর বিরাজ করিবেন না, কিম্বা আপন তেজে আপনি ভস্ম হইয়া বিলুপ্ত হইবেন, সঙ্গে সঙ্গে তদগত প্রাণ গ্রহগণ লীলা সম্বরণ করিবে, এমন দিন আসিবে, *—জড় জগতের ক্ষুদ্র মহৎ প্রত্যেকে নূতন সৃষ্টির জন্য যথাসময়ে নিজ স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য। কিন্তু আমি আমার এই বিশ্বগ্রাসী আত্মা—অনন্তকালস্থায়ী। যাহা সাদি, তাহা সান্ত, যাহা অনাদি তাহা অনন্ত, বিশ্বের এই অখণ্ডনীয় নিয়ম। আত্মার আরম্ভ নাই, সুতরাং শেষও নাই। যাঁহারা আত্মাকে সৃষ্ট বস্তু বলিয়া উহা হইতে অনাদ্যনন্তের ছাপ মুছিয়া ফেলিতে চান, তাঁহারা উহাকে অমর বলেন কি প্রকারে, বুঝি না। জীবাত্মার জন্মমৃত্যুবিরহিত ঐশী ভাব অস্বীকার করিলে উহার বিশেষ মর্য্যাদাহানি করা হয়। অনাদিকাল হইতে ঈশ্বরে আমি অবস্থিতি করিয়া আসিতেছি, বর্ত্তমানেও তাঁহাতেই, এবং অনন্ত

* এই বিপুল সংখ্যা আপাততঃ শুনিতে আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে, কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে সহজে বুঝা যায়, ইহা অপেক্ষাও অধিক সম্ভব:— যদি এক জন সুশিক্ষিত ব্যক্তি ৫০ বৎসর বয়সের পর—৪০ হইতে ৬০ বৎসরের মধ্যে বহুভাব গ্রহণ-ক্ষমতা বিকাশ পায়—শেষ ৩০।৪০।৫০।৬০ বৎসর ক্রমাগত রেল জাহাজ ব্যোমযানাদিতে ভ্রমন করেন, তাঁহার চিত্তে ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী ছাপ পড়িবার কথা। তর্কের খাতিরে (Hypothetically) বলা হইল, জানিতে হইবে।

* অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন সুবিখ্যাত পণ্ডিত মহাত্মা লাগ্রাঞ্জ (Lagrange) বহুবিধ যুক্তি তর্ক দ্বারা প্রমাণ করিতে যত্ন পাইয়াছেন যে, এই গ্রহ জগৎ (Planetary System) বর্ত্তমান ব্যবস্থায় চির কাল থাকিবে। কিন্তু তাঁহার প্রতি সমুচিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা পুরঃসর এ কথাও মানিতে হইবে যে, যে মূর্ত্তি পূর্ব্বে ছিল না, নূতন হইয়াছে, তাহা অনন্তকাল এক ভাবে তিষ্টিতে পারে না। সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল উপাদানে গঠিত জড়জগৎ আংশিক ও সমষ্টিভাবে সমান পরিবর্ত্তনশীল। খুব সম্ভব, এই স্থানে অসংখ্য বার সৃষ্টি স্থিতি লয় হইয়া গিয়াছে, ভবিষ্যতে অসংখ্য বার হইবে। বর্ত্তমান ব্যবস্থা (System) তাহার একবার কার।

ভবিষ্যতে অজর অমর ভাবে সেই মহাশক্তির ক্রোড়ে বিরাজ করিব।

তবে মৃত্যু কি? পার্থিব জন্ম ও মৃত্যু একই জিনিস—অবস্থান্তর হইবার দ্বার মাত্র, উভয়ের ভিতর দিয়া নূতনভাবে প্রস্তুত হই। অধিকাংশ এই মহাপ্রশ্নের দিকে আদরেই খেয়াল করেন না, এই আড়াই দিনের খেলায় তাঁহারা এমনই মত্ত, ভবের সদাভাঙ্গা হাটের ব্যবসায় বাণিজ্য এতই নিবিষ্টচিত্ত যে, ওরূপ তুচ্ছকথা তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে না, ক্ষণজীবী (Ephemera) কীটানুর মত প্রহরখানেকের নৃত্য কীর্ত্তন তাঁহাদের নিকট সব (All-in-all), যাঁহাদের অপেক্ষাকৃত অবকাশ আছে, তাঁহারা মৃত্যুদ্বারা সংসারের নানাবিধ জ্বালা যন্ত্রণার হাত এড়াইবেন বলিয়া এক প্রকার বিষণ্ণ হর্ষের সহিত উহার দিকে তাকান; আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা বলেন "One world at a time is an excellent rule to go by." সুতরাং মৃত্যু আমাদিগকে কোথায় কি ভাবে লইয়া যাইবে, ভাবিয়া অনর্থক মাথা ঘামাইবার দরকার দেখি না, যাহা কর্ত্তব্য বোধ কর, করিয়া চলিয়া যাও ও সব ঢেঁকির কচ্ কচি বৃথা; এতদ্ভিন্ন একদল "পণ্ডিত মূর্খ" আছেন, যাঁহারা চিরকাল বিজ্ঞানের সেবা করিয়া শেষ স্থির করিয়াছেন;—জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য প্রভৃতি অসীম বল শক্তি সকল মরণশীল, অথচ জড়জগতের অণু ও শক্তিসমূহের বিনাশ নাই। এই মহাপুরুষেরা মদগর্ব্বের বশবর্ত্তী হইয়া বিশ্বের স্রষ্টা পাতা পবিত্রাতা ভগবানের অধীনতা স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করিয়া তাঁহার জাজ্বল্যমান বিরাট অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করিতে সাহসী হন। ইহাদের গুণে ঘাট নাই, ইহারা সংসারে বিশেষ ক্ষতি করেন, ইহাদের চাকচিক্যশালী হুজুগে পড়িয়া অনেক গরিব, অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত, অনলে পতঙ্গের ন্যায় মারা যায়।

মৃত্যুর অপরপারের অবস্থার ভাব এখান হইতে পাওয়া অসম্ভব। এই যুক্তির উপর দাঁড়াইয়া অনেকে পরলোক বিশ্বাস করিতে চান না। তাঁহারা খেয়াল করেন না যে, মৃত্যুর অন্তরালের ব্যাপার সমূহ সম্বন্ধে জ্ঞান আমাদের পক্ষে অহিতকর জানিয়া বিধাতা আমাদিগ হইতে উহা বর্ত্তমানের জন্য প্রচ্ছন্ন রাখিয়া বিশেষ কৃপা প্রকাশ করিয়াছেন। কবি সদি (Southey) বলেন, উহা অনাবশ্যকীয় জানিয়া পিতা আমাদিগকে ওবিষয়ে জানিতে দেন নাই,—

"Our Father hath not made that
mystery known,
Needless the knowledge, therefore
not revealed."

যে যাহাই বলুক, আত্মার বিনাশ সম্বন্ধে কোন কথাই আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় না, ভাসিয়া চলিয়া যায়। ইহাই জীবাত্মার অমরত্বের লক্ষণ। চক্ষে দেখার মত প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবিষয়ে অসম্ভব, আমরা তদুপযুক্ত নই, এসংসারে আমাদের ক্ষমতা অতি সংকীর্ণ। কুকের (Captain Cook) অষ্ট্রেলিয়া আবিষ্কারের পূর্ব্বে বড় বড় জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরও কাঙ্গারু (Kangaroo) ও অরিন্থরিঙ্কস (Orinthorhynchus) সম্বন্ধীয় ভাবের ইঙ্গিতমাত্র হৃদয়ে উদয় হয় নাই; তাহা হইতে পারে না। যখন এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর বিষয়ে এরূপ, পরলোক জ্ঞান সম্বন্ধে কতদূর অনুপযুক্ত আমাদের ধারণাশক্তি হওয়া উচিত, সহজেই বুঝা যায়।

আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যুক্তি তর্ক নাই। আত্মার নিজের কথায় বিশ্বাস করিয়া এবং পূর্ব্বগত মহাজনদিগের ইঙ্গিতে আমরা যাহা কিছু বল পাই। সুতরাং উপসংহারে এই মাত্র বলিতে পারি যে, কেটোর (ক) মত দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া, হাওয়াডের (খ) ন্যায় বিনীতভাবে প্রফুল্লচিত্তে অপেক্ষা করত, সংসারের প্রধান লোকচরিত শিক্ষক মহাকবি সেক্ষপীরের (গ) বর্ণনার মত যাহাতে মরিতে পারা যায়, তাহাই আমাদের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য। মৃত্যুঞ্জয় এবিষয়ে আমাদিগকে বল প্রদান করুন।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন

ঢাকার পুরাতন কাহিনী।

(প্রথম প্রস্তাব)

ঢাকা পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যে সর্ব্ব প্রকারে প্রধান নগরী। ঢাকা নগরী এত প্রাচীন যে, ইহার সহিত তুলনা করিলে, কলিকাতাকে নিতান্ত আধুনিক নগরী বলিয়া প্রতীতি জন্মে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতে সমতট দক্ষিণ ও পূর্ব্ব বঙ্গের রাজধানী ছিল। সুপ্রসিদ্ধ চীনদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিয়াংসাঙ্ স্বকীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে

(ক) "It must be so Plato, thou reason'st well!
Else whence this pleasing hope, this fond desire,
This longing after immortality?
Or whence this secret dread & inward horror,
Of falling into nought? Why shrinks the soul
Back on herself, and startles at destruction?
'Tis the divinity that stirs within us;
'Tis heaven itself that points out an hereafter,
And intimates eternity to man.

* * * *

If there's a power above us
(And that there is, all nature cries aloud
Thro' all her works) he must delight in virtue,
And that which he delights in must be happy.

* * * *

The soul secur'd in her existence, smiles
At the drawn dagger, and defies its point.
The stars shall fade away, the sun himself
Grow dim with age, and nature sink in years
But thou shalt flourish in immortal youth,
Unhurt amidst the war of elements
The wrecks of matter, and the crush of worlds."

Cato:

(খ) "Death has no terrors for me; it is an event I always look with cheerfulness, if not with pleasure: and be assured, the subject is more grateful to me than any other. Suffer no pomp to be used at my funeral, no monument to mark the spot where I am laid; but put me quietly in the earth, place a sundial over my grave, and let me be forgotten."

John Howard

(গ) "Nothing in his life
Became him like the leaving it, he died
As one who has been studied in his death,
To throw away the dearest things he owed,
As 'twere a careless trifle.

Shakespeare

সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, সমতট, ও তাম্রলিপ্তকে সবিশেষ সমৃদ্ধিশালী বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালার শেষ হিন্দুরাজবংশ রামপাল নগরে বহুকাল রাজত্ব করেন। রামপালের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশের স্বাধীনতা ও ভাগ্যলক্ষ্মী অন্তর্হিত হয়। কেহ কেহ বিশিষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, এই রামপাল সুপ্রাচীন সমতটেরই নামান্তর মাত্র। রামপালের ভগ্নাবশেষ ঢাকার দক্ষিণ ভাগে বর্ত্তমান মুন্সীগঞ্জ উপবিভাগের সন্নিকটে অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া, সেন রাজগণের অতীত গৌরব-মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। সমগ্র বঙ্গের শেষ হিন্দু রাজা দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেন, মুসলমান সেনাপতি মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজী কর্ত্তৃক তদানীন্তন নবপ্রতিষ্ঠিত রাজধানী নবদ্বীপ অধিকারের পর, তথা হইতে সপরিবারে পলায়ন করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্গত প্রাচীন পৈতৃক রাজধানী এই রামপালে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি মৃত্যু পর্য্যন্ত নিরাপদে ও স্বাধীনভাবে রামপালে কি সোনারগাঁয় রাজধানী স্থাপন করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিতে থাকেন। তাঁহার বংশধরেরা প্রায় শতবর্ষ পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু রাজগণের শাসন প্রভাব অব্যাহত রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মুসলমানগণের দুর্দ্ধর্ষ পরাক্রমে নবদ্বীপ পতনের বহু কাল পরে পূর্ব্ববঙ্গ অধিকৃত হয়। পূর্ব্ববঙ্গ বিজয়ের পর হইতেই বাঙ্গালার স্বাধীনতার চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়, বাঙ্গালীর দাসত্ব ও জাতীয় অধোগতি সম্পূর্ণরূপে আরম্ভ হয়। এই পূর্ব্ববঙ্গ হইতেই মুসলমানদিগের রাজত্ব সময়ে সমস্ত দেশের 'বাঙ্গলা' ও 'বঙ্গ' নাম প্রচারিত হয়।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, বিচক্ষণ পুরাতত্ত্ববিৎ ও ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণের দীর্ঘকালব্যাপী আয়াসসাধ্য গভীর গবেষণায়ও সেই প্রাচীন হিন্দু সময়ের বঙ্গ দেশের ধারাবাহিক বিবরণ বিশেষ কিছু আবিষ্কৃত হয় নাই। যাহাও এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাও অবিসংবাদিত রূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই। সেই প্রাচীন সময়ের ইতিহাস সম্বন্ধে নানা বিষয়ে ইতিহাসবিৎ পণ্ডিতবর্গের মতভেদ সংশয়জালে জড়িত হইয়া রহিয়াছে। অদ্য পর্য্যন্তও সেই সকল বিষয়ের যথোচিত সন্তোষকর মীমাংসা হয় নাই।

খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাঙ্গলায় হিন্দু রাজত্ব বিলুপ্ত হয় এবং মুসলমানদিগের প্রভুতা বাঙ্গালার সর্ব্বত্র সংস্থাপিত হয়। সাময়িক ইতিহাস রচনা বিষয়ে মুসলমানেরা হিন্দু অপেক্ষা সবিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ইতিহাস রচনা বিষয়ে জগতের যে কোন সভ্যজাতির সহিত মুসলমান জাতির তুলনা হইতে পারে। তুলনায় কোন ইউরোপীয় জাতি অপেক্ষা তাঁহারা নিকৃষ্টতর বলিয়া বিবেচিত হইবে না। এই সময় হইতে ভারতবর্ষের মুসলমানাধিকৃত অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বঙ্গদেশেরও ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিত হইতে থাকে।

রামপালের অধঃপতনের পর হইতে সোনারগাঁর উন্নতি আরম্ভ হয়, এবং মুসলমানদিগের প্রণীত ইতিহাসে সোনারগাঁর নাম উল্লিখিত হইতে থাকে। জিয়াউদ্দিন বরনী সর্ব্ব প্রথম সোনারগাঁর উল্লেখ করেন। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগেও সোনারগাঁয় হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর আরম্ভেই

সোনারগাঁয় মুসলমান শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইতে থাকে এবং সোনারগাঁ পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী বলিয়া পরিচিত হয়। এই সময়ে সোনারগাঁর উন্নতির একশেষ হয়। সোনারগাঁর বাণিজ্যদ্রব্য দূরবর্ত্তী দেশে প্রেরিত ও আদৃত হইতে থাকে। সোনারগাঁর অতি সূক্ষ্ম ও শুভ্র মছলিন বস্ত্র সভ্য জগতের বিস্ময়ের পরাকাষ্ঠা উৎপাদন করিয়া, সোনারগাঁকে তদানীন্তন সভ্য জগতে সুপরিচিত করে। মছলিন বস্ত্রের জন্মস্থান সোনারগাঁ, ঢাকা নগরীকে উহার প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা দিয়া ঢাকার ভাবী প্রসিদ্ধি ও প্রাধান্যের সূত্রপাত করে। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত সোনারগাঁয়ে ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত হইত। সোনারগাঁর উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও চাউল ভারতবর্ষের নানা স্থানের ন্যায় সিংহল, পেগু, জাবা, মলক্কস, সুমাত্রা প্রভৃতি অনেকানেক দূরবর্ত্তী স্থানে প্রেরিত হইত। বিদেশীয় পর্য্যটকগণ সুদূর আরব ও ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া, বহু ক্লেশ ও আয়াস সহ্য করিতে হইলেও সোনারগাঁর শোভাসমৃদ্ধি স্বচক্ষে দর্শন করা অতি আবশ্যক মনে করিতেন। সোনারগাঁর ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রশংসাগীতি গান করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে সমগ্র বঙ্গদেশ সোনারগাঁর আধিপত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। বাঙ্গলা সোনারগাঁর পদ অনুসরণ করিয়া দিল্লীশ্বরের অধীনতা-পাশ ছিন্ন ভিন্ন করণান্তর আপনাকে স্বাধীন বলিয়া সর্ব্বত্র ঘোষণা করে, এবং দুই শত বৎসর পর্য্যন্ত অব্যাহতভাবে বহু আয়াসলব্ধ স্বাধীনতা রক্ষা করে। সোনারগাঁর পূর্ব্ব গৌরব ও সমৃদ্ধি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে তাহার নাম ও স্মৃতিমাত্র অবশিষ্ট আছে।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর আরম্ভ হইতে ঢাকার নাম ইতিহাসে উল্লিখিত হইতে থাকে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে তথায় সম্রাটের সেনাসন্নিবেশ সংস্থাপিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে ঢাকায় বাঙ্গলার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময় হইতে শত বর্ষ পর্য্যন্ত ঢাকার গৌরব ও প্রাধান্য অক্ষুণ্ণভাবে বিদ্যমান থাকে। এই সময়ে ঢাকার ভূয়সী উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হয়। ঢাকার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সোনারগাঁর সৌভাগ্য বিলুপ্ত হইতে থাকে। রাজধানী স্থাপনের পর হইতে ঢাকার রাজপ্রাসাদ হইতে সমগ্র বঙ্গদেশ শাসিত হইত, ঢাকার রাজকোষে বাঙ্গালার রাজস্ব সংগৃহীত হইত, ঢাকার সুদৃঢ় সেনানিবাস হইতে মোগলসেনাগণ বহির্গত হইয়া আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের বিদ্রোহ দমন করিত এবং চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্বাধীন রাজন্যবর্গকে পদানত করিয়া দিল্লীশ্বরের শাসনপ্রভাব বিস্তার করিত। দিল্লির সম্রাটের বংশধর ঢাকার রাজপুরুষগণ বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যায় আপনাদের শাসনক্ষমতার পরিচয় দিয়া, কোন কোন সময়ে সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যের আধিপত্য পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছেন। দিল্লীর প্রধান প্রধান সম্ভ্রান্ত ওমরাহগণ ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের শাসনকার্য্যে স্ব স্ব কৃতিত্ব ও নিপুণতার পরিচয় দিয়া, ঢাকার শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত হইতে পারিলে আপনাদিগকে যথেষ্টরূপে পুরস্কৃত মনে করিয়া কৃতার্থ হইতেন। দিল্লীশ্বরের প্রিয়তম পুত্র ও পৌত্রগণ ঢাকার শাসনকার্য্য প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ-শতাব্দীর প্রারম্ভে ঢাকা হইতে মুরসিদাবাদে রাজ-

লার রাজধানী নীত হওয়ার পর হইতেই ঢাকার সৌভাগ্য-লক্ষ্মী অন্তর্হিত হয়, ঢাকার অতীত গৌরব বিনষ্ট হয়। এই সময় হইতে ঢাকা বঙ্গদেশের একতম প্রধান নগরী বলিয়া পরিগণিত হইতে থাকে। বর্ত্তমান ঊনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভেই ঢাকার নির্ম্মিত সাধারণ বাণিজ্যদ্রব্যের বিদেশে রপ্তানির পরিমাণ ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইতে থাকে। এই সময় হইতেই ঢাকার বর্ত্তমান বাণিজ্যবিষয়ক অবনতি আরম্ভ হয়।

ঢাকার এই সকল বিবরণ সংগৃহীত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিতে চেষ্টা করিব। ঢাকার বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে, আবশ্যকীয় বোধ হইলে, পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য জিলার বিবরণও অতি সংক্ষিপ্তভাবে প্রদত্ত হইবে। ঢাকার প্রাচীন ইতিহাস বাঙ্গলার ইতিহাসের সহিত কতদূর ঘনিষ্ট ভাবে সংসৃষ্ট, যথাসাধ্য তাহা বিবৃত করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বাঙ্গলার ইতিহাসের ভাবী লেখক এই অজ্ঞাত কল্প অংশের সংগ্রহ দ্বারা যদি বা কিছু সহায়তা লাভ করিতে পারেন, ইহা ভাবিয়া যথাসাধ্য চেষ্টায় যাহা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাই পাঠকবর্গের নিকটে উপস্থিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ-লেখকের পদে পদে ত্রুটি ও ভ্রম প্রমাদ ঘটিবার সম্ভাবনা। প্রবন্ধের অসম্পূর্ণতা ও ভ্রমপ্রমাদ পাঠকবর্গ যেন দয়া করিয়া মার্জ্জনা করেন এবং লেখককে তাহার ত্রুটি দেখাইয়া দেন—প্রবন্ধ-লেখকের এই বিনীত অনুরোধ।

—o—
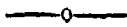
(উপক্রমণিকা।)

অতি প্রাচীনকাল হইতে সংস্কৃত সাহিত্যে 'বঙ্গ' রাজ্যের নাম উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। পুরাণাদি প্রাচীন গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, চন্দ্রবংশীয় বলিরাজের অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামে পাঁচ জন পুত্র বর্ত্তমান ছিল। তাঁহারা পৈতৃক রাজ্য বিভাগ পূর্ব্বক স্ব স্ব নামে যে পাঁচটি বিভিন্ন রাজ্য সংস্থাপিত করেন, 'বঙ্গ' তাহাদের অন্যতম। এই পঞ্চ রাজ্যের কিয়দংশ লইয়া বর্ত্তমান বাঙ্গলা ও বিহার এবং উড়িষ্যা প্রদেশ সংগঠিত হইয়াছে।

অঙ্গরাজ লোমপাদ অযোধ্যাপতি মহারাজ দশরথের পরম বন্ধু ছিলেন বলিয়া রামায়ণে বর্ণিত আছে। মহাভারতেও অঙ্গ ও বঙ্গ রাজ্যের উল্লেখ দেখা যায়। কীকট, অঙ্গ, বঙ্গ, পৌণ্ড্র, তাম্রলিপ্ত ও কৌশিকী-কচ্ছের অধিপতিগণ মহাপরাক্রান্ত বিজয়ী পাণ্ডবদিগের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। অঙ্গপতি ভগদত্ত কুরুক্ষেত্রের সেই অতি ভীষণ সমরে কুরুরাজ দুর্য্যোধনের পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া পাণ্ডবদিগের হস্তে নিহত হন। মহাবীর সাত্যকি বঙ্গাধিপতিকে এবং সহদেব পৌণ্ড্ররাজকে পরাজিত ও নিহত করেন। পুরাণাদি গ্রন্থে ঐতিহাসিক সত্য কি পরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় রূপে বলা যায় না। কবি-কল্পনা-প্রসূত মনোহর উপাখ্যানই পুরাণ ও মহাভারতাদি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহাতে ঐতিহাসিক সত্য অণুমাত্রও নাই—ইহা মনে করিয়া পুরাণাদি গ্রন্থ দূরে নিক্ষেপ করিতে আমাদের প্রবৃত্তি জন্মে না।

খ্রীষ্টীয় অব্দ সংস্থাপনের চতুর্থ ও তৃতীয় শতাব্দী পূর্ব্বে প্রবল পরাক্রান্ত মৌর্য্য ও অন্ধ্রবংশীয় নরপতিগণ যখন মগধে অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন, যখন গুজরাট হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে তাঁহাদের অবিসংবাদিত অধিকার বিস্তৃত হয়, যখন তাঁহাদের বিজয় বৈজয়ন্তীর সমীপে দূরবর্ত্তী সমস্ত দেশ মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইয়াছিল—সেই সময়ে বঙ্গদেশ তাঁহাদের পদানত হয় নাই, ইহা কোনও ক্রমে বিশ্বাস করা যায় না। মগধের সংলগ্ন বঙ্গদেশে তাঁহাদের আধিপত্য সংস্থাপিত হওয়াই অধিকতর সম্ভব বলিয়া মনে হয়।

মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের সেই তুমুল সংগ্রাম হইতে অদ্বিতীয় ধর্ম্মবীর বুদ্ধদেবের সময় পর্য্যন্ত (সহদেব হইতে অজাতশত্রু পর্য্যন্ত) সর্ব্বশুদ্ধ ৩৫ জন রাজা মগধে রাজত্ব করেন বলিয়া কোন কোন ইতিহাসবিৎ পণ্ডিত নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মাননীয় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর ত্রয়োদশ কি দ্বাদশ শতাব্দী পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল *। পালিভাষায় লিখিত সিংহল দ্বীপের মহাবংশাদি বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থের নির্দ্দেশ অনুসারে খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর পূর্ব্বতন ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে (৫৪৩ খ্রীঃপূঃ) বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ প্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু জেনারেল কানিংহাম ও অধ্যাপক মেক্সমুলার প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গের মতে খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর পূর্ব্বতন ৪৭৭ কি ৪৭৮ অব্দে এই

বৈদিক সময়ে আর্য্যগণ মধ্য আসিয়া হইতে পঞ্জাবে উপনিবিষ্ট হন। সিন্ধু ও তাহার পঞ্চ প্রসিদ্ধ শাখার তীরে একত্র সম্মিলিতভাবে বসতি স্থাপন করিয়া তাঁহারা প্রকৃতিদেবীর ভীমকান্ত মূর্ত্তির উপাসনায় নিযুক্ত হন। প্রকৃতিদেবীর বিভিন্ন শক্তি সম্বন্ধীয় ঋগ্বেদীয় মন্ত্র ও স্তোত্রমালা এই সময়ে রচিত হয়। এই সময়ে জাতিভেদ, দেবমূর্ত্তি ও দেবমন্দিরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত কল্পিত হয় নাই। এই সময়ে গঙ্গা যমুনার বিশেষ উল্লেখ দেখা যায় না।

মহাভারতীয় (Epic) সময়ে আর্য্যগণ পঞ্জাব হইতে দলে দলে বহির্গত হইয়া ত্রিহুত পর্য্যন্ত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে যে সকল পরাক্রান্ত রাজ্য স্থাপনপূর্ব্বক বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হন, পরবর্ত্তীকালে রচিত মহাভারত ও রামায়ণে তাহার সবিশেষ উল্লেখ আছে। দিল্লীর চতুর্দ্দিকে কুরুগণ, কনোজে পঞ্চালগণ, অযোধ্যা প্রভৃতি যমুনা ও গণ্ডকীনদীর মধ্যবর্ত্তী বিস্তীর্ণ ভূভাগে কোশলগণ, গণ্ডকীর পূর্ব্বভাগে ত্রিহুতে বিদেহগণ, এবং বারানসীর চতুর্দ্দিকে কাশীবংশীয়গণ—তন্মধ্যে সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। খ্রীঃ পূঃ ১৪০০-১২০০ বর্ষে কুরু ও পঞ্চালগণ, এবং ১২০০-

* বিগত বর্ষে রমেশ বাবু 'ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস' নামে যে উৎকৃষ্ট পুস্তকের প্রথম ভাগ ইংরেজীতে লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি হিন্দু সময়ের প্রাচীন ইতিহাসকে নিম্নলিখিত পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। (১) বৈদিক সময় (খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর পূর্ব্বতন ২০০০-১৪০০ বৎসর), (২) মহাভারতীয় সময় (খ্রীঃ পূঃ ১৪০০-১০০০ বৎসর), (৩) দার্শনিক সময় (খ্রীঃ পূঃ ১০০০-২৪২ বৎসর), (৪) বৌদ্ধ সময় (খ্রীঃ পূঃ ২৪২—খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর ৫০০ বৎসর), এবং (৫) পৌরাণিক সময় (খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর ৫০০-১১৯৪ খ্রীঃ)।

ঘটনা সংঘটিত হয়। এই সময় হইতেই ভারতবর্ষের ইতিহাসে যুগান্তর উপস্থিত

১০০০ খ্রীঃ পূঃ বর্ষে কোশল ও বিদেহগণ উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করে। এই সময়ে বেদ চারিভাগে সংগৃহীত ও বিভক্ত হয়। ঋগ্বেদীয় সরল মন্ত্রের অর্থ ও ভাব বিকৃত ও রূপান্তরিত হয়। যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডের বহুল প্রচার হইতে অসার ও নির্জীব ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক গ্রন্থ রচিত হয়। আর্য্যগণ জ্ঞান, সভ্যতা ও বিদ্যাবত্তায় পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক উন্নত হয়,—কিন্তু তাহাদের শৌর্য্য, বীর্য্য, ঔদার্য্য, মহত্ব ও পুরুষত্ব বিষয়ে যথেষ্ট অবনতি হয়। জনসাধারণের (বৈশ্যদিগের) দুর্ব্বলতা ও নির্জীবতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাতিভেদের প্রভাব বর্দ্ধিত হয়, এবং বৈশ্যসমাজ হইতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়া স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হয়। অর্থহীন ও অসার যাগযজ্ঞাদির বাহুল্যে বিরক্ত হইয়া বিদেহরাজ ক্ষত্রিয়শিরোমণি জনক প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর পূর্ব্বতন একাদশ শতাব্দীতে জনকের জ্ঞানালোচনা ও সত্যানুসন্ধানের ফল স্বরূপ উপনিষদ্ সমূহ রচিত হইতে আরম্ভ হইয়া ভারতবর্ষে নব যুগের অবতারণা করে। এই উপনিষদ্ হইতেই ভবিষ্যতের যাবতীয় ধর্ম্ম ও দার্শনিক মত কালক্রমে উৎপন্ন হয়। কুরুপঞ্চালের ভীষণ যুদ্ধ এই সময়ে (খ্রীঃ পূঃ ত্রয়োদশ কি দ্বাদশ শতাব্দীতে) সংঘটিত হয়। কিংবদন্তী ও মহাভারত হইতে জানা যায়, বেদের বিভাগকর্ত্তা ব্যাসদেব এই সময়ে বর্ত্তমান থাকিয়া মহাভারত রচনা করেন। তৃতীয় ও চতুর্থযুগে ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া রামায়ণ ও

হয়। এই ঘটনা হইতেই ভারতীয় ইতিহাসের সময় গণনা আরম্ভ হয়। বুদ্ধদেবের

মহাভারত উভয়ই পৌরাণিক যুগে বর্ত্তমান আকার ধারণ করে।

দার্শনিক যুগে আর্য্যগণ অনুগঙ্গ প্রদেশ হইতে বহির্গত হইয়া ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষ আক্রমণ ও অধিকার করেন। সুবিজ্ঞ উইলসন সাহেবের মতেও এই সময়ের আরম্ভেই আর্য্যাবর্ত্তবাসী আর্য্যগণের অধিকার, ধর্ম্ম ও সভ্যতা দক্ষিণাপথ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই সময়ে বঙ্গদেশে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু সভ্যতা প্রবিষ্ট হয়। কি রাজ্যবিস্তৃতি, কি সাহিত্যবিষয়ক উন্নতি, সকল সম্পর্কেই এই যুগে হিন্দুগণ সবিশেষ উৎকর্ষতা লাভ করেন। এই সময়ের শেষ ভাগে মহারাজা চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁহার পৌত্র অশোক কর্ত্তৃক মৌর্য্যবংশীয় নৃপতিগণের প্রাধান্য ও আধিপত্য সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিপূর্ব্বে ভারতীয় কোন রাজ্যই মগধের ন্যায় প্রতাপ ও সমৃদ্ধি প্রদর্শনে সমর্থ হয় নাই। উত্তর ভারতে যখন মৌর্য্যবংশের অপ্রতিহত প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সময়ে দক্ষিণাপথে অন্ধ্রবংশীয় রাজগণ অতি পরাক্রান্ত রাজ্য সংস্থাপিত করেন। এই অন্ধ্রগণ কর্ত্তৃকই প্রাচীন চের, চোল (কাঞ্চী) ও পাণ্ড্যরাজ্য খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীরও পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্ধ্ররাজগণের আশ্রয়ে হিন্দু ধর্ম্ম, জ্ঞান ও সভ্যতা দক্ষিণাপথে প্রসৃত হইয়া সবিশেষ উন্নতি লাভ করে। অন্ধ্ররাজগণ হইতেই প্রাচীন সৌরাষ্ট্রে (গুজরাট ও মহারাষ্ট্র দেশে) সভ্যতালোক প্রবিষ্ট হয়। এই সময়ে সিংহল দ্বীপ আবিষ্কৃত হয়। মহারাজ অশোক তাঁহার প্রিয়তম পুত্রকে বৌদ্ধধর্ম্ম

নির্ব্বাণ প্রাপ্তির পরবর্ত্তী শত বৎসরের মধ্যে (৪৭৭-৩৭৭ খ্রীঃ পূঃ) বৌদ্ধগণের মধ্যে তাঁহার

প্রচারার্থ সিংহলে প্রেরণ করেন। বৌদ্ধ পরিব্রাজকগণ অশোকের পূর্ব্বেই উড়িষ্যায় আগত ও উপনিবিষ্ট হইয়া বিচিত্র শিল্প নৈপুণ্যের সহিত বিবিধ পর্ব্বতগহ্বর নির্ম্মাণ ও খোদিত করিতে আরম্ভ করে।

এই যুগের সজীবতা ও কার্য্যকুশলতা রাজ্যবিস্তারে কেবল পর্য্যবসিত না হইয়া জাতীয় সংস্কৃত সাহিত্যেও প্রকাশিত হয়। সুবিস্তীর্ণ ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের উপদেশ ও ক্রিয়াকলাপ অতি সংক্ষিপ্তভাবে সূত্রগ্রন্থে নিবদ্ধ হয়। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সর্ব্বত্র অসংখ্য বেদবিৎ সূত্রকারগণ প্রাদুর্ভূত হইয়া শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দঃ, জ্যামিতি, অভিধান ও ধর্ম্মসূত্রাদি প্রণয়ন করিতে থাকেন। যাস্কের নিরুক্ত, পাণিনির ব্যাকরণ, গৌতম ও বৌধায়ন এবং আপস্তম্বের ধর্ম্মসূত্র, এবং জ্যামিতিবিষয়ক শুল্বসূত্র এই সময়ে (বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে) বিরচিত হয়। খ্রীঃ পূঃ অষ্টম কি সপ্তম শতাব্দীতে মহর্ষি কপিল প্রাদুর্ভূত হইয়া সাংখ্যসূত্রে অলৌকিক জ্ঞান ও প্রতিভার পরিচয় দেন। এই সাংখ্যদর্শন ভারতবর্ষের সাহিত্য ও ইতিহাসে সমধিক আধিপত্য প্রকটিত করিয়া স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। কপিলের সাংখ্যসূত্রের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দার্শনিক সূত্র সকলও রচিত হইতে আরম্ভ হইয়া, উপনিষদের জ্ঞানালোচনার প্রভাব ও মাহাত্ম্য প্রকাশ করে। খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে বুদ্ধদেব প্রাদুর্ভূত হইয়া কপিলের নীরস জ্ঞানালোচনায় বিশ্বজনীন প্রেমের অমৃতময় রস সঞ্চারিত করেন। বুদ্ধদেবের প্রেম, মৈত্রী ও সাম্যবাদ ধীরে ধীরে দুর্ব্বল

ধর্ম্মমত সম্বন্ধে বিষম বিরোধ উপস্থিত হয়। সেই বিরোধের যথোচিত মীমাংসা করিয়া

ও দরিদ্র এবং উৎপীড়িত সমাজে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার সাম্যবাদ জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া নির্জ্জীব ও প্রপীড়িত সমাজে ক্রমে ক্রমে সজীবতা বিধান করিতে লাগিল। অবশেষে মহারাজা অশোকের সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতের জাতীয় প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়া প্রায় সমগ্র আসিয়া খণ্ডের একমাত্র ধর্ম্ম হইয়া উঠিল।

বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্রভাবে হিন্দুধর্ম্মের মহাত্মা বিলুপ্ত প্রায় হয়। মহারাজা অশোকের সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতির পরাকাষ্ঠা সাধিত হয়। সুসভ্য গ্রীক এবং অসভ্য তুরেনিয়ান, কাম্বোজিয়া, শক, হুন প্রভৃতি জাতির আক্রমণে ভারতবর্ষ পুনঃ পুনঃ ব্যতিব্যস্ত হয়। বিদেশীয় আক্রমণকারীগণ বাহুবলে ভারতবর্ষে প্রবিষ্ট ও উপবিষ্ট হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক ভারতের অধিবাসী বলিয়া পরিগণিত হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতনে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে হিন্দুধর্ম্ম প্রবল হয়।

পৌরাণিক যুগে হিন্দুজ্ঞান, ধর্ম্ম ও প্রতিভা, নির্জ্জীব ও বিকৃত বৌদ্ধধর্ম্মকে ভারতবর্ষ হইতে দূরীভূত করিয়া পুনরায় প্রবল হইয়া উঠে। হিন্দুধর্ম্ম নবীন বেশে ও নূতন উৎসাহে অভ্যুদিত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে পরাজিত করে। উজ্জয়িনী হইতে এই নবযুগ আবির্ভূত হইয়া ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হয়। বৌদ্ধ বিহার মন্দিরাদির পরিবর্ত্তে নূতন প্রণালীতে ভারতের সর্ব্বত্র হিন্দু দেবমন্দিরাদি নির্ম্মিত হইতে থাকে। পৌরাণিক অসংখ্য দেবদেবীগণ স্বল্পসংখ্যক বৈদিক

বুদ্ধদেবের মত অবিসংবাদিতরূপে ধর্ম্মগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিবার জন্য বিভিন্নপক্ষীয় প্রধান প্রধান বৌদ্ধগণ ক্রমান্বয়ে দুইটী সভাতে সমবেত হন। কিন্তু তাহাতেও ধর্ম্মবিরোধের উপশম না হওয়াতে, খ্রীঃ পূঃ ২৪২ অব্দে

দেবতাদিগের স্থান অধিকার করিয়া, সম্পূর্ণ অভিনব আকারে হিন্দুধর্ম্মকে জনসমাজে প্রবর্ত্তিত করে। বেদের শ্রেষ্ঠত্ব বিলুপ্ত হইয়া পুরাণের উৎকর্ষ হিন্দুসমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। মানবধর্ম্মশাস্ত্র এই যুগের চিন্তা-প্রণালী, আচারব্যবহার ও রীতিনীতি শিক্ষা দেয়। মনুসংহিতার রচনা সময়েও বাণিজ্য এবং ব্যবসায় অনুসারে বিভিন্ন অসংখ্য জাতির সৃষ্টি হয় নাই।

ধর্ম্ম ও সাহিত্য প্রভৃতি সকল বিষয়ে উজ্জয়িনীপতি মহারাজ বিক্রমাদিত্য এই অভিনব পৌরাণিক যুগের নেতা ও প্রবর্ত্তক। মহাকবি কালিদাস ও কোষকার অমরসিংহ, এই বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের প্রধান রত্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভারবি কালিদাসের সময়ে না হইলেও তাঁহার অল্পকাল পরেই প্রাদুর্ভূত হন। হিয়াংসাঙ স্বীয় ভ্রমণ বৃত্তান্তে কান্যকুব্জপতি যে শিলাদিত্য (দ্বিতীয়) রাজার উল্লেখ করিয়াছেন, দণ্ডী, সুবন্ধু, বাণভট্ট ও ভর্তৃহরি সেই বিদ্যোৎসাহী নরপতির সভায় বর্ত্তমান থাকিয়া দশকুমার-চরিতাদি গ্রন্থ রচনা করেন। 'রত্নাবলী' প্রণেতা এই শিলাদিত্য (শ্রীহর্ষবর্দ্ধন) খ্রীষ্টীয় ৬১০ হইতে ৬৫০ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ভবভূতি রাজা যশোবর্ম্মার সময়ে (৭০০—৭৪০খ্রীঃ) বর্ত্তমান থাকিয়া উত্তরচরিতাদি সুপ্রসিদ্ধ নাটক রচনা করেন। আধুনিক হিন্দু জ্যোতিষের জনক আর্য্যভট্ট ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার শিষ্য বরাহ

মহারাজা অশোক তৃতীয়বার বিরোধী বৌদ্ধগণের প্রতিনিধিদিগকে বিহারে একত্রিত করিয়া বুদ্ধদেবের ধর্ম্মমত স্থিরীকৃত করিতে বাধ্য হন এবং উচ্চ ভারতের সর্ব্বত্র ও বহির্ভাগে তাহা প্রচারিত করেন। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্মের তদানীন্তন নেতা মহারাজা কনিষ্ক স্বরাজ্য কাশ্মীরে উত্তরাঞ্চলবাসী বৌদ্ধদিগকে পুনরায় আহ্বান

মিহির বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বাণভট্টের সমসাময়িক জ্যোতির্ব্বিৎ ব্রহ্মগুপ্তের ৫৯৮ খ্রীঃ জন্ম হয়। সূর্য্য সিদ্ধান্ত প্রণেতাও খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতেই বর্ত্তমান ছিলেন। খ্রীষ্টীয় ৫০০-৭৫০ অব্দকে সংস্কৃত সাহিত্যের অভূতপূর্ব্ব গৌরবের কাল বলিয়া অনায়াসে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এই সময় মধ্যেই মহাভারত ও রামায়ণ বর্ত্তমান আকারে পরিণত হয় এবং বিবিধ পুরাণ রচিত হয়।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য কুরুক্ষেত্রের প্রসিদ্ধ যুদ্ধে বিধর্ম্মী ও অসভ্য শকজাতিকে পরাজিত করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদ এবং হিন্দু ধর্ম্ম, জ্ঞান, সভ্যতা ও বিজ্ঞান দর্শনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। এই ঘটনা হইতে তিনি যে অব্দ প্রচলিত করেন, তাহা সংবতাব্দ নামে সর্ব্বত্র সুপ্রসিদ্ধ। সম্ভবতঃ ৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হিন্দু জ্যোতির্ব্বিৎগণ ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে বা তৎসন্নিহিত কালে এই সংবতাব্দের ব্যবহার আরম্ভ করেন। কিন্তু বৌদ্ধরাজ কনিষ্কের প্রবর্ত্তিত শকাব্দের অপেক্ষা হিন্দুরাজের প্রতিষ্ঠিত অব্দের প্রাচীনত্ব নির্দ্দেশ করিবার জন্য, প্রকৃত সময়ের ৬০০ বৎসর পূর্ব্বতন বলিয়া সংবতাব্দের কাল নির্দ্ধারণ করেন।

করিয়া; তাঁহাদের মতবিরোধ প্রশমিত করেন। পালিভাষায় লিখিত সিংহলের ধর্ম্ম গ্রন্থাবলীতে প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্মের, এবং নেপাল, তিব্বত, চীন ও জাপান দেশের ধর্ম্মপুস্তকে পরবর্ত্তী বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

খ্রীঃ পৃঃ ৩২৭ অব্দে মহাবীর আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তৎপর খ্রীঃপৃঃ চতুর্থ ও তৃতীয় শতাব্দীতে মৌর্য্যবংশীয় রাজন্যবর্গ মগধের রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া, সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের একাধিপত্য লাভ করেন। এরূপ পরাক্রান্ত ও প্রতাপশালী রাজ্য ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষে আর দেখা যায় নাই। সম্ভবতঃ ৩২০ খ্রীঃ পৃঃ অব্দে নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া চন্দ্রগুপ্ত মগধে মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। শোণ (হিরণ্যবাহু) ও গঙ্গা নদীর সঙ্গম স্থল হইতে বর্ত্তমান পাটনা নগরী পর্য্যন্ত তাঁহার রাজধানী পাটলীপুত্র বিস্তৃত ছিল। খ্রীঃ পৃঃ ৩১৭ অব্দে ভুবনবিজয়ী সম্রাট আলেকজাণ্ডারের প্রতিষ্ঠিত গ্রীকাধিকৃত ভারতের শাসনকর্ত্তা চন্দ্রগুপ্তের বুদ্ধিকৌশলে নিহত হয়। ব্যাকটিয়া ও সিরিয়ার অধিপতি সুপ্রসিদ্ধ সেলিউকাস নাইকেটর স্বীয় দুহিতাকে সম্প্রদানপূর্ব্বক তাহার সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়া, মিগাস্থিনিসকে তাঁহার রাজধানীতে দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করে। চন্দ্রগুপ্তের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া প্রতিপক্ষ এণ্টিগোনাসকে দমন করিবার জন্য সেলিউকাস খ্রীঃ পৃঃ ৩১২ অব্দে ব্যাবিলন নগরে প্রত্যাবৃত্ত হন।

চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র, প্রিয়দর্শী অশোক উড়িষ্যা হইতে গুজরাট পর্য্যন্ত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত খ্রীঃ পৃঃ ২৬৪-২২৩ অব্দ পর্য্যন্ত শাসন করেন। কনষ্টাণ্টিনোপলের সম্রাট কনষ্টেণ্টাইন স্বয়ং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যেমন তাহা সমস্ত রোম সাম্রাজ্যের অবলম্বনীয় প্রধান ধর্ম্ম করিয়া তোলেন, সেইরূপ মগধের সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম্মকে ভারত সাম্রাজ্যের জাতীয় ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠপদে অধিষ্ঠিত করেন। তাঁহার সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের চূড়ান্ত উন্নতি হয়। গুজরাট, পেশোয়ার, দিল্লী, আলাহাবাদ ও উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থানে তাঁহার আদেশ লিপি পাওয়া গিয়াছে। রাজতরঙ্গিনীতে তিনি কাশ্মীরের রাজা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। সিরিয়ার এণ্টিয়োকাস্ থিয়স্ (দ্বিতীয়), মিসরের টলেমি ফিলাডেলফস্, মেসিডনের এণ্টিগোনাস, এপিরসের আলেকজাণ্ডার, কাইরিনের মেগাস্ প্রভৃতি পরাক্রান্ত বিদেশীয় রাজন্যবর্গের সহিত সন্ধি বন্ধন করিয়া, অশোক তাঁহাদের রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত বৌদ্ধধর্ম্মোপদেষ্টা প্রেরণ করেন। খ্রীঃ পৃঃ ২৪৭ অব্দে পূর্ব্বোক্ত টলেমির মৃত্যু হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থ অশোক স্বীয় পুত্রকে সিংহলে প্রেরণ করেন। মহারাজ অশোকের সময় হইতেই ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম তিব্বত, ব্রহ্মদেশ, সায়াম, চীন প্রভৃতি প্রায় সমগ্র আসিয়ায় ব্যাপ্ত হয়।

---

* দশপুরুষ পর্য্যন্ত মৌর্য্যবংশ মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের যথেষ্ট উন্নতি বিধান করে। তদনন্তর শূদ্র জাতীয় সুঙ্গ ও কাণ্ব বংশ খ্রীঃ পৃঃ ১৮৩—২৬ অব্দ পর্য্যন্ত যথাক্রমে প্রবল হইয়া মগধে রাজত্ব করে। কাণ্ববংশীয় শেষ রাজাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া দক্ষিণাপথ হইতে অন্ধ্র বংশ মগধে রাজপাট সংস্থাপন পূর্ব্বক সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের একাধিপত্য লাভ করে। খ্রীঃ পূঃ ২৬ অব্দ হইতে

মহারাজ অশোকের বংশধরগণের প্রতাপ ও পরাক্রম কালক্রমে খর্ব্ব হইতে লাগিল। দশম পুরুষ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে মৌর্য্যবংশ বিলুপ্ত হইল। মিত্র (সুঙ্গ) বংশীয় নরপতিগণ তাঁহাদের স্থান অধিকার করিল। চৌদ্দজন মিত্রবংশীয় রাজা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর অব্যবহিত পূর্ব্ব-তন ও পরবর্ত্তী সময়ে নাগ, দত্ত, দেব, কান্ব, কুনন্দ ও অন্যান্য রাজবংশ ভারতের বিভিন্ন স্থানে রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহারা সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরক্ত ছিলেন বলিয়া, তাঁহাদের নামাঙ্কিত মুদ্রা দৃষ্টে প্রতীয়মান হইতেছে। খৃষ্টীয় অব্দের প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে নয় জন নাগবংশীয় রাজা রাজত্ব করেন। তাঁহাদের সময়ে কনোজে গুপ্ত-বংশীয় সম্রাট্‌গণের আধিপত্য সংস্থাপিত হয়।

খ্রীষ্টীয় অব্দের ১৪১ হইতে ৩১৯ অব্দ পর্য্যন্ত প্রায় সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত চন্দ্রবংশীয় গুপ্তসম্রাটদিগের পদানত থাকে। প্রিন্সেপ সাহেবের মতে তের জন গুপ্তবংশীয় হিন্দু রাজা আর্য্যাবর্ত্তে রাজত্ব করেন। মতান্তরে ৮ জন রাজার নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। চন্দ্র (?) গুপ্ত, ঘটোৎকচ, চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্র গুপ্ত, চন্দ্রগুপ্ত দ্বিতীয় (বক্রগুপ্ত), কুমার গুপ্ত (মহেন্দ্র গুপ্ত), স্কন্দ গুপ্ত, বুদ্ধগুপ্ত (নরগুপ্ত) ডাক্তর হারনলি গুপ্তবংশীয় এই আট জনের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ৪৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সার্দ্ধ চারিশত বৎসর অন্ধ্রবংশ প্রবল পরাক্রমের সহিত আর্য্যাবর্ত্ত শাসন করিয়া কনোজের গুপ্ত সম্রাটদিগের পদানত হয়। গুপ্ত সম্রাটগণ ৫০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্তের একাধিপতি ছিলেন। তাঁহারা হিন্দু হইলেও বৌদ্ধদিগকে উচ্ছেদ করা সঙ্গত মনে করেন নাই। তাঁহারা সূর্য্যবংশীয় ছিলেন। তাঁহারা সকলেই শৈব ছিলেন। তাঁহাদের নামাঙ্কিত স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা দৃষ্টে ইতিহাসবিৎ-গণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তাঁহাদের দ্বারা এই উভয়বিধ মুদ্রাই আর্য্যাবর্ত্তে প্রথমতঃ প্রচলিত হয়। কান্যকুব্জের ন্যায় উজ্জয়িনী ও পাটলীপুত্রে তাঁহাদের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। সংস্কৃত পুরাণেও তাঁহাদিগকে মগধের রাজা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। মগধের সন্নিহিত বঙ্গদেশও তাঁহাদের শাসন দণ্ডের অধীন থাকাই সম্ভবপর *। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য মহারাজ অশোকের সাম্রাজ্য হইতে কোন ক্রমেই অল্পায়তন ছিল বলিয়া বোধ হয় না। গুপ্তবংশের অধঃপতনের পর তাঁহাদের সাম্রাজ্য নানা

* উড়িষ্যার চন্দ্রবংশীয় গুপ্তসম্রাট্‌গণ বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন করিয়া হিন্দুধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করেন বলিয়া বোধ হইতেছে। উড়িষ্যার সুপ্রসিদ্ধ কেশরীবংশ তাঁহাদের দ্বারাই স্থাপিত হয়। কটকে বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় যে তাম্রশাসন প্রাপ্ত হন, তাহা হইতে দেখা যায় 'সোমকুলতিলক ত্রিক-লিঙ্গাধিপতি মহারাজাধিরাজ' মহাভব গুপ্তের পুত্র মহারাজ মহাশিব গুপ্তের নামে জনমেজয়ের পুত্র মহারাজ যজাতি কেশরী স্বীয় রাজত্বের নবম বর্ষে কিয়ৎপরিমাণ ভূমি গঙ্গাপাণিভট্টকে প্রদান করেন। শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপ চন্দ্র ঘোষ সম্বলপুর হইতে প্রাপ্ত যে তাম্রশাসন প্রকাশিত করেন, তাহা হইতেও দেখা যায় যে, শিবগুপ্তদেবের পুত্র মহাভব গুপ্তের নামে পূর্ব্বোক্ত জনমেজয় দেব স্বীয় রাজত্বের ষষ্ঠ বর্ষে কিছু ভূমি চারিগোত্রের চারিজন ব্রাহ্মণকে দান করেন। ৪৭৪ হইতে ৫২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৫২ বৎসরকাল মহারাজ যযাতি কেশরী উড়িষ্যায় রাজত্ব করেন। এই সময়ে গুপ্তদিগের সাম্রাজ্য উড়িষ্যা পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিলে ৩১৯ খ্রীঃ গুপ্তবংশের পতন কিরূপে সম্ভব হয়? কিন্তু তাম্রশাসনের প্রতিলিপিতে কান্যকুব্জের কোনও উল্লেখ দেখিতে পাইতেছি না। এই গুপ্তগণ তাহা হইলে কোথায় রাজত্ব করিতেন?

ভাগে বিভক্ত হয়। মহারাজ প্রথম চন্দ্র গুপ্তের রাজত্বের প্রথম বর্ষে (১৬৬ খ্রীঃ) গুপ্ত-অব্দ প্রচলিত হয়। গুপ্তগণের নামাঙ্কিত মুদ্রা দৃষ্টে বোধ হয় যে, তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী শক (Scythian) বংশীয়, কাশ্মীর ও কাবুলের সম্রাট্‌গণের এবং সৌরাষ্ট্রের সত্রপ (Satrap) রাজাদিগের পরে প্রাদুর্ভূত হন।

খ্রীঃ পূঃ ২৫০-১২০ অব্দ পর্য্যন্ত গ্রীকদিগের সংস্থাপিত ব্যাকট্রিয়ানা রাজ্য, আলেক-জাণ্ডারের মৃত্যুর পর হইতে নানাভাগে বিভক্ত হইয়া, স্বীয় স্বাধীনতা অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হয়। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের ৪৪ জন নৃপতি ও রাজ্ঞীর নাম এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কোন কোন রাজ্য আফগানিস্থান ও পাঞ্জাব পর্য্যন্ত আধিপত্য সংস্থাপন করে। ব্যাকট্রিয়ানার পূর্ব্বভাগে বৌদ্ধধর্ম্ম ও পাশ্চাত্য পালি-ভাষা প্রচলিত হইয়াছিল। খ্রীঃ পূঃ ১২০ অব্দে অসভ্য শকজাতি মধ্য আসিয়া হইতে বহির্গত হইয়া ব্যাকট্রিয়ানার স্বাধীনতা ধ্বংশ করেন। সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত তাঁহাদের আধিপত্য সংস্থাপিত হয়। শকজাতীয় ক্যাড্‌ফাইছিছ নাইছা রাজ্যের গ্রীক অধিপতি ছার্ম্মিয়াস্‌কে পরাজিত করিয়া নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজবংশ, কাবুলে রাজধানী স্থাপন করিয়া, কাসগর, ইয়ারকন্দ, কাবুল, কাশ্মীর, পাঞ্জাব ও গুজারাট প্রভৃতি ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তর প্রান্তস্থিত দেশে, খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় অব্দের দ্বিতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত, শাসন করেন। তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সভ্যতার সোপানে আরূঢ় হন। কনিষ্ক এই বংশের সর্ব্বপ্রধান নরপতি। অশোকের পর আর কোন বৌদ্ধ সম্রাট এতাদৃশী প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে (বৌদ্ধদেবের নির্ব্বাণ লাভের ৪০০ বৎসর পরে) সিংহাসনে আরোহণ করিয়া যে অব্দ প্রচলিত করেন, তাহা শকাব্দ নামে অদ্যাপি প্রচলিত আছে। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে হিন্দুগণ এই অব্দ পাটনরাজ শালিবাহনের নামে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। কনিষ্ক (কেনার্কি) হুষ্ক (হুযার্কি) ও বাসুদেবের নাম কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীতে উল্লিখিত আছে। বাসুদেব এই বংশের শেষ রাজা।

খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় অব্দের সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত ২৬ জন সত্রপ সৌরাষ্ট্রে (গুজরাট ও কচ্ছ দেশে) রাজত্ব করেন। তাঁহাদের নামাঙ্কিত মুদ্রা দৃষ্টে তাঁহাদিগকে অশোকের পরবর্ত্তী ও গুপ্ত বংশের পূর্ব্ববর্ত্তী নৃপতি বলিয়া বোধ হয়। ডাক্তার হারণলির মতে সংবতাব্দ (৫৭ খ্রীঃপূঃ) তাঁহাদিগের রাজত্বকালের আরম্ভ হইতে প্রবর্ত্তিত হওয়া সম্ভবপর।

গুপ্তবংশের অধঃপতনের পর গুজরাটের বল্লভীবংশ ৩১৯ খ্রীষ্টাব্দে বল্লভীপুরে অতি পরাক্রান্ত রাজ্য সংস্থাপিত করে। এই বংশের স্থাপয়িতা কনক সেন ও ধর সেন কনোজের গুপ্তসম্রাটদিগের অধীনে গুজরাটের শাসন কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন। বল্লভী বংশীয় ১৯ জন নরপতি ৩১৯—৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। কাহারও মতে তাঁহারা এগার পুরুষে ২৪০ বৎসর রাজ্য শাসন করেন। গুপ্তগণের প্রবর্ত্তিত অব্দ বল্লভীগণ ব্যবহার করিতে থাকেন। এই বল্লভীবংশীয় ধর্ম্মশিলাদিত্যকে ৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে হিয়াংশঙ দর্শন করেন।

উত্তর ভারতবর্ষের ইতিহাসে ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, পূর্ব্বা-

লিখিত রাজবংশসমূহের ন্যায় প্রবল পরাক্রমশালী কোনও রাজবংশ আধিপত্য স্থাপন করে নাই, কোনও প্রসিদ্ধ মন্দিরাদি নির্ম্মিত হইয়া শিল্পশাস্ত্রের উৎকর্ষতার পরিচয় দেয় নাই, সাহিত্য ও দর্শনবিজ্ঞানের আলোচনাব কোনও বিশেষ চিহ্ন লক্ষিত হয় নাই, কপিল কালিদাসাদির ন্যায় কোনও প্রসিদ্ধ দার্শনিক বা কবি অভ্যুদিত হয় নাই। অশোক কি· বিক্রমাদিত্যেব ন্যায় কোনও প্রসিদ্ধ নৃপতি জন্ম গ্রহণ করে নাই। এই দুই শত বর্ষের অন্ধতমসাচ্ছন্ন কালকে ভারতীয় ইতিহাসের তমোযুগ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এই তমোযুগে বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষ রূপে উৎপীড়িত ও উন্মূলিত হইয়া, ভারতবর্ষ হইতে তিব্বত ও চীন প্রভৃতি দেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান শত্রু সুপ্রসিদ্ধ শঙ্করাচার্য্য দক্ষিণাপথের অন্তর্গত মলবার দেশে ৭৮৮ খ্রীষ্টীয়াব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। স্বকীয় অলৌকিক প্রতিভা ও বিদ্যাবত্তার বলে তিনি বৌদ্ধাচার্য্যদিগের মত যুক্তিতর্কবলে খণ্ডন করিয়া, জনসমাজে বৌদ্ধধর্ম্মের অসারতা ও হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত করেন। তিনি অদম্য উৎসাহের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত করিয়া, ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের মূল উৎপাটিত করেন। তিনি গ্রন্থাদি রচনা দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে যেরূপ তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করেন, সেইরূপ হিন্দুধর্ম্মানুরাগী নূতন রাজন্যবর্গ বৌদ্ধদিগের প্রতি অত্যাচার ও অবিচারের একশেষ প্রদর্শন করেন। এই সকল রাজবংশের মধ্যে আর্য্যাবর্ত্তের রাজপুতগণ সবিশেষ প্রসিদ্ধ। ৯৫০ খ্রীষ্টীয়াব্দ হইতে এই রাজপুত নরপতিগণ লাহোর, কনোজ, উজ্জয়িনী ও গুজরাট প্রভৃতি আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত নানাস্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য সংস্থাপিত করেন। উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্য ৫৪৪ খ্রীষ্টীয়াব্দে করুরের যুদ্ধক্ষেত্রে যে শকজাতিকে পরাজিত করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল তরঙ্গের গতিরোধ করেন, কথিত আছে, এই রাজপুতগণ তাঁহাদেরই বংশধর। বিক্রমাদিত্যের শৌর্য্যবীর্য্যের নিকট পরাজিত হইয়া, তাঁহারা শান্তভাবে পশ্চিম ভারতের অনুর্ব্বর মরুপ্রদেশাদিতে উপনিবিষ্ঠ হন। তাঁহারা সম্ভবতঃ পৈতৃক বৌদ্ধধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু সভ্যতার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নব ধর্ম্ম ও সভ্যতার যথোচিত বিস্তারে সবিশেষ যত্নপর হন। পুরাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগের পর তাঁহারা তাহার বিরুদ্ধে নব ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার্থ তুমুল সংগ্রাম করিয়া ধর্ম্মদ্রোহিতার পরিচয় দিবেন, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? হিন্দু ধর্ম্মের নবীন অনুরাগে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারা যেথানেই বিজয়ীর বেশে উপস্থিত হইয়াছেন, সেইখানেই বৌদ্ধ মন্দির ও ধর্ম্মশালা ভূমিসাৎ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে হিন্দু দেবমন্দির নির্ম্মাণ পুরঃসর হিন্দু দেব দেবী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই রাজপুত জাতির অভ্যুদয় হইতেই আধুনিক হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণজাতির একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া, হিন্দুজাতির বর্ত্তমান অধোগতির সূত্রপাত হয়। সমাজের এক অঙ্গ প্রবল হওয়াতে অপর অঙ্গ দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া উঠে।

পশ্চিম ইউরোপের সহিত উত্তর ভারতের বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। রোম সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর ইউরোপের তমোযুগে ফ্রেঙ্ক, লম্বার্ড, ভেণ্ডাল, গথ, হুন

প্রভৃতি অসভ্য জাতি উত্তর ইউরোপ হইতে বহির্গত হইয়া রোম সম্রাজ্যের বিভিন্নভাগে স্ব স্ব আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে। কালক্রমে তাহারা পৌত্তলিকতা পরিত্যাগপূর্ব্বক রোমের প্রবর্ত্তিত খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সভ্যতার সোপানে আরোহণ করে এবং তদ্দারা তত্তৎ দেশীয় জনগণের সহিত মিশ্রিত হইয়া পড়ে। মগধ সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় ও প্রথম শতাব্দীতে ব্যাকট্রিয়ার গ্রীকগণ ভারতবর্ষে প্রবিষ্ট হইয়া উড়িষ্যা পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তারপূর্ব্বক গ্রীক বিজ্ঞান ও সভ্যতা বিজিত দেশে প্রথমতঃ আনয়ন করে। তৎপর তুরেনিয়ান, স্যাইথিয়ান, কাম্বোজিয়ান, শক ও হুন প্রভৃতি অসভ্য জাতি খ্রীষ্টীয় অব্দের পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত পশ্চিম ভারতে প্রবিষ্ট হইয়া রাজ্য বিস্তার করিতে থাকে। এই সকল বিদেশীয় জাতি মগধের বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক সভ্য হইয়া ভারতীয় অধিবাসীগণের সহিত মিশিয়া যায়। কালক্রমে তাহাদের সহিত ভারতবাসীর পার্থক্য সম্পূর্ণ রূপে তিরোহিত হয়। তাঁহাদের বংশধর রাজপুতদিগের দ্বারাই হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য প্রতিষ্টিত হইয়া বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের সূত্রপাত করে। ৫৪৪ খ্রীঃ করুরের যুদ্ধে বিক্রমাদিত্য বৌদ্ধ শকজাতির রাজ্যবিস্তৃতি নিরুদ্ধ করেন এবং বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল উচ্ছ্বাস হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিয়া হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। সম্রাট তৃতীয় ভেলেন্‌টিনিয়ানের সময়ে, ৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে, রোমসেনানী ইটিয়াস ও থিওডোরিক সেলোনের যুদ্ধক্ষেত্রে হুনরাজ এট্টিলাকে পরাজিত করিয়া অসভ্য হুনজাতির বিজয়িনী গতি সম্পূর্ণরূপে নিরোধপূর্ব্বক ইউরোপকে রক্ষা করেন। ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রেঙ্ক-নৃপতি বীরচূড়ামণি চার্লস্ পোইটিয়ারসের সুপ্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয়ী মুসলমান সেনাপতি আবদুল রহমানকে পরাজিত ও নিহত করিয়া মুসলমান ধর্ম্মের প্রবল উচ্ছ্বাস হইতে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী ইউরোপকে চিরকালের জন্য পরিত্রাণ করেন। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্যের সময়ে ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম্ম পুনরুজ্জীবিত হইয়া মৃতপ্রায় সংস্কৃত সাহিত্যের গৌরবান্বিত নব যুগের অবতারণা করে। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে সম্রাট সারলিমেনের সময়ে (৭৭০-৮১৪ খ্রীঃ) ইউরোপে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ও সাহিত্যের সবিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। মহারাজা বিক্রমাদিত্যের সভা মহাকবি কালিদাসাদি নব রত্নের দ্বারা যেমন অলঙ্কৃত হইয়াছিল, সেইরূপ সম্রাট চার্লসের (Charlemagne) সভায় এলকুইন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বর্ত্তমান ছিলেন। মগধের সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাহা ভারতীয় জাতীয় ধর্ম্মে পরিণত করেন, সম্রাট কনষ্টেণ্টাইন খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ইউরোপে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সর্ব্বতোমুখী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। ভারতের বৌদ্ধধর্ম্ম বৈষম্যবাদ ও জাতিভেদের উচ্ছেদ সাধন করিয়া ধনী ও দরিদ্র, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র, পণ্ডিত ও মূর্খ, দেশীয় ও বিদেশীয় সকলের মধ্যে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব ও সার্ব্বভৌমিক প্রেম প্রতিষ্ঠিত করে। ইউরোপে খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম জাতিমর্য্যাদা নির্ব্বিশেষে সকলশ্রেণীর লোকের মধ্যে মধুর ভ্রাতৃভাব সংস্থাপিত করিয়া সাম্যবাদের মূল মন্ত্রে সকলকে দীক্ষিত করে। খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মের সাম্যবাদে দীক্ষিত ইউরোপ একতার

মাহাত্ম্যে বিজয়ী মুসলমান জাতির দুর্দ্ধর্ষ ও অপ্রতিহত গতি সম্পূর্ণরূপে নিরোধ করিয়া বর্ত্তমান উন্নতি ও সভ্যতার সূত্র পাত করে। বৌদ্ধধর্ম্ম ও সাম্যবাদকে পদদলিত করিয়া হিন্দুধর্ম্ম জাতিভেদ ও বৈষম্যবাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করে। হিন্দু ধর্ম্মের বৈষম্যবাদে জর্জ্জরিত ও প্রপীড়িত হইয়া একতার অভাবে ভারতবর্ষ বিজয়ী মুসলমানজাতির দুর্দ্ধর্ষ প্রতাপের নিকট মস্তক অবনত করে এবং স্বাধীনতা হারাইয়া চির দাসত্বের দুশ্ছেদ্য লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হয়। সাম্যবাদের মহামন্ত্র বিস্মৃত হইয়া ভারতবর্ষ জাতীয় অধোগতির চরম সীমায় উপনীত হয়। ১১৯৩ খৃঃ হিন্দুজাতির স্বাধীনতা অন্তর্হিত হইয়া বিদেশীয় মুসলমান জাতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

যে সময়ে রাজপুত সামন্তগণ পশ্চিমভারতে অভ্যুদিত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে উন্মূলিত করিয়া হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন, সেই সময় হইতে ভারতবর্ষে মধ্যযুগ আরম্ভ হয়। এই যুগের আরম্ভ হইতেই ভারতবর্ষের নানা স্থানে ভিন্ন ভিন্ন বংশ কর্ত্তৃক বিভিন্ন রাজ্য সংস্থাপিত হয়। ইহাদের মধ্যে—কাবুল ও পাঞ্জাবের পালোপাধিক হিন্দুরাজগণ, কাশ্মীরের উৎপলবংশ, কাঙ্গরার মহারাজবংশ, আজমীর ও দিল্লীর চৌহান ও তুঁয়ার বংশ, মালবের প্রথরবংশ, মিবারের শিশোদিয়া (গেহলোট) বংশ, অম্বর ও গোয়ালিয়ারের কচবহ বংশ, ত্রিপুরীর কুল্লাচারী চেদি বংশ, কনোজের গহড়গড় রাঠোর বংশ, মহোবার পরিহর ও চাণ্ডেল বংশ, বঙ্গ ও বিহারের পালবংশ এবং বাঙ্গলার সেনবংশ সবিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহাদের রাজ্য, প্রতাপ ও পরাক্রম, পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে নাই। এই সকল রাজবংশের মধ্যে একতার সম্পূর্ণ অভাব ও পরস্পরের ঘোরতর ঈর্ষা বিদ্বেষ বিরাজিত ছিল। ইহারা স্বদেশের কল্যাণের নিমিত্ত স্ব স্ব ক্ষুদ্রতর স্বার্থ ও পরস্পর বিদ্বেষ পরিত্যাগপূর্ব্বক সমবেতভাবে একতার মহা মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া কার্য্য করিতে পারিলে, ভারতবর্ষে মুসলমানজাতির প্রভুতা কোন কালেও সংস্থাপিত হইতে পারিত কি না, সন্দেহ স্থল।

কনোজের গুপ্তসম্রাটদিগের অধঃপতন ও গৌড়ের পালবংশীয় রাজন্যবর্গের অভ্যুদয়ের মধ্যভাগে বাঙ্গলায় কাহারা কি ভাবে রাজত্ব করেন, অতীত সাক্ষী ইতিহাস আজ পর্য্যন্তও তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারে নাই। মধ্যযুগে যে সমস্ত রাজবংশ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে প্রাধান্য লাভ করেন, তন্মধ্যে পালবংশের সহিত দূরতর ভাবে এবং সেনবংশের সহিত সাক্ষাৎ সম্পর্কে ঢাকার ইতিহাস সংসৃষ্ট রহিয়াছে বিধায়, সংক্ষেপে তাঁহাদের বিবরণ পরবর্ত্তী প্রস্তাবে ক্রমে ক্রমে বিবৃত করিব।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

—o—

চৈতন্যচরিত ও চৈতন্য ধর্ম্ম। (৩৫শ)

শান্তিপুরে।

বেলা অবসান হইয়াছে। শচীমন্দিরে ভক্তগণ সমবেত। শচীদেবী ভূপতিতা, সংজ্ঞাহীনা। আজ বার দিন নিমাই সন্ন্যাসে গিয়াছেন, শচী দেবীর এই বার দিন উপবাস। গভীর পুত্রশোকে শচীর মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে, তিনি জাগ্রত স্বপ্ন দেখিতেছেন। রামকৃষ্ণকে অক্রুর মথুরায় হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, শচীদেবী যশোদার ভাবে বিহ্বলা, এক একবার চক্ষুরুন্মীলন করিয়া যাহাকে দেখিতেছেন, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "হ্যাগো তোমরা কি মথুরাবাসী? আমার রামকৃষ্ণ কেমন আছেন-জান?" এমন সময়ে নিত্যানন্দ আসিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন; শচীদেবী একবার চাহিয়া দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন 'তুমি কি অক্রূর এলে? ঐ শুন গোষ্ঠ মাঝে সিঙ্গা বেণু বাজিতেছে; আমি বলিয়া পাঠাইতেছি, আমার রামকৃষ্ণ যেন গহনবনে চলিয়া যান্, তাহলে তো অক্রূর, তুমি তাঁদের ধরিতে পারিবে না।' নিত্যানন্দ দেখিলেন, শচী প্রলাপ বকিতেছেন। আর কিছু না বলিয়া উচ্চরবে বলিয়া উঠিলেন, "গৌর, আপনাকে দেখিবার জন্য, শান্তিপুরে অদ্বৈত ভবনে অপেক্ষা করিতেছেন। আপনাদের লইয়া যাইবার জন্য আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।" ভক্তগণ শুনিয়া বিষাদ পরিত্যাগ করিলেন, আনন্দ উৎসাহে প্রফুল্ল হইলেন। কথা শচীর কাণে প্রবেশ করিয়া অমৃত সিঞ্চন করিল। মস্তিষ্কের জড়তা দূর হইল এবং অল্পে অল্পে জ্ঞান লাভ করিয়া নিত্যানন্দকে চিনিতে পারিলেন। অবিরল ধারায় নয়ন ও বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল তিনি নিত্যানন্দের হাত ধরিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ শচীর দ্বাদশ উপবাসের কথা শুনিয়া বলিলেন "মা! আমি কি জানি যে তোমাকে প্রবোধ দিব; তুমি কি শ্রীকৃষ্ণের রহস্য বুঝিতেছো না? তোমার পুত্র অলোকসামান্য; কে তাঁহার মহিমা জানিতে পারে? তিনি যখন তোমার বুকে হাত দিয়া বারবার বলিয়াছেন যে, ঐহিক পারমার্থিকের তোমার যত ভার, সকলই তাঁহার, তখন তাঁহার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া থাকা কি ভাল নয়? যাহাতে তোমার ভাল হইবে, নিশ্চয়ই তিনি তাহা করিবেন। শোক সম্বরণ করিয়া স্নানাহ্নিক করত শ্রীকৃষ্ণের ভোগের আয়োজন কর; ইষ্টদেব উপবাসী থাকিলে প্রত্যবায় হয়।'

শচীদেবী নিত্যানন্দের কথায় আশ্বস্ত হইয়া স্নানাদি করিয়া পাক করিলেন; এবং ভক্তদিগকে আহার করাইয়া নিজে কিছু ভোজন করিলেন এবং পর দিন শান্তিপুরে পুত্র দর্শনে যাইবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। এদিকে নিত্যানন্দের মুখে গৌরের ফুলিয়া গমন বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য নবদ্বীপের স্ত্রীবালক বৃদ্ধ সকলেই সাজিল। অতি প্রত্যূষ হইতে যাত্রীদল দলে দলে চলিতে লাগিল। খেয়াঘাটে লোকে লোকারণ্য। খেয়ারী পার

করিয়া উঠিতে পারিতেছে না; কেহ বা নৌকায়, কেহ বা ভেলায়, কেহ কেহ ঘট বুকে দিয়া এবং কেহ বা সন্তরণ করিয়া নদী পার হইয়া ফুলিয়া অভিমুখে চলিয়াছে। শান্তিপুর, ফুলিয়া, নবদ্বীপ তখন এক পারে; সুতরাং বর্ত্তমান খড়ে নদী পারের কথাই লিখিত হইয়াছে। যাহা হউক, যাত্রীদল ফুলিয়া নগরে যাইয়া অপরূপ সন্ন্যাসী দেখিয়া কৃতার্থ হইল। গৌরচন্দ্র আগন্তুকদিগকে যথাযোগ্য মিষ্ট সম্ভাষণ করিয়া বিদায় দিয়া শান্তিপুরে চলিয়া গেলেন; কিন্তু জনতার হাত এড়াইতে পারিলেন না। যাত্রীদলও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শান্তিপুরে চলিল। চৈতন্যচরিতামৃতে ফুলিয়া গমনের কোন উল্লেখ নাই। চৈতন্যভাগবতে যদিও উহা উল্লিখিত হইযাছে বটে, কিন্তু কি উদ্দেশ্যে তথায় গমন করিয়াছিলেন ও কোথায়ই বা অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তাহার কোন বিশেষ বৃত্তান্ত দেখা যায় না। 'ভক্ত হরিদাসের আশ্রমে যাই' বলিয়া গৌর তথায় গিয়াছিলেন; ইহার পরে শান্তিপুরে অবস্থিতি সময়ে হবিদাসের উপস্থিতি দেখা যায়। মনে হয়, হরিদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে শান্তিপুরে লইয়া যাওয়াই গৌরের ফুলিয়া যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল।

নবীন সন্ন্যাসী শ্রীপাদ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মুকুন্দ হরিদাসের সহিত অদ্বৈত ভবনে উপনীত হইলে, আচার্য্য বিস্ময়ে আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার আগমনের কথা নগরে রাষ্ট্র হইয়াছিল। তিনি আসিতে না আসিতে অদ্বৈত মন্দির লোকে পূর্ণ হইয়া গেল। সকলের মুখেই আনন্দ ও উৎসাহের চিহ্ন। আজ হইতে অদ্বৈত গৃহে মহা মহোৎসব আরম্ভ হইল। অদ্বৈতাচার্য্যের শিশুপুত্র অচ্যুতানন্দ দিগম্বর হইয়া ধূলিধূসরিত অঙ্গে খেলা করিতেছিল। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করিলে গৌরচন্দ্র শিশুকে কোলে করিয়া লইয়া মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন "কেমন অচ্যুত! অদ্বৈত আচার্য্য আমার পিতা, তুমি আমার ভাই; এস ভাই আমরা ভাই ভাই খেলা করি।" কথিত আছে, বালক অচ্যুতানন্দ উত্তর করিয়াছিলেন, হাঁ দৈবযোগে তুমি কখন কখন জীবের সখা হও বটে, কিন্তু সর্ব্বদাই তুমি সকলের পিতা। এমন সময় নবদ্বীপের ভক্তগণ সঙ্গে নিত্যানন্দ অগ্রে দোলায় চড়াইয়া শচীদেবীকে লইয়া উপনীত হইলেন। চরিতামৃতের মতে আচার্য্য-রত্ন ইহাদিগকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ গৌরের সঙ্গে ছিলেন। যাহা হউক, জননীকে দেখিয়া গৌরচন্দ্র সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ হইলেন। শচী পুত্রকে কোলে লইয়া পুত্রের মুণ্ডিত মস্তক ও সন্ন্যাসীর বেশ দেখিয়া কাঁদিয়া ব্যাকুল হইলেন। পুনঃ পুনঃ মুখ চুম্বন করিতে ও অঙ্গে হাত বুলাইতে লাগিলেন। শচী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "বাবা নিমাই! সন্ন্যাসী হয়েছিস্ হয়েছিস্, কিন্তু দেখিস্, বিশ্বরূপের মত আমাকে যেন ফেলে পালাস্ নে।" বিশ্বম্ভরও জননীর ব্যাকুলতা দেখিয়া বিহ্বল হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "মা! এই শরীর দেহ মন সকলই তোমার, আমি জন্ম জন্মান্তরে তোমার মত মায়ের ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না। সহসা সন্ন্যাস করিয়াছি বলিয়া তোমার প্রতি কখনই উদাসীন হইতে পারিব না। তুমি যে আজ্ঞা করিবে ও যেখানে থাকিতে বলিবে,

তাহাই করিব।" শচীদেবী আশ্বস্তচিত্তে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে শ্রীগৌরাঙ্গ নব-দ্বীপের বন্ধুদিগকে একে একে আলিঙ্গন করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলেই মহানন্দে মত্ত হইয়া পূর্ব্বের বিরহ দুঃখ ভুলিয়া গেলেন। অদ্বৈতাচার্য্য সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র বাসস্থান ও পরিচারক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। অদ্বৈত গৃহে মহামহোৎসব আরম্ভ হইল। যথাসময়ে নানাবিধ অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইলে গৌরচন্দ্র সবান্ধবে ভোজন করিতে বসিলেন। স্বয়ং অদ্বৈত পরিবেশন করিতে লাগিলেন। আচার্য্য-পত্নী সীতা দেবী আজ মনের উল্লাসে কতই পাক করি-য়াছেন। চৈ মরিচের ঝালে সুক্তা, নানা বিধ শাক, বার্ত্তাকু যোগে কোমল নিম্বপত্র ভাজা, মোচার ঘণ্ট, বড় অম্ল, মধুরাম্ল প্রভৃতি আর ছয় প্রকারের অম্ল, মুগের দাইল, নানাপ্রকার বড়া, ক্ষীরপুলি, নারিকেলপুলি পিষ্টকাদি সঘৃত পায়সান্ন, ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ, চাঁপা কলা, নারিকেল শস্য, ছানা, শর্করা যোগে সুমিষ্ট পিষ্টক, সুবাসিত সূক্ষ্ম আতপের সঘৃতান্ন প্রভৃতি আহারের নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে। এক এক জনের অন্নস্তূপের চারিদিকে পঞ্চাশ পঞ্চাশ ব্যঞ্জনপূর্ণ দোনা সজ্জিত। চৈতন্য প্রভু ভোজন করিবেন কি, অন্নব্যঞ্জনের পারিপাট্য দেখিয়া প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, এবং অদ্বৈতাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় বসিব? এত ভাত তরকারী খাইতে পারিব না।" অদ্বৈত বলিলেন, "খেতে না পার, পাতে পড়িয়া থাকিবে।" চৈতন্য বলিলেন, "সন্ন্যাসীর পাতে উচ্ছিষ্ট রাখা কর্ত্তব্য নয়।" আচার্য্য পরিহাস করিয়া বলিলেন, "তোমার সন্ন্যাসের ভারিভুরি আমি সব জানি, আর গোলে কাজ নেই, এখন খেতে বসো।" এই বলিয়া গৌরের হাত ধরিয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে বসাইয়া দিলেন। নিত্যানন্দ বলিয়া উঠিলেন, "পাঁচ পাঁচটা উপবাস করে আছি, আজ দেখ্‌ছি এই কয়টা ভাতে পেটই ভরিবে না।" অদ্বৈত বলি লেন, "বেশ তো সন্ন্যাসী দেখ্‌ছি, সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম, যে যাহা দেয়, সন্তুষ্ট চিত্তে তাহাই লইতে হয়। অসন্তুষ্ট হইলে ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হয়। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, যে মুষ্টিকান্ন দিয়াছি, তাতেই সন্তুষ্ট হও, লোভ করো না।" নিতাই কৃত্রিম কোপভরে বলিলেন, "নিমন্ত্রণ করিতে গিয়েছিলে কেন? যত চাইব, তত দিতে হবে।"

অদ্বৈত বলিলেন, "এটা কোথাকার ভ্রষ্ট অবধূত। এমনি করে দরিদ্র গৃহস্থকে জ্বালাতন করতে সন্ন্যাসী হয়েছো না কি? যা পেয়েছো, তাতেই সন্তুষ্ট হও। আমার ঘরে আর ভাত নেই।"

এইরূপে হাস্য কৌতুকে ভোজন চলিতে লাগিল। শ্রীচৈতন্য এক এক ব্যঞ্জনের অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক খাইয়া রাখিতে লাগিলেন; অদ্বৈত পুনরায় তাহা পূরণ করিয়া দিতে লাগিলেন। গৌর বলিলেন, "আর খেতে পারি না।" অদ্বৈত উত্তর করিলেন, "তা হবে না, আগে যাহা দিয়াছি, তা সব খেতে হবে, এক্ষণে যাহা দিচ্চি তাহার অর্দ্ধেক খাইবে, অর্দ্ধেক রাখিবে"। নিতাই বলিলেন, "আজ যখন পেটই ভরিল না, তখন তোর ভাত তুই নে" এই বলিয়া একমুষ্টি উচ্ছিষ্টান্ন লইয়া আচার্য্যের গায়ে ছড়াইয়া দিলেন। অদ্বৈত ভাত গায়ে লইয়া নাচিতে আরম্ভ করিলেন এবং বলিলেন, "ঢঙ্গটার এঁটু গায়ে

করে, আজ পবিত্র হলেম, হাঁবে নিতাই গায়ে এঁটু দিয়ে আমার জাতকুল নাশ করিলি।" নিতাই বলিলেন, "কৃষ্ণের প্রসাদকে তুমি এঁটু বলে অপবাধ কব্‌লে, একশত সন্ন্যাসী ভোজন না করালে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।" অদ্বৈত কৃত্রিম ক্রোধ ভবে বলিলেন, "যা! যা! তোর মত সন্ন্যাসীতে আমার কাজ নাই, সন্ন্যাসী গুলাই তো আমাব স্মৃতিধর্ম্ম নাশ করিল।" ভোজন সমাধান্তে সকলে বিশ্রাম কবিলেন। অদ্বৈত মাল্য চন্দন লইয়া মহাপ্রভুব যোগ কবিতে উপস্থিত হইলে গৌর বলিলেন, "আমাকে অনেক নাচাইলে, আর কাজ নাই, এক্ষণে ভোজন করগে।"

সন্ধ্যা সমাগত হইলে অদ্বৈতাচার্য্যেব বাহির প্রাঙ্গণে সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। শান্তিপুবের লোক নূতন সন্ন্যাসীকে দেখিবাব জন্য দলে দলে আসিতে লাগিল। ক্ষণকালে প্রাঙ্গন গৃহ লোকে পূর্ণ হইয়া গেল। গৌরের অপরূপ লাবণ্য মুণ্ডিত মস্তক, পরিধেয় অরুণ বর্ণের কৌপীন বহির্বাস, গলায় হরিনামেব মালা, সর্ব্বাঙ্গ চন্দন মাল্যে সুশোভিত দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইয়া গেল। প্রথমে অদ্বৈতাচার্য্য গাইতে ও নাচিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার স্বেদ, পুলক, অশ্রু, কম্প, আনন্দ, উৎসাহ ও মত্ততায় লোকে প্রেম বিহ্বলে কাঁদিতে লাগিল। তিনি এই পদ গাইতে লাগিলেন :—

"কি কহিব রে আজ কি আনন্দ ওর,
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর।"

ক্রমে গৌর নিতাই যোগ দিলে মুকুন্দ দত্ত এই পদ গাইতে লাগিলেন :—

"হাহা প্রাণপ্রিয় সখি! কিনা হৈল মোরে।
কানুপ্রেম বিষে মোর তনুমন জরে।
রাত্রিদিন পোড়ে মন সোয়াস্থ্য না পাও;
যাঁহা গেলে কানু পাও তাঁহা উড়ি যাও।"

ক্রমে গৌরের ভাবাবেগ উথলিয়া উঠিল, এবং "বোল বোল" বলিয়া এক প্রহব কাল উদ্দণ্ড নৃত্য করিলেন। অত্যন্ত পরিশ্রম দেখিয়া ভক্তগণ কীর্ত্তন থামাইয়া তাঁহার সুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। গৌরচন্দ্র যখন ভাবাবেশে সংকীর্ত্তন মাঝে আছাড় খাইতে লাগিলেন, তখন শচী দেবী ইষ্ট দেবতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেব নারায়ণ! আমি বাল্যকাল হইতে তোমার সেবা করিয়া আসিতেছি, এখন এই আশীর্ব্বাদ চাই, যেন নিমাই পড়িলে তার অঙ্গে ব্যাথা না লাগে।"

পব দিন প্রাতঃকালে শচী দেবী আচার্য্যকে বলিলেন যে, আমি আর নিমাইয়েব দেখা কোথায পাইব, যে কয় দিন এখানে থাকেন, আমি স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাওয়াইতে চাই। আচার্য্য শচীর কথার মর্ম্ম বুঝিয়া তাহাতেই সম্মত হইলেন, সেই দিন হইতে দেবী শচী স্বহস্তে পাক করিয়া বৈষ্ণব গণেব সহিত পুত্রকে ভোজন করাইতে লাগিলেন। প্রাতে বন্ধুদিগের সহিত প্রেমালাপ, মধ্যাহ্নে সকলে একত্র ভোজন এবং স্বায়াহ্নে বহুজনতার মধ্যে নৃত্য কীর্ত্তনে গৌরের দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। শচী মাতার স্নেহে, অদ্বৈতের যত্ন ও অনুরোধে এবং ধর্ম্মবন্ধুদিগের প্রেমের খাতিরে এক দুই করিয়া ক্রমে দশ দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। গৌরের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইলে যেমন বিবেকের তাড়নায় আত্মগ্লানি হয়, তেমনি তিনি

অশান্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। একাদশ দিনের প্রাতঃকালে গৌরচন্দ্র সমবেত আত্মীয় ও মাতৃ সন্নিধানে বলিতে লাগিলেন, "মা! তোমার মত মা আমি যেন জন্ম জন্মান্তরে পাই, তোমার প্রেমে আমি চিরবদ্ধ। প্রাণের বন্ধুগণ! তোমরা আমার চিরসঙ্গী, প্রাণ ছাড়া যায়, তবু তোমাদের ছাড়া যায় না। আমি যদিও সহসা সন্ন্যাস করিয়াছি, কিন্তু তা বলে কি তোমাদের ছাড়িতে পারি? এই দেখ, নীলাচল চন্দ্র দেখিতে যাইতেছিলাম, তোমাদের স্নেহই আমাকে নিবর্ত্তিত করিয়া এখানে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছে। কিন্তু দেখ, সন্ন্যাস করিয়া আত্মীয় স্বজন লইয়া নিজ জন্মস্থানে থাকিলে কি সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নষ্ট হয় না? লোকে এই সব কথা বলে কি নিন্দা কুৎসা রটাইতে ত্রুটি করিবে? তোমরা প্রাণের বন্ধু, যাহাতে দুই দিক্ বজায় থাকে, তাহা কর।"

কেহ কোন কথা না বলিতে শচী দে' ধৈর্য্য সহকারে বলিয়া উঠিলেন, "বা' নিমাই! তুই যদি ঘরে থাকিস্, তবেই আমার সুখ। কিন্তু তোর সন্ন্যাস ধর্ম্মের হানি হইলে ও নিন্দা রটিলে আমার কষ্টের পরিসীমা থাকিবে না। বাপ রে, যাহাতে তোর সংবাদ মাঝে মাঝে পাই ও কখন কখন সাক্ষাৎ পাই, এমন কোন স্থানে থাকিলে সকল দিক্ রক্ষা হয়। নীলাচলে যাবি মনে করেছিস্, সেই বেশ যায়গা। লোক যাতায়াতে সংবাদ পাইব, অথবা শ্রীবাসাদিও মাঝে মাঝে যাইতে পারিবেন, কিম্বা গঙ্গা স্নান উপলক্ষে তুইও কখন কখন আসিয়া দেখা দিয়ে যেতে পারবি। আমি বলি, সেই খানেই তোর বাস নির্দ্দিষ্ট হউক।" এই বলিয়া শচী দেবী অবিরল অশ্রু ফেলিতে লাগিলেন।

গৌরচন্দ্র বুদ্ধিমতী মাতার সারগর্ভ কথা শুনিয়া মনে মনে তাঁহার ভূয়সী প্রসংশা করিয়া প্রকাশ্যে কহিলেন, "মা! তবে এখন বিদায় দিন্, সময়ান্তে আমার দেখা হইবে।" অদ্বৈত প্রভৃতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বন্ধুগণ! তবে এখন বিদায় হই, তোমরা স্ব স্ব গৃহে গমন করিয়া হরি সংকীর্ত্তন কর গে; আমার সঙ্গে পুনরায় দেখা হইবে। কখন্ আমি গঙ্গাস্নানে আসিব, কখন বা তোমরা নীলাদ্রি যাইবে।"

ভক্তগণের মধ্যে হরিদাস কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিলেন, "তুমি তো নীলা চলে যাইবে, আমার গতি কি হইবে? আমার ... চল চন্দ্র দর্শনের অধিকার ... বিরহে আমি কিরূপে ...

... স্তব করিলেন, "হরি ...। তোমার ক্রন্দনে ... আমি বড় ব্যাকুল হইলাম। আমি তোমার জন্য জগন্নাথের নিকট প্রার্থনা করিয়া তোমাকে নীলাচলে লইয়া যাইব।"

অদ্বৈতাচার্য্য শ্রীচৈতন্যকে অভীপ্সিত বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া আরও কিছুদিন রাখিবার উদ্দেশ্যে বলিতে লাগিলেন, "তোমার যখন যাইবার ইচ্ছা হইয়াছে, কাহার সাধ্য প্রতিনিবৃত্ত করিবে? কিন্তু সময় অতি দুর্ঘট; রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইতেছে; পথে দস্যুগণ ফিরিতেছে; অরাজকতা উপস্থিত। সে জন্য বলি, যে পর্য্যন্ত এই উৎপাতটা মিটিয়া না যায়, সে পর্য্যন্ত এখানে থাকিলে হয় না কি?"

"তথাপিও হইয়াছে দুর্ঘট সময় ;
সে রাজ্যে এখন কেহ পথ নাহি পায়।
দুই রাজে হইয়াছে অত্যন্ত বিবাদ ;
মহা দস্যু স্থানে স্থানে পরম প্রমাদ।
যাবৎ উৎপাত নাহি উপশম হয়,
তাবৎ বিশ্রাম কর যদি চিত্তে লয়।"

চৈঃ ভাঃ।

পাঠক মহাশয়! জানেন এই সময়ে গৌড়ের সুবাদারের সহিত উৎকল রাজের সীমান্ত প্রদেশ লইয়া বিবাদ চলিতেছিল ; এ ১৪৩৩ অর্থাৎ ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দের কথা। যাহা হউক, অনুরাগী ভক্ত এ বাধার কি পশ্চাৎপদ হন? শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন, "যতই কেন উৎপাত হউক না ; আমি অবশ্যই যাইব।"

অদ্বৈত অপ্রতিভ বলিলেন. "তোমার বিঘ্ন কে করি নামে সকল বিঘ্ন দূর হ তোমার হৃদয়ে, তখন গতিরোধ করে?"

শ্রীচৈতন্য আর কিছু না বলিয়া জননীকে প্রদক্ষিণ করত একেবারে যাত্রা করিলেন। নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ, জগদানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ, এই ছয় জন পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার সহিত যাইতে প্রস্তুত ছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা তাঁহার অনুসরণ করিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতে চারিজন মাত্র সঙ্গীর নাম দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর পণ্ডিত ও মুকুন্দ দত্ত। অদ্বৈত কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত কাঁদিতে কাঁদিতে যাত্রীগণের অনুগমন করিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহার হাত ধরিয়া অনুনয় করিয়া কহিলেন, "দেখুন, আপনি ব্যাকুল হইলে সকল দিক্ নষ্ট হইবে। কোথায় আপনি জননীকে প্রবোধ দিবেন ও ভক্তদিগের নেতা হইয়া তাঁহাদের রক্ষা করিবেন ; না আপনি শোকে বিহ্বল হইলেন! প্রতিনিবৃত্ত হউন, ভক্তগোষ্ঠির ভার আপনার উপর।" এই বলিয়া গাঢ় প্রেমালিঙ্গন করিয়া গৌরচন্দ্র অদ্বৈতাচার্য্যকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া সসঙ্গী গঙ্গার ধারে ধারে গমন করিতে লাগিলেন।

এদিকে অদ্বৈত-গৃহে মহা ক্রন্দনের রোল উঠিল। শচীদেবী বজ্রাহতের ন্যায় শায়িতা ; ভক্তদল কাঁদিয়া ব্যাকুল। অদ্বৈত কিছুদিন তাঁহাদের সান্ত্বনা ও শুশ্রূষা করিয়া স্ব স্ব গৃহে পাঠাইয়া দিলেন।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

শ্মশান-বৈরাগ্য।

অমা তামসীর নিবিড় কালিমা
ঘিরিল সকল দিশি।
শন শন করি নিশার সমীরে
লইয়া খেলিছে নিশি।
ঘন ঘোরঘটা ছাইছে গগন
নাহিক তারকা লেশ,
আঁধারের ভয়ে আলোক লইয়া
জোনাকি ছাড়িল দেশ।
মুখ ভার করি যেন রে রজনী
নিরাশ স্বপন হেরে।
চারি দিক হতে নিবিড় কালিমা
অন্তর বাহির ঘেরে।
ধীরে ধীরে ধীরে হরিহরি বলি
মানব কয়েক জন।

শব ভার লয়ে শ্মশানে চলিছে
ভয়েতে আকুল মন।
ধীরে ধীরে ধীরে কলকল করি
তটিনী সাগরে যায়।
অলক্ষ্যে যেমন মানব জীবন
অনন্তের কোলে ধায়।
শোভিছে দুকূলে মাটীর কলসী,
মরার বিছানা রাশি,
আঁধারের কোলে অবাধে চলেছে
নরকপালের হাসি।
এহেন সময়ে হরিহরি বলি
ভূমিতে ফেলিল শব,
পলাইল ভয়ে ফেরু পাল দল
থামিল ঝিল্লীর রব।
সাজাইল চিতা হরিনাম করি
খুলিল শবের মুখ,
আঁধারেও যেন রমণী বদনে
ভাসিছে স্বর্গের সুখ।
কিবা সে গঠন কিবা সে বদন,
মরণ কেবল গালি,
হায় রে রমণী কাহার হৃদয়ে
ঢালিলি শোকের কালি!
আলোক আনিলে শবের নিকটে
যুবার নিঃশ্বাস পড়ে।
ধীরে ধীরে ধীরে দুই ফোঁটা জল
কপোল বহিয়া ঝরে।
বিদেশে যখন শিক্ষার কারণ
ছিলেন যুবক রত,
লিখেছিল বালা এস একবার
দেখি জনমের মত।
মরণের আগে সুধু একবার
নয়নে নয়নে দেখা!
সে-দৃষ্টিতে যেন চিরজীবনের
সকলি রয়েছে লেখা।

যেন এক বালা তাহারি কারণ
সহে নির্ব্বাসন ক্লেশ,
যেন তারই তরে সকল সহিয়া
পরিছে সুখের বেশ।
যেন, যার হাতে জীবন মরণ
সে কেন নিষ্ঠুর এত;
যায় প্রাণ যায় কি ক্ষতি তাহার
যদি দরশন পেত।

হায় কি মরম ব্যথা,
যাহার কারণ দিল এ জীবন
এমন কণক লতা,
মরণ সময় সে পাষাণময়
সুধাল না কোন কথা!
পিপাসা সময় রোগের জালায়
পেল একটু জল।
[illegible] কোনও ভিষকের
[illegible] হল তল।
[illegible] বাড়িল সে রোগ
[illegible]ান ভার,
[illegible] দাসত্বের হাতে
না হল নিস্তার আর।
রোগেতে মরিত বাঁধিত বাড়িত
খাটিত দাসীর মত,
দিনে তিনবার সিনান করিয়া
বলহে বাঁচিবে কত?

সমাজ, ধিক্ শতবার তোরে,
কেন নারীগণ একঠিন দেশে
জনমি অনলে পোড়ে?
কন্যার জনম শুনি পিতা মাতা
ফেলায় চোখের জল।
বিবাহের তরে অভাগা জনক
ভুঞ্জয়ে পাপের ফল।

চিরদিন বসি যে ধন সঞ্চিল
তাতেও না পেল কুল।
বিবাহের পরে এমনি অকালে
শুকাল স্নেহের ফুল।
কি ভব পতিত এ বঙ্গভাণ্ডারে
কতই বালিকা আছে।
ধনরত্ন দিয়া যার পিতা মাতা
দিবে মৃতদার কাছে।
গেল যার ধন জনম মতন
শুকাল আশার নদী।
হায় কি কারণ দুহিতা রতন
পাঠাও এ দেশে বিধি।

শেল বিঁধিল যুবার মনে,
হায় কি কারণ লইনু রতন
ফেলিতে গভীর বনে।

কেন বান্ধিলাম সে দৃঢ় বন্ধন
কাটিতে আপনি তাহা।
কেন পরিলাম সুন্দর মালিকা
রাখিতে নারিনু যাহা।

বিধি দেও মোরে এই বর,
আর যেন পুন এ পাষাণ হিয়া
ফিরিয়া না যায় ঘর।
আর লইব না প্রেমের বন্ধন
সংসারী হব না আর।
দেশে দেশে দেশে ফিরিয়া ফিরিয়া
বলিব একথা সার।
"যদি কেহ চাও মানব পিশাচ
দেখিতে নয়ন ভরে।
এসে দেখে যাও রমণী ঘাতক
বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে।"

শ্রীপ্যারিশঙ্কর দাস গুপ্ত।

[illegible] কথা।

[illegible]তের পর)

২০৭। অচল [illegible] ছে "মা[illegible] তুমি অচল হইয়া নিরন্তর প্রাণেশ্বরের মঙ্গল চরণ নিত্য কাল পূজা কর। তোমার ভক্তি প্রেম ও বিশ্বাস অচল হইয়া তাঁহারি পবিত্র চরণে তোমায় অচল করুক"।

২০৮। যেমন নদ নদীর ক্ষুদ্র জলরাশি বিশাল সাগরের বৃহত্তর জলরাশিতে মিলিত হইয়া আনন্দ ও স্ফূর্তিতে সমুদ্রতরঙ্গে নৃত্য করিতে থাকে, তেমনি মানবের ক্ষুদ্রতম প্রেম সেই অনন্ত ও অসীম প্রেম সাগরে মিশিয়া কতই আনন্দ স্ফূর্ত্তি ও পবিত্রতা ভোগ করে, "নাহি নাহি অন্ত তাহার"।

২০৯। যেমন অভক্ত জ্যোতির্বেত্তা পাগল বলিয়া অভিহিত হন, তেমনি অভক্ত চিকিৎসক পাগল নামেই যোগ্য হন। চিকিৎসা বিদ্যায়, জ্যোতির্ব্বিদ্যার মত, এতই ব্রহ্ম দর্শন লাভের সম্ভাবনা।

২১০। অনিত্য[illegible] হইতে নিত্যতার উৎপাদন! কি আশ্চর্য্য মঙ্গল ময়ের মঙ্গল সাধন। নদ, নদী, সমুদ্র, পর্ব্বতশেখর, গিরি গুহা, গিরি কানন, তরুরাজী, লতা, পাতা, জলপ্রপাত, পক্ষীর মধুর কলরব প্রভৃতি নৈসর্গিক শোভা ও শব্দ সকলই অনিত্য পদার্থ; কিন্তু তাহারা লইয়া যায়, মানবের মন প্রাণ পুজিতে মঙ্গলময়ের নিত্য পবিত্র চরণ, ও হয় তজ্জন্যই তাহারা নিত্য মঙ্গলোন্নতির কারণ; কি অপরূপ মঙ্গলময়ের মঙ্গল সাধন!

২১১। সময় নষ্ট করা, আর অল্পে অল্পে আত্মঘাতী হওয়া, একই কথা।

২১২। যখন যাহার যেমন সহবাস, তখন তাহার তেমনই গুণলাভ, যতই পবিত্র স্বরূপের সহবাস ভোগ, ততই মানব জীবনের পবিত্রতা লাভ।

২১৩। পবিত্র স্বরূপের সঙ্গ-বিয়োগই পাপ, তাঁহার সঙ্গে যোগই পুণ্য।

২১৪। যেমন দূরস্থিত নীলাম্বর অচল প্রাতঃকালের মেঘাচ্ছন্ন অল্পালোকে মানবের চক্ষু গোচর হয়, ও তরুণ অরুণের কিরণ যতই প্রকাশিত ও উজ্জ্বল হইতে থাকে, ততই সে অদৃশ্য হইয়া মেঘরাশিতে যেন মিলিত হইয়া যায়, সেইরূপ, গুপ্ত পাপ ও অজ্ঞান অপবিত্রতাও মোহের সন্ধ্যালোকে মস্তকোত্তলন করে, ও যতই বিশুদ্ধ জ্ঞানালোক, পবিত্রতা ও প্রেমালোক বৃদ্ধি হয়, ততই সে অদৃশ্য হইয়া অনিত্যতার অন্ধকারে মিলিত হয়।

২১৫। ভক্ত জীবন না হইলে, নানা পার্থিব বিদ্যার উন্নতি সহকারে, অথবা বিস্তৃত শাস্ত্র ও আলোচনা জনিত জ্ঞানালোকে জ্ঞানময়ের প্রকাশ দেখিতে পায় না। ঐ প্রকারে তাঁহার দর্শ[illegible]রা পায়, তাহারা কতই পবিত্র সুখে সুখী হয়, ও অনিত্যতা হইতে নিত্যতাতে বাস করে।

২১৬। যখন প্রাতঃকালের সুখ সমীরণ বহমান হয়, ও তরুণ অরুণের লোহিত ও পীত কিরণে প্রকৃতির হাস্য আস্য হইতে মধু ক্ষরিত হয়, তখন ভক্তের প্রাণে আনন্দময়ের কতই আনন্দের তরঙ্গ উঠিতে থাকে, কিন্তু ক্ষণকাল পরে যাই দিবাকরকে নীলাকাশে মেঘ আচ্ছাদন করে, তাই প্রকৃতির মলিন বেশ দেখিয়া ভক্ত চারিদিকে চাহিয়া প্রকৃতি সতীর এরূপ নীরস বদন হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করে। "প্রাণপতির অদর্শনে কাতরা হইয়াছি," এই উত্তর শুনিয়া ভক্তের প্রাণ আপন হৃদয় দেখিয়া কাঁদিয়া উঠে। বলে, "কোথায় রহিলে প্রাণ নাথ। ফেলিয়া আমায় মোহ পাপের আঁধারে। 'দাও দেখা কাতরে'। বল কে তাঁরে জানে, কোথায় গেলে দর্শন পাব সেই প্রাণের প্রাণে।" প্রকৃতি সতী যেমন প্রাণপতির অদর্শনে শোকাতুরা হয়, ভক্তের প্রাণ তেমন ভক্ত নাথের অদর্শনে শোকাকুল হয়। প্রকৃতির জ্যোতিঃ যেমন সূর্য্য, ভক্ত প্রাণের জ্যোতিঃ তেমন ভক্ত নাথ।

২১৭। যেমন দিনপতির উদয়াস্তে আকাশমণ্ডল লোহিত, পীত নানা বর্ণে রঞ্জিত হইয়া মানবের নয়ন মন আ[illegible] করিতে ভক্তের প্রাণে কতই [illegible] রহিতে থাকে, তেমনই [illegible] [illegible]মন ও বিদায়ে মা[illegible] [illegible]শ নানা শোভা [illegible] প্রাণকে কতই [illegible] । মঙ্গলময়ের কি [illegible]রূপ মঙ্গল বিধান।

২১৮। দিবাকরের অধীনতাতেই চন্দ্রমার কিরণে এত সুধা? পূর্ণ জ্যোতিস্ময়ের সেবায় ভক্তের জীবন না জানি কতই অমৃতময় হয়!

২১৯। দিবাকর সমস্ত দিন করিয়া কর প্রসারণ, যতই অস্তাচলে করিতে থাকে গমন, ততই অচল সকল পাইয়া অবসর, কতই প্রকৃতি নাথের মহিমা কীর্ত্তন করে, যতই তাহারা অচল হইয়া করে তাঁহার গুণ গান, ততই তাহাদিগের শরীর হয় ঘন সুন্দর নীল বরণে শোভন। মানব প্রাণ সেইরূপ দৈনিক কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিয়া বহন,

পূজা করে অবসর কালে প্রাণনাথের মঙ্গল চরণ। যতই সে পূজার গভীরতর আনন্দে হয় মগন, ততই তাঁহার পবিত্রতায় শোভিত হয় তাহার জীবন।

২২০। যাহাতে প্রেমময়ের প্রেমমুখ চ্ছবি আচ্ছাদিত করে, তাহাই পাপ।

২২১। সন্তান দম্পতীর বিশুদ্ধ প্রণ য়ের মধুময় ফলস্বরূপ। এ প্রকার ফল লাভের জন্য জায়াপতির বিশেষ যত্ন সম্ভূত সংযুক্ত পবিত্র জীবনের নিতান্ত প্রয়োজন।

২২২। মানব মনে চিন্তার প্রবাহ নিরন্তর বহিতেছে, উহা কখন পবিত্র, কখন অপ বিত্র আকার ধারণ করে। অপবিত্র স্রোতের বেগ ফিরাইবার জন্য, সদ্বিষয়ের স্মরণ, মনন ও কথন করিবে। তাহা ন অসচ্চিন্তার নিবারণ ও জীবন পবিত্র

২২৩। ... কানন নানা সুন্দর সুগন্ধ ও পুষ্পিত ... মঙ্গলময়ের চরণে তাহার গন্ধ ... সেইরূপ মানব ভ... পুষ্পে শোভিত হইয়া জীবনের সৌরভ ... চরণে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হয়।

২২৪। মূর্ত্তি-উপাসকেরা জগদ্ধাত্রীর পূজা করে ইহারি জন্য যে জগজ্জননীর কৃপায় মানবের পশুভাব দেবভাব দ্বারা পরাভূত হইবে। উপাসক! তুমি এতই তমঃ ও রজঃ গুণের অধীন যে, তোমার সে সাত্বিক ভাবের দিকে দৃষ্টি নাই?

২২৫। যাহার জীবন নিয়ম বদ্ধ নহে, সে ব্যক্তি ধর্ম্মের কঠোর শাসনাধীন হইতে বড়ই অক্ষম।

২২৬। অচলসম হইয়া নিত্য করিবে পূজা মঙ্গলময়ের মঙ্গলচরণ, নতুবা প্রাণনাথ করিবেন না তোমার সেই ভক্তি রসহীন পূজা গ্রহণ।

২২৭। মানব জীবন দ্বিবিধ, নিত্য ও অনিত্য। নিত্য জীবনের ভোগ দ্বার একমাত্র মস্তিষ্ক, ও ভোগ্য একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর। অনিত্য জীবনের ভোগ দ্বার নানা প্রকার ও ভোগ্য বহুবিধ বিষয়। যাহার নিত্য জীবনের একমাত্র মস্তিষ্ক, রুগ্ন ও অপবিত্র তাহার জীবন কীদৃশ দুঃখময়, তাহা সেই সর্ব্বান্তর্যামীই জানেন।।

২২৮। নৈসর্গিক শোভা ও শিল্প কার্য্যের মনোহারিতার প্রভেদ এই যে, প্রথমটি দৃষ্টে মানব প্রাণ সেই শোভনতমের চরণ তলে আকৃষ্ট হয় ও ভোগ করে তাঁহার পবিত্র সহবাসের কতই রসবর্ষণ, আর শেষোক্তটি লইয়া যায় মানবের নয়ন ও মন হীন ক্ষীণ মানুষ শিল্পকারীর নিকট ও দেখায় তাহার সামাজিক বিনয়রূপ আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত গুপ্ত অভিমান।।

২২৯। ব্রহ্মোপাসনা সময়ে অশ্রুপাত না হইলে, আত্মার স্নান হয় না। প্রতিদিন শরীরের স্নানের সঙ্গে সঙ্গে, আত্মার স্নান হইলে, শরীর ও মন সুস্থ ও পবিত্র হয়।

২৩০। ...হ্মোপাসনাকালীন তাঁহার দর্শন জনিত যে স্নিগ্ধতা ও শীতলতা মস্তিষ্কে অনুভূত হয়, তাহা জল সেবনে, সৌগন্ধের ঘ্রাণে অথবা অন্য কোন রূপ পার্থিব-দ্রব্য ব্যবহারে হইতে পারে না। আনন্দময়ের প্রকাশে যে আনন্দ হয়, তাহা তাঁহার রচিত সজীব ও নির্জীব পদার্থে হইবার নয়।

২৩১। এ কি! এই নিশীথ কালে চতুর্দ্দিকে ঘোর অন্ধকার ও নিঃশব্দতা; কিন্তু ঊর্দ্ধে দেখি অসংখ্য জ্যোতির্ম্ময় পুষ্পের বিকাশ, কতই আনন্দ তাহারা করিতেছে

প্রকাশ। নিরন্তর পূজা করিয়া বিশ্বনাথের মঙ্গলময় চরণ তাহারা করিয়াছে এমন সুন্দর উজ্জ্বল বেশ ধারণ। ওরে পাপ অন্ধকারাবৃত আমার মন! প্রাণ ভরিয়া পূজা করিলে প্রাণনাথের পবিত্র চরণ, ঘন অন্ধকারের মধ্যে হইবে তোরও উজ্জ্বল বেশ ভূষণ।

২৩২। কাহার লেখা, বাক্য, মত অথবা চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ প্রমাণ ও প্রয়োজন বিনা কখন নিকৃষ্টভাবের অধীন হইও না। নিকৃষ্টভাবের অধীনতায় জীবন কলঙ্কিত ও হীন হয়। ভ্রান্ত উৎকৃষ্ট ভাবাধীনতা ভ্রান্ত নিকৃষ্ট ভাবাধীনতা অপেক্ষা অনিন্দনীয়।

২৩৩। মানব প্রাণ যথার্থ শোভায় দীপ্তি পায়, যখন শোভনতমের শোভা তাহাতে প্রতিভাত হয়।

২৩৪। মানব জীবন ও যৌবনের শোভা ও সৌরভ হয় সার্থক তখন যখন সে করে তাহা প্রাণনাথের পবিত্র চরণে অর্পণ।

২৩৫। ইচ্ছাপূর্ব্বক রাগ, কাম, অহঙ্কার, ঈর্ষা প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি-উদ্দীপক অসচ্চিন্তাকে মনোমধ্যে স্থান দান করিলে তজ্জনিত দূষিত রক্ত নানা শারীরিক ও মানসিক রোগের কারণ হয়।

২৩৬। হে প্রাণনাথ! আমি যেমন সময় ও খাদ্যের পরিমাণ ধরিয়া চলি, তেমনি কবে বাক্য ও চিন্তার পরিমাণ নিরূপণ করিতে পারিব? নিষ্প্রয়োজনীয় ও অসদ্ভাব উদ্দীপক অথবা প্রকাশক বাক্যের দ্বার একবারে রুদ্ধ করিতে সহায় হও। নিত্য জীবনের চিন্তা ব্যতীত অনিত্য জীবনের চিন্তা যতদূর যখন তোমার আজ্ঞা পালন জন্য আবশ্যক হইবে, তাহাব অধিক যেন আমাব মনে স্থান না পায়। হে পবিত্রস্বরূপ! অসদ্বাক্য ও অসচ্চিন্তা হইতে আমায় সম্যক রূপে উদ্ধার কর।

২৩৭। মানুষ মানুষকে চিনিতে পাবে না। আমরা এতই ভ্রান্তবুদ্ধি ও ভ্রান্তনয়নে পরস্পর পরস্পরকে দেখি! আমি কিম্বা তুমি ঠিক কি, তাহা সেই অভ্রান্ত ও সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ বিনা কাহার সাধ্য নাই জানিবার ও বলিবার? আমি আমাকেই চিনিতে পারি না ত অন্যকে কেমন করিয়া চিনিব?

২৩৮। বৈজ্ঞানিকেরা যাহাকে বলেন, স্বভাবের ক্রিয়া; ভক্ত তাহাকে বলেন, ভক্ত নাথের অথবা প্রাণেশ্বরের ক্রিয়া।

২৩৯। ঔষধমাত্রেই পরম বৈদ্যনাথের দান। সকল ঔষধে মঙ্গলালয়ের মঙ্গল নিহি[illegible] রহিয়াছে। মানব তাহা প্রস্তুত [illegible] করিবার নানা প্রথা না[illegible] অবলম্বন করিয়া [illegible]কোন প্রথার প্রতি [illegible] করিলে নিতান্ত [illegible]তে হয়। ভক্তের [illegible] প্রশস্ত বুদ্ধি ও প্রেমিক হৃদয় এরূপ [illegible] সহ্য করিতে পারে না। কোন একটি বিশেষ ধর্ম্মসম্প্রদায়ে যেমন বদ্ধ হওয়া উচিত নহে, তেমনি কোন এক বিশেষ চিকিৎসা প্রথাতে বদ্ধ হওয়া দূষণীয়। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম যেমন সকল প্রকার প্রচলিত ধর্ম্মের সার, সেইরূপ সকল প্রকার চিকিৎসা প্রথার সারপ্রথা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। কবে যে তাহা হইবে, তাহা সেই পরম জ্ঞানময় বৈদ্যনাথই জানেন।

২৪০। সেই পূর্ণস্বরূপ জগৎ শাসন-কর্ত্তা হইয়া কেবল জগতের অশেষ মঙ্গলের জন্য তাঁহার শাসন কার্য্য সম্পাদন করিতে-

ছেন, আব বলিতেছেন "মানব। তুমি দেশ বিদেশেব বাজা হও, অথবা সমাজপতি বা সভাপতি হও, কিম্বা সভা বিশেষেব অধ্যক্ষ হও, গৃহপতি, পিতা, বা বিদ্যালয়েব শিক্ষক, উপাসনালযেব উপদেষ্টা হও, বা বহু ভৃত্যেব প্রভু বা বহু পবিজনবর্গেব স্বামী হও, যখন যে কোন শাসনকার্য্যভাব গ্রহণ কবিবে, তব শাসনগত, শাসনলক্ষ্য জনগণেব সর্ব্বা ঙ্গীন মঙ্গলেব জন্য, নিববচ্ছিন্ন তাহাদিগেব সর্ব্ববিধ কল্যাণেব জন্য ঐ ভাব বহন কব্রিবে। কদাচ নিজ স্বার্থেব দিকে দৃষ্টি পাত কবিও না। তাহা কবিলে তুমি শ্রীভ্রষ্ট হইবে। স্বার্থ তোমাবে পাপ কলঙ্কে কল ঙ্কিত কবিবে, ও তোমাব ও অন্যেব নানা দুঃখের, অমঙ্গলেব কাবণ হইবে।" ভক্ত এই নীতিব অনুসবণ না কবিলে প্রকৃত ভক্ত ...ই পাবিবে না। এই মহদ্বাক্যেব অনুশা... ...ীয়া কেবল প্রাণনাথেব মঙ্গলাচবণ পূ... ...া, কোন বিশেষ সুখে সুখী হই... ...লব শাসন, বা ইন্দ্রি... ...ব গুরুভাব বহন কবিতে হইবে।

২৪১। পীড়াজনিত শয্যাশায়ী ভ... ব্রাহ্ম সমাজেব প্রধান আচার্য্য মহাশয় বলি লেন, ঈশ্বরের স্বরূপ অনন্ত; মানুষেব জীব নেব গতি অনন্ত।

২৪২। কাঁটা ঝাঁপ ও বঁটি ঝাঁপ। এই দুই ঝাঁপের উদ্দেশ্য বড় উচ্চ। ভক্তগণ মহাদরে সম্মুখে নিজ নিজ স্বার্থপরতাকে বিনষ্ট কবিবে বলিয়া উচ্চ স্থান হইতে কণ্টকোপবি ঝম্প প্রদান কবিল, তাহাতে ঐ অন্তঃ শত্রুব বিনাশ হইল না। তাহাতে তাহাবা পবদিবস অধিকতব উৎসাহ ও অনু বাগেব সহিত আপনাদিগেব উপাস্য দেব তাব আশীর্ব্বাদ চাহিয়া মানবেব ঐ চিব বৈবীকে খণ্ড খণ্ড কবিবে বলিয়া বঁটিব শয্যাব উপব ঝাঁপ দিল।। বাস্তবিক শবীবকে নির্য্যাতন কবিলে অন্তঃ শত্রুবা কিযৎ পবি মাণে কিছু দিনেব জন্য পবাভূত হয বটে। আশ্চর্য্য মঙ্গলময়েব মঙ্গল বিধান।

নিম্নলিখিত তিন সংখ্যা ভুলক্রমে পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই।

১৬৫। শুষ্ক জ্ঞান নিযন্তাকে ছাড়িযা তাঁহাব প্রতিষ্ঠিত নিযমাদি দেখে ও পালন কবে। ভক্তি বসার্দ্র জ্ঞান তাঁহার নিযমাদি পালনেব সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাব দর্শন লাভ কবে।

১৬৬। ব্রহ্মাণ্ডপতি পার্থিব বাজাব মত আমাদিগেব নিকট সম্মান চাহেন না। যিনি পূর্ণস্বভাব, তাঁহাব আবাব তাঁহা কর্ত্তৃক ক্ষুদ্র, সৃষ্ট মনুষ্যেব নিকট সম্মান পাইবার অভিলাষ ।। তিনি চাহেন যে, আমবা তাঁহাব সহবাস ভোগ কবিয়া পবিত্র উন্নত ও সুখী হই। তিনি চাহেন যে, আমবা তাঁহাব আজ্ঞানুগত ও প্রেমাধীন হইয়া তাঁহাব অনুচব ও সহচব হইতে থাকি।

১৬৭। ঈশ্বরেব প্রকৃত ভক্তের কোন রূপ পাপদূষিত মৃত্যু হয না। তিনি তাহাকে সে রূপ মৃত্যু হইতে বক্ষা করেন।

শ্রীকানাই লাল পাইন।

পরিচ্ছদ।

পরিচ্ছদের উদ্দেশ্য কি ? এ প্রশ্ন আমাদের মনে উপস্থিত হইলে তিনটি উত্তর স্বভাবতঃ আমাদের অন্তরে উদিত হয় ; ১ম, শীতোত্তাপ হইতে দেহ রক্ষণোপযোগীতা ; ২য়, লজ্জা নিবারণ ; ৩য়, সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন। পরিচ্ছদ বিবর্ত্তন পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, সৌন্দর্য্যই সর্ব্বাগ্রে মনুষ্যের পরিচ্ছদ ধারণের মৌলিক কারণ। যে সমস্ত অসভ্যজাতি আজও অত্যাবশ্যকীয় বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতে শিখে নাই, শীতোত্তাপে প্রপীড়িত হইতেছে, তাহারাও সৌন্দর্য্যের প্রতি উদাসীন্ নহে, বরং তদ্বিপরীত। তাহারা আপনাদিগকে সুসজ্জিত করিতে যে পরিমাণে ব্যস্ত, বস্ত্রাদি ব্যবহার দ্বারা শীতোত্তাপ নিবারণে সেরূপ যত্নশীল নহে। যখন শীতাদির প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বস্ত্র ব্যবহার দূরে থাক্, পশুচর্ম্মও ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে নাই, তখনই বর্ব্বরজাতীয় পুরুষ রমণীগণ নগ্নদেহ নানা প্রকার রং ও উল্কী দ্বারা চিত্রিত করিত এবং তাহারা এই প্রকার বীভৎস সৌন্দর্য্যের মোহিনীমায়ায় মুগ্ধ ছিল। শীতে কম্পান্বিত কলেবর হইয়াও যাহারা কোনও প্রকার আবরণের আবশ্যকতা অনুভব করিতে সমর্থ হয় নাই, তাহারাই কড়ি, প্রবাল প্রভৃতি গ্রন্থন করিয়া নগ্ন কটীতে বন্ধন করিয়া সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করিত। এ বিষয়ে পণ্ডিতপ্রবর হার্বার্ট স্পেন্সর বলিয়াছেন,—

"It has been truly remarked that, in order of time, decoration precedes dress. Among people who submit to great physical suffering that they may have themselves handsomely tattooed, extremes of temperature are borne with but little attempt at mitigation. Humboldt tells us that an Orinoco Indian, though quite regardless of bodily comfort, will yet labour for a fortnight to purchase pigment wherewith to make himself admired ; and the same woman who would not hesitate to leave her a fragment of cloth not dare to com decor Ind sc l of ... e remember that even among ourselves most think more about the fineness of the fabric than its warmth, and more about the cut than the convenience—when we see that the function is still in great measure subordinated to the appearance—we have further reason for inferring such an origin."

সৌন্দর্য্য স্পৃহা হইতেই পরিচ্ছদের

উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু সৌন্দর্য্য কি? কোন্ বস্তু প্রকৃত অর্থাৎ সর্ব্ববাদীসম্মত সুন্দর? ইহা নির্ণয় করা অসম্ভব। Absolute সুন্দর বলিয়া কিছু আছে কি না জানি না। যাহা এক জনের নিকট অতীব সুন্দর বলিয়া বোধ হয়, তাহাই অন্যের নিকট অত্যন্ত কুৎসিত বলিয়া প্রতিভাত হয়; যাহা একজাতির নিকট সৌন্দর্য্যের আদর্শ বলিয়া গৃহীত হয়, অপর জাতি তাহার বিপরীতকেই আদর্শ সুন্দর বলিয়া গ্রহণ করে। এইরূপে আমরা ব্যক্তিবিশেষ বা জাতিবিশেষের রুচি সমালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, সৌন্দর্য্যের আদর্শ সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনশীল—কোথায়ও এ আদর্শের স্থিরতা নাই। কেবল ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বা জাতিতে জাতিতে এ আদর্শের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় তাহা নহে, কিন্তু একই ... আদর্শ কথনও স্থির থাকে ... পরিবর্ত্তন এই আদর্শ পরি- ... নির্ণয় করা সম্ভব ... tions) ... এই ... ভূষা ... ধ্য ... বস্থার মধ্যে একটি ... সম্বন্ধ দেখিতে পাই। আমরা যাহা ... দিকে দেখিতে পাই এবং যাহার মধ্যে আমরা বাল্যকাল হইতে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছি, তাহাই আমরা সুন্দর বলিয়া মনে করি, এবং যাহা এই প্রচলিত রুচি বিরুদ্ধ তাহাকে আমরা কুৎসিৎ বলিয়া বিবেচনা করি। এই কারণে সকল দেশে ও সকল কালে নব প্রবর্ত্তিত কোন রুচির বিরুদ্ধে লোক সাধারণকে দেখিতে পাওয়া যায়—নবপ্রবর্ত্তিত রুচিসম্পন্ন লোকদিগকে Fashion প্রিয় বাবু, বা তত্তুল্য অন্য কোন নামে অভিহিত হইতে দেখা যায়। এমন কি সকল প্রকার পরিবর্ত্তনের নেতাগণকে সমসাময়িক লোকের নিকট নিন্দিত হইতে দেখা যায়, যেন প্রচলিত যাহা কিছু তাহার পরিবর্ত্তন একটা ভয়ানক দোষাবহ কার্য্য। কিন্তু কাল সহকারে সেই নব প্রবর্ত্তিত রুচি ক্রমে ক্রমে লোক সাধারণের মধ্যে ব্যাপৃত হইতে থাকে। যখন তাহাতে লোক সাধারণের চক্ষু অভ্যস্ত হইয়া আইসে, যখন তাহা ক্রমশঃ অভিনবত্ব হারাইয়া Custom এর মধ্যে পরিগণিত হয়, তখন আবার তাহাই সাধারণ চক্ষে সুন্দর বলিয়া প্রতিভাত হইতে থাকে। তখন আবার সেই প্রতিবাদকারীগণকেই সাদরে তাহাই গ্রহণ করিতে দেখা যায়। এমন কি যদি কালে আবার সেই পূর্ব্বতন রুচি কেহ পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিতে প্রস্তুত হন, তবে সেই পূর্ব্বতন প্রতিবাদকারীগণই যে এবারও প্রতিবাদের হস্ত উত্তোলন করিবেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই শ্রেণীর লোক চিরদিনই অভ্যাসের দাস,—চিরাভ্যস্ত রুচি বিরুদ্ধ কার্য্য তাহাদের নিকট কুৎসিৎ বা ন্যূন পক্ষে "কেমন, কেমন" বলিয়া মনে হইবে। সুতরাং তাহারা যে সকল প্রকার পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে তাহাতে আবার আশ্চর্য্য কি? প্রকৃত উন্নতিশীল ব্যক্তি কখনই সে ভাবে কোনও নব প্রবর্ত্তিত রুচির সমালোচনা করিবেন না। তিনি কেবল তাহাতে মানবের সুবিধা অসুবিধার বিচার করিবেন, সাধারণ বা কোন সম্প্রদায় বিশেষের রুচিসম্মত বা রুচিবিরুদ্ধ বলিয়া তাঁহার নিকট কিছুই যায় আসে না। তিনি

সকল বস্তুরই ব্যবহারোপযোগীতার প্রতি লক্ষ্য স্থাপন করেন এবং তাহা লইযাই বিচার করেন;—সৌন্দর্য্যের ভ্রান্তিজাল তাঁহার বিচার শক্তিকে মলিন করিতে পারে না। প্রকৃত উন্নতিশীল ব্যক্তি স্বীয় আদর্শের অনুসরণ করেন, তাহাই তিনি কার্য্যে পরিণত করিতে যান, বর্ত্তমান তাঁহার আদর্শ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত কি না সে বিবেচনা তাঁহার চিন্তা বা কার্য্যকে নিয়মিত করিতে পারে না,—তিনি ভবিষ্যতের জন্য কার্য্য করেন, ভবিষ্যতই তাঁহার ক্রীড়া রঙ্গভূমি।

সৌন্দর্য্যের ন্যায় লজ্জা নিবারণও বেশ ভূষার একটি উদ্দেশ্য। পরিচ্ছদ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনার পূর্ব্বে লজ্জা সম্বন্ধে দুচারিটি কথা বলাই বিধি। লজ্জা কি? লজ্জার মূল কোথায়? প্রচলিত "লজ্জায় জড়সড়" কথাটিই লজ্জার প্রকৃত স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতেছে। প্রাণের এই সঙ্কুচিত-ভাব বিশেষেরই নাম লজ্জা। ইহার কারণ কি? সৌন্দর্য্যের ন্যায় ইহাও যে একটি অভ্যাসজাত সংস্কার ভিন্ন আর কিছুই নহে ইহা সকল দেশের ও সকল জাতির লজ্জা সম্বন্ধে আদর্শ পর্য্যালোচনা করিলে অনায়া-সেই উপলব্ধি হইবে। এক জাতি যে কার্য্যে লজ্জায় ম্রিয়মান হইবে, অপর জাতি তাহাতে লজ্জার কিছুমাত্র কারণ দেখিতে পায় না। সভ্য জাতিদের মধ্যে তথাপি একটা একতা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বর্ব্বরজাতির সহিত সভ্যজাতির লজ্জার আদর্শ তুলনা করিলে অবাক্ হইতে হয়। যে নগ্নাবস্থা সভ্যজাতি মাত্রেই নিতান্ত লজ্জাকর বলিয়া বিবেচনা করেন, যে সংস্কার সভ্যজাতিদের মধ্যে এতদূর প্রবল হইয়াছে যে, অনেকে লজ্জা রক্ষার জন্য মৃত্যুকেও আলিঙ্গন করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, সেই নগ্নাবস্থাই বর্ব্বরজাতির স্বাভাবিক অবস্থা, তাহাতে তাহাদের লজ্জা হওয়া দূরে থাকুক, অপিচ তাহাদের নগ্নদেহকে বস্ত্র দ্বারা আবৃত করাই তাহারা পরম লজ্জার কারণ বলিয়া বিবেচনা করে। বর্ব্বর জাতির বিবরণ পাঠ করিলে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। বর্ব্বর জাতির কথা পরিত্যাগ করিয়া সভ্যজাতিদের লজ্জার আদর্শ সমালোচনা করিলে অভ্যাসের মোহিনী শক্তি আরও সূক্ষ্মরূপে আমরা বুঝিতে সমর্থ হইব। এক জন ইংরাজ ললনা অনাবৃত পদে কোন পুরুষ সম্মুখে বাহির হওয়া বিষম লজ্জার বিষয় বলিয়া মনে করিবেন বটে, কিন্তু অর্দ্ধ অনাবৃত বক্ষে পরপুরুষের সহিত নৃত্য করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইবেন না। একজন হিন্দু মহিলার নিকট ইহা নিতান্তই বীভৎস বলিয়া বোধ হইবে, এবং ইহা শুনি[illegible]
লজ্জায় মুখ অবনত ক[illegible]
রুচির প্রভাব এ[illegible]
ইংরাজ [illegible]
পরি[illegible]
যা[illegible]
[illegible] রিয়া কোন সান্ধ্য[illegible]
বোধ করেন। যাহা লোক সাধারণের মধ্যে প্রচলিত নাই, যাহা সাধারণ রুচি বিরুদ্ধ, তাহার অনুষ্ঠান করিতে একটু কেমন সঙ্কোচ হয়, একটু "কেমন কেমন" করে, তাহারই নাম লজ্জা, কম বেশী কেবল অবস্থার উপর নির্ভর করে।

সৌন্দর্য্য ও লজ্জার আদর্শ এত পরিবর্ত্তন-শীল হইলেও, ইহার মূল মানবের এত সামান্য একটি বৃত্তির উপর নির্ভর করিলেও

ইহার যে কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই, এরূপ বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। অপিচ লজ্জা ও সৌন্দর্য্য যদি বেশ ভূষার দুটি প্রধান অঙ্গ না হইত, তাহা হইলে অনেক দেশে বৎসরের অধিকাংশ সময়েই পরিচ্ছদের কিছু মাত্র প্রয়োজন হইত না। তবে বেশভূষা সম্বন্ধে সৌন্দর্য্য ও লজ্জার উপযুক্ত সীমা নির্দ্ধারণ করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

শীতোত্তাপ হইতে দেহ রক্ষা, লজ্জা নিবারণ ও সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনই পরিচ্ছদের উদ্দেশ্য। এই তিনটি উদ্দেশ্যের মধ্যে সমগ্রসীভূত সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে পারিলেই আমরা ইহাদের পরস্পরের সীমা দেখিতে পাইব। শীতোত্তাপ হইতে দেহ রক্ষা যে পরিচ্ছদের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্ব প্রথম উদ্দেশ্য, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। প্রকৃতির প্রবল শক্তির তাড়নায় মানব অনেক অসুবিধা সহ্য করিয়াও স্বীয় অঙ্গ আবরণ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে [illegible]হ, সুতরাং ইহার [illegible] নিতান্ত [illegible]ীয় [illegible] প্রস্তুত হইত [illegible] সাধ [illegible] করিয়া স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ [illegible] রাখিত না। এমন সময় লজ্জা আসিয়া প্রকৃতির সাহায্যে উপনীত হইল, লজ্জার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মানুষ স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আবরণ করিতে বাধ্য হইল। যে পরিচ্ছদ ব্যবহার পূর্ব্বে ইচ্ছাধীন ছিল, তাহা এখন অবশ্য প্রতিপাল্য হইয়া উঠিল। মানব সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আবৃত করিতে বাধ্য হইল। মানবের এই লজ্জা বৃত্তির উৎপত্তি স্থান কোথায়, তাহা আমরা আলোচনা করিয়াছি। যদিও চির পরিবর্ত্তনশীল ব্যবহার ও রুচির উপর লজ্জাবৃত্তির কার্য্য প্রধানতঃ নির্ভর করে, যদিও ব্যবহার ও রুচির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে লজ্জার আদর্শ সর্ব্বক্ষণ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তথাপি মানব-সভ্যতার বর্ত্তমান অবস্থা বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, এ আদর্শের আমূল পরিবর্ত্তন অসম্ভব। মানবের সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে মানবান্তরে এমন একটি বৃত্তির বিকাশ হইয়াছে, যাহার সহিত লজ্জাবৃত্তির অতি নিকট সম্বন্ধ, এবং যত দিন না তাহার আমূল উচ্ছেদ হইয়া মানব পুনরায় বর্ব্বরাবস্থায় পরিণত হইতেছে, তত দিন এবৃত্তির একান্ত উচ্ছেদ অসম্ভব। এটি মানবের নৈতিক বৃত্তি। পশু সমাজে স্ত্রী ও পুরুষ যে ভাবে পরস্পরের সঙ্গ কামনা করে, মানবের বর্ব্বরাবস্থায়ও ঠিক সেই ভাবেই পুরুষ রমণী পরস্পরের সহিত মিলিত হইত, পশুভাবই তাহাদের একমাত্র আকর্ষণী ছিল। ক্রমে যখন মানব হৃদয়ে জ্ঞানের প্রভা অল্পে অল্পে প্রতিফলিত হইতে লাগিল, মানব স্বীয় জীবনের উচ্চতর লক্ষ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইল, মানব হৃদয় স্বতঃই স্বীয় লক্ষ্য লাভে উন্মুখ হইয়া পড়িল। পুরুষ রমণী আর কেবল পশুভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া মিশিতে চাহিল না। এই আদর্শের পবিত্র ক্ষেত্রই তাহাদের মিলনের রঙ্গভূমি হইল, পশুভাবের পরিবর্ত্তে এই আদর্শই তাহাদের প্রধান আকর্ষণী হইল। যাহারা মানবহৃদয়ে এ বৃত্তির ক্রম-বিকাশ পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই দেখিতে পাইবেন যে, মানবহৃদয়ে এ আদর্শের মোহিনী শক্তি কত প্রবল। যখন মানব হৃদয়

আদর্শের অপার মহিমা কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিল, তখন একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। ভাবের আবেগে মানব আপনাকে ঘৃণা করিতে লাগিল, পশুবৃত্তির সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইল। এ আদর্শ লাভের প্রবল কামনায় নানা প্রকার অস্বাভাবিক উপায় পর্য্যন্ত অবলম্বন করিতে লাগিল। এই উচ্চতর লক্ষ্যের অনুযায়ী জীবনকে গঠিত করিতে হইলে এক দিকে যেমন আদর্শকে অতি যত্নে হৃদয়ে পোষণ করিতে হইবে, অপর দিকে তেমনই তল্লাভের অন্তরায় গুলিকে সর্ব্বদাই দূরে রাখা প্রয়োজন হইয়া উঠে। এখানেই বস্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজন, এখানেই পুরুষ রমণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুচারুরূপে আবৃত রাখা অবশ্যপ্রতিপাল্য হইয়া পড়ে; স্থান ও ঋতুভেদ আর কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হয় না।

অঙ্গাবরণের আবশ্যকতা প্রতিপাদিত হইল। এখন কি ভাবে অঙ্গাবরণ সুবিধা জনক দেখা যাউক। একখানি সুদীর্ঘ বস্ত্রদ্বারা সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলিকে একত্রে আবৃত করিয়া লজ্জা নিবারণ করা যায় এবং এই রূপে দেহাবরণ করাই লজ্জা নিবারণের সর্ব্বাপেক্ষা সুপ্রশস্ত উপায় বলিয়াও গৃহীত হইতে পারে, কিন্তু এরূপ আচ্ছাদন দ্বারা আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রমুক্ত ক্রিয়া বন্ধ করা হয়, ইহা বোধ হয়, কেহই অস্বীকার করিবেন না। অপর দিকে প্রমুক্ত ক্রিয়া বন্ধ না করিয়াও সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলিকে পৃথক রূপে আবরণ করা যাইতে পারে এবং এরূপ পরিচ্ছদই যে ক্রিয়াশীল মানবজীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন তাহা কোন সুবিবেচক ব্যক্তিই অস্বীকার করিবেন না। ক্রিয়াশীল ইউরোপীয় পুরুষ জাতির পরিচ্ছদই মানবের একান্ত উপযোগী। এখানেও আপত্তিকারীর অভাব নাই। তাঁহারা হয়ত বলিবেন যে, কর্ম্মশীল জীবনের পক্ষে এরূপ পরিচ্ছদ সুবিধাজনক হইলেও, তাহা সকল অবস্থার উপযোগী নহে। মানব জীবনে এরূপ বহুতর দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে যে সময় এরূপ পরিচ্ছদ বিশেষভাবে মানবের অমঙ্গলকারী। জলমগ্ন হইলে বা বস্ত্রে অগ্নি লাগিলে এ পরিচ্ছদ জীবনকে বিশেষ ভাবে সঙ্কটাপন্ন করে। তাঁহাদের মতে এরূপ স্থলে বঙ্গদেশের পরিচ্ছদই অত্যন্ত উপযোগী। বস্তুত ইঁহাদের আপত্তির সারবত্তা আমরা কোন ক্রমেই অস্বীকার করিতে পাবি না। আমরা এরূপ ঘটনার হাত এড়াইবার জন্য দিগম্বব থাকাই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী মনে করি!!

পুরুষজাতির পরিচ্ছদ লইয়া তত আপত্তি নাই। আজ কাল [illegible] আমাদের দেশের [illegible] পোষাকের [illegible] দেশ ভেদে [illegible] হওয়া [illegible] ভারত [illegible] ভারতে ক[illegible] বস্ত্র [illegible] হইতে পারে না। ইউরোপের পরিচ্ছদ ভারতের উপযোগী করিতে হইলে সামান্য একটু পরিবর্ত্তন করিলেই হইবে। সে পরিবর্ত্তন ব্যক্তিগত রুচির উপর নির্ভর করে। এখন দেখা যাউক, স্ত্রীজাতির পরিচ্ছদ কিরূপ হওয়া উচিত। আমাদের (বঙ্গ) দেশের প্রচলিত স্ত্রীজাতির পরিচ্ছদ জীবমাত্রের স্বাভাবিক অবস্থার যে অতি

সন্নিকট তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। আর যদি স্বাভাবিক অবস্থাই মানবের বাঞ্ছনীয় হয়, তাহা হইলে আমাদের দেশীয় স্ত্রী জাতির পরিচ্ছদই যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমাদের গ্রীষ্ম প্রধান দেশ, সুতরাং বৎসরের অধিকাংশ সময়ই আমাদিগের বস্ত্র ব্যবহারের কোন স্বাভাবিক প্রয়োজন নাই, বরং বস্ত্র ব্যবহার অনেক সময় কষ্টদায়ক। তবে একমাত্র লজ্জার খাতিরে আমাদিগকে গ্রীষ্মাতিশয্যের মধ্যেও বস্ত্রব্যবহারের অসহ্য কষ্টও সহ্য করিতে হয়! আমাদের একটু আচ্ছাদনের প্রয়োজন হইয়া উঠে!! আমাদের রমণীরা পুরুষ সমাগম বিহীন অন্তঃপুরে আবদ্ধ, তাহাদিগকে কখনই অন্তঃপুরের বাহিরে আসিতে হয় না, সুতরাং তাঁহারা এক প্রকার লজ্জার হাত হইতে মুক্ত। তবে জীবনের একটি বিশেষ দুর্ঘটনার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই তাহাদের এক ... প্রয়োজন। একটি উদা- ... প্রকৃতি বিশেষরূপে ... তৃণাচ্ছাদিত ... তর ভয়ও ... ভয় ... সুন্দর ... উপায় ... হইয়া থাকে। ... মৃৎ কলসী গৃহের উপরিভাগে সজ্জি... থাকে এবং তাহাতে একটি রজ্জু সংলগ্ন থাকে। যখন গৃহে অগ্নি লাগে, তখন সেই রজ্জু ধরিয়া টানিলেই উক্ত কলসীর জলে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। আমাদের রমণীদের পরিচ্ছদও তদ্রূপ। যদি কখন পুরুষ সম্মুখীন হওয়া রূপ দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়, তবে সেই বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য একখানি বস্ত্র সর্ব্বদাই সঙ্গে রাখা হয়, যে বিপদে পড়িলেই তদ্দ্বারা লজ্জা নিবারণ করা যাইতে পারে। প্রকৃত কথা বলিতে হইলে, সর্ব্বাঙ্গ সুচারুরূপে বস্ত্রাবৃত করা পরিচ্ছদের একটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান উদ্দেশ্য। আমাদের দেশের রমণীরা অন্তঃপুরবদ্ধা। কিন্তু দেশের সৌভাগ্যে এমন দিন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, যখন হিন্দুরমণীদের ভিন্ন রূপ ভবিষ্যত চিন্তা করা আর বাতুলের কার্য্য নহে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এমন এক দিন অবশ্যম্ভাবী, যখন আমাদের রমণীরা আর অন্তঃপুরেই আবদ্ধ থাকিবেন না, তাঁহারাও সুশিক্ষা লাভ করিয়া পুরুষের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন। আমরাও সেই দিনকে লক্ষ্যপথে রাখিয়া রমণীর পরিচ্ছদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

মানব হৃদয় স্বভাবতঃ সৌন্দর্য্যের অনুরাগী। সৌন্দর্য্য মনুষ্যের একটি সুখের দ্বার, যাহাতে সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয়, তাহাই বাঞ্ছনীয়। যিনি মানব জীবনে একটি নূতন সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিলেন, তিনি প্রকৃতই মনুষ্য সমাজের কৃতজ্ঞতার পাত্র। আমরা সৌন্দর্য্যের প্রতিকূল নহি, বরং তাহার অনুরাগী। কিন্তু একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। সৌন্দর্য্য বলিয়া কোন সুদৃঢ়, বাঁধা বাধি জিনিস নাই। সাময়িক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। এক সময়ে আমাদের দেশে সুদীর্ঘকেশ রমণীর ন্যায় পুরুষের মস্তকেরও শোভা বর্দ্ধন করিত। পরে মুসলমানদের প্রভুত্ব কালে তাহাদের দৃষ্টান্তে চুল কিঞ্চিৎ ছোট হইয়া "বাবরী" আকার ধারণ করিল। তখন আপামর সাধারণ সকলেই "বাবরী" চুলের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইল। ৪০।৫০ বৎসর

পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহাই সাধারণের রুচি সঙ্গত ছিল। ক্রমে ইংরাজের দৃষ্টান্তে আমরা চুল একেবারে ছোট করিতে শিখিয়াছি। এখন ইহাই আমাদের নিকট সুন্দর বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সমস্ত সভ্যজগতে অন্ততঃ রমণীদের দীর্ঘ কেশ সৌন্দর্য্যের আকর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। এজন্য প্রকৃতি যাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন নাই, তিনি পরচুলা ব্যবহার করিতেও কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু "কালস্য কুটিলা গতিঃ।" অধুনাতন সুসভ্য ইউরোপ ভূমিতে কোন কোন রমণী কেশচ্ছেদ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এবং এরূপ আশা করা যায়, যখন রমণীরা স্বাস্থ্য ও সুবিধার দিকে অধিকতর মনোযোগী হইবেন, তখন এই প্রথাই লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইবে। সৌন্দর্য্যের আদর্শ সম্বন্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবর্ত্তন এতই অধিক যে, তাহার প্রমাণসংগ্রহ করিবার প্রয়োজন নাই।

ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশের রমণীদের পরিচ্ছদ বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। ইহাদ্বারা পরিচ্ছদের তিনটি লক্ষ্যের মধ্যে একটিও সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয় না। না ইহাতে শীত নিবারণ হয়, না লজ্জা নিবারণ হয়, না সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন হয়। এ পরিচ্ছদ যে আমূল সংস্কৃত হওয়া প্রয়োজন, তাহা বোধ হয় কোন সুবিবেচক ব্যক্তিই অস্বীকার করিবেন না। এখন কি ভাবে পরিবর্ত্তিত হওয়া বিধি, তাহাই বিবেচ্য। ইউরোপীয় রমণীর সেমিজ, পেটিকোট, জ্যাকেট ও হিন্দু রমণীর সাড়ী লইয়া খৃষ্টান ও ব্রাহ্ম মহিলাগণ এক প্রকার নূতন পরিচ্ছদের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার দ্বারা উল্লিখিত তিনটি লক্ষ্য অল্পাধিক পরিমাণে সংসিদ্ধ হইতেছে, কিন্তু তাহাও কখন ভবিষ্যতের পোষাক হইতে পারে না। আমাদের রমণীরা আজও অন্যের উপার্জ্জিত অর্থে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে এখনও জীবন সংগ্রামে পড়িয়া নিজের ভরণ পোষণের জন্য অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে হয় না। এরূপ অবস্থা কখনই স্থায়ী হইতে পারে না। সে দিন বহুদূর নয়, যে দিন রমণীদিগকেও পুরুষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া জীবন সংগ্রামে খাটিতে হইবে। তখন এরূপ পরিচ্ছদে কখনই চলিতে পারিবে না। তবে কি ইউরোপীয় রমণীগণের পরিচ্ছদ অনুকরণ করা বিধি? আমরা ঠিক্ তাহারও পক্ষপাতী নহি। ইউরোপেও স্ত্রীজাতির পরিচ্ছদ সংস্কারের জন্য নানা প্রকার আলোচনা ও আন্দোলন হইতেছে।

মানবদেহই নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের চরম ফল। প্রকৃতির রাজ্যে এতদপেক্ষা সুন্দরতর জিনিস আর কিছুই নাই। পরিচ্ছদ এক দিকে যেমন শীতোত্তাপ ও লজ্জা নিবারণ করিবেক, তেমনই সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করাও পরিচ্ছদের এক[illegible] সুবিধা ও আরামের [illegible] হইবে। পরিচ্ছদ য[illegible] অঙ্গসৌষ্ঠব একেবারে [illegible] তাহা হইলে সৌন্দ[illegible] তদ্ভিন্ন অঙ্গ সং[illegible]দেরও [illegible]তে পারে। [illegible] এরূপ পরিচ্ছদের পক্ষপাতী নহি। [illegible]othing should follow, and [illegible] should not contradict, the [n]atural lines of the body." এই মতই আমাদের নিকট যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। স্বভাব প্রদত্ত দুখানি পা একটি পেটিকোট দ্বারা আবদ্ধ না হইয়া, দুটি স্বতন্ত্র পেটিকোট দ্বারা আবৃত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

তাহা হইলে পরিচ্ছদের কার্য্যকারীতা অধিকতর বাড়িবে। কেবল যে কার্য্যকারীতা বাড়িবে তাহা নহে, ইহা স্বাস্থ্যনীতিরও অনুমোদিত। এজন্য অনেক চিকিৎসক এরূপ পরিচ্ছদের স্বপক্ষে মত দিয়াছেন। ইংলণ্ডে স্ত্রীপরিচ্ছদ সংস্কারের জন্য Rational Dress Society নামক একটি সভা হইয়াছে। এই সভার কোন একটি সভ্য দ্বারা ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে ২৯ মে তারিখের Pall Mall Budget নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে এবিষয়ে একটি সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহাতে স্ত্রীজাতির Duel Skirt (দ্বিপদী পোষাক) র পক্ষে নানা প্রকার যুক্তি দেখান হইয়াছে। ইহা মানুষের দুর্ব্বলতা হইতে পারে, কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে ইহা বড়ই সত্য যে, সে আপনাকে সুন্দর করিতে চায়, নিজের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতে চায়। যতদিন পর্য্যন্ত যৌননির্ব্বাচন প্রণালীর মহা নিয়ম প্রকৃতির অন্তর্গত থাকিবে, তত দিন [illegible] থাকিবে। বৈরাগ্য [illegible] বাদ করিতে পারেন, [illegible]র মৌলিক পাপের [illegible]. কিন্তু তাই বলিয়া [illegible] এবং সৃষ্টি বিনাশ হইৎ [illegible] এ স্পৃ[illegible] লোপ হইবে না। এ স্পৃহার উচ্ছেদ সাধন [illegible]তে যাওয়া বিড়ম্বনা, তবে ইহাকে নিয়[illegible] করা মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য। এ স্পৃহ[illegible] কালে একটি নিয়মানুগত হইয়া প্রকা[illegible] পাইয়া থাকে। ইংলণ্ডের পরিচ্ছদ সংস্কারক সভার সম্পাদক লিখিতেছেন,—In proof of the truth of the theory that undue hiding of one part of the body leads to undue exposure and morbid desire for the display of the other, let it be remembered that when tied back skirts were in fashion, which allowed the outline of the lower limbs to be seen, waists were permitted to grow perceptibly larger, and low-necked dresses went very much out of fashion. (And any one may be convinced of the truth of this statement by referring to the pictures in Punch of that time). But now that inflated and crinoleted skirts have come in again, waist pinching has once more become the fashion, and with it exposed neck, shoulders and arms. When men took to wearing a long petticoaty style of coat it was whispered that some of them took to wearing stays also. The Highlander who attired himself in a short petticoat called a kilt also compensates himself by showing a bare leg." আমাদের দেশের রমণীরা যে নিতান্ত পাতলা কাপড়ের পক্ষপাতী, তাহাতেও ইহার সত্যতা প্রমাণিত হইতেছে।

যেমন অত্যন্ত কসিয়া কাপড় পরিলে শরীরাভ্যন্তরস্থিত যন্ত্রাদির বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। তেমনই কোমর হইতে বেশী ভারি কাপড় পরিলেও বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। Rational Dress Society যে পরিচ্ছদ উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাতে সে অভাব দূরীভূত হইয়াছে। এবিষয়েও উক্ত

সভার সম্পাদক লিখিতেছেন, "We maintain that we have devised a dress by which no internal organ can be injured, no muscle cramped, no movement of the body impeded, and to which the wearer may add as much grace and beauty as her own taste may dictate."

আমরা এস্থলে এই সভার অনুমোদিত পরিচ্ছদের একটি চিত্র সংযোজিত করিয়া দিলাম।

আমাদের দেশে রমণীদের পক্ষে পা জামা পরা সম্পূর্ণ নূতন নহে। পা জামা পরিলে যে রমণীদের সৌন্দর্য্য হ্রাস হইবে, ইহা নিতান্ত ভ্রান্ত মত। পশ্চিমের উচ্চ বংশীয় মুসলমান রমণীরাও পাজামা পরিয়া থাকেন এবং সৌন্দর্য্যবোধ সম্বন্ধে মুসলমান জাতি কাহারও অপেক্ষা হীন নহেন, ইহা বলিতে অধিক সাহসিকতার প্রয়োজন হয় না। পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের নানা স্থানে রমণীরা সচরাচর পা জামাই পরিয়া থাকেন এবং তাহাতে তাঁহাদের সৌন্দর্য্য হ্রাস হয় না।

পরিচ্ছদ সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য, এক প্রকার শেষ হইল। ইহার জন্য যে আমাদিগকে অনেক বিদ্রূপের পাত্র হইতে হইবে, তাহাও জানি। তবে ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, মানুষের আরাম ও সুবিধা লক্ষ্য করিয়া, পরিচ্ছদের উপযোগিতা সম্বন্ধে যাহা আমাদের নিকট যুক্তিযুক্ত বোধ হইল, তাহাই বলিলাম। যাঁহারা যুক্তি মার্গানুসরণ করিয়া ইহার প্রতিবাদ করিবেন, তাঁহারা সম্মানার্হ প্রতিদ্বন্দ্বী, তাঁহাদের যুক্তির যথোচিত উত্তর দানে চেষ্টা করিব, না হয় আপনাদের ত্রুটী হইলে তাহা সংশোধন করিব। আমাদের প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত হইলেও যে এখনই সকল রমণী শাড়ী ছাড়িয়া পাজামা পরিবেন, এরূপ আশা আমরা করি না। আমরা সকলেই অভ্যাসের দাস। যাহা কিছু যুক্তিসঙ্গত, তাহাই যে আমরা সর্ব্বদা করিতে পারি, তাহা নহে। কিন্তু কি ভাল, কি মন্দ [illegible] আবশ্যক বিচার করা আবশ্যক [illegible] যুক্তিসঙ্গত বলিয়া [illegible] ক্রমে আমাদের সংস্ক[illegible] যাইবে, এরূপ আশ[illegible] কোন নূতন প্রথা [illegible] অগ্রে মন প্রস্তু[illegible] মন প্রস্তুত হইলে কা[illegible] সহজ হইবে। সেই [illegible] এবিষয়ের প্রস্তাবনা ক[illegible]

শ্রীসীতানাথ নন্দী।

নীতি কথা।

মনুষ্য জীবনের কার্য্য সকল চারি শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়। প্রথম নিজ সম্বন্ধীয়, দ্বিতীয় পারিবারিক, তৃতীয় সামাজিক, চতুর্থ আধ্যাত্মিক।

কি রকম করিয়া উঠিতে, বসিতে, চলিতে ফিরিতে, খাইতে, শুইতে, লইতে ও দিতে হয়, ইহা নিজ সম্বন্ধীয় কার্য্য; ইহা না শিখিলে মানুষ মানুষ বলিয়া গণনীয় হইতে পারে না। তুমি যদি আত্ম কর্ত্তব্য সকল সুচারুরূপে না শিক্ষা কর, সংসারে পদে পদে তোমাকে অপদস্থ হইতে হইবে, তাহাতে কেহ তোমার সহায়তা করিতে পারিবে না। তুমি যদি কাহাকেও অসম্মান সূচক কথা বলিয়া ব্যথিত কর, তাহার ফল ভোগ তোমার নিজেরই করিতে হইবে, পৃথিবী শুদ্ধ লোকে যুঠিয়াও ক্রুদ্ধকে সে রাগ পাত্রান্তরিত করিতে অনুরোধ করিলে সে সম্মত হইবে না। তুমি যদি কাহারও

... কর, তুমিই নিজে ...বে। তোমারই তাহা ... হইবে, দ্রব্যাধিকারী ...ব্যর প্রতিদান চাহিবে ...তরুখাযী না হও, ...ব দিন অপেক্ষা অবশ্যই ... অতি নিদ্রী হও, তোমার কা... ...ষ সংক্ষিপ্ত হইবে। তুমি অব... হও, তজ্জন্য তোমাকেই কষ্ট ...পু হইতে হইবে।

পারিবারিক কর্ত্তব্য শিক্ষা কখনও ...ম্য-নীতি বোধ ব্যতিরেকে হইতে পারে না। সাম্যনীতির মানে ইহা নহে যে, এক পরিবার ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির শুক্ল বা গৌরবর্ণ হইতে হইবে কিম্বা ক্ষুদ্র বা দীর্ঘকায় হইতে হইবে। যে বিষয় তোমার ইচ্ছার অপেক্ষা করে নাই, তাহার অসাম্য ধর্ত্তবের মধ্যে নহে। সাম্যনীতির মানে ইহাও নহে যে, সকলকে ঠিক তুল্য গৃহে বাস করিতে হইবে, তুল্য পাত্রে আহার করিতে হইবে বা তুল্য রকমের কাপড় পরিতে হইবে। ইহার অর্থ এই যে, এক পরিবারের প্রত্যেকেই প্রত্যেকের যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুসারে পরিশ্রম করিবে ও সকলেই শ্রমফল কৃত কর্ম্মের পরিমাণানুসারে নহে, আপনাপন আবশ্যকের পরিমাণানুসারে ভোগ করিবে। নারী নারীর কার্য্য করিবে, পুরুষ পুরুষের কার্য্য করিবে; যদি কেহ তোমার পরিচর্য্যা করে, তুমিও তাহার পরিচর্য্যা করিবে, সে ভক্তিভাবে করিয়া থাকিলে, তুমি স্নেহের ভাবে করিতে বাধ্য। যদি কোন ভাই ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কোন ভাই কেরাণী হয়, কার্য্যস্থলে তাহাদিগের ব্যবসায় গত পরিচ্ছেদাদি পৃথক রকমের হইবে, কিন্তু যখন তাহারা এক পরিবার ভুক্ত ভাই ভাই, তখন কোন পার্থক্য থাকিবে না।

কিন্তু আজকাল পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিবর্ত্তের যে তরঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছে, তাহাতে প্রায়ই দেখা যায়, এক পরিবারভুক্ত ব্যক্তিরা সাম্যনীতি মানিয়া চলিতে পারেন না, এজন্য আমি বিবেচনা করি যে, কোনও দুই জন উপার্জ্জনক্ষম বিবাহিত পুরুষদিগের একান্নভুক্ত থাকা উচিত নহে। সদ্ভাবে পৃথক হইয়া সদ্ব্যবহার দ্বারা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে সমাজের যথেষ্ট

উন্নতি হইতে পারে। হিংসাবৃত্তির পশুভাব আমরা বহুকাল ধরিয়া প্রাণপণে চালাইয়া আসিয়াছি, কিন্তু তাহাতে কেবল আত্মহানি ভিন্ন কখনও কোন শুভ ফল পাই নাই; এজন্য আমি বলি, এক্ষণ উহাতে ইতি দেওয়া যাউক, আইস আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগের আবির্ভাব করি; ইহা করিতে পারিলে ক্রমে ক্রমে আপনা হইতেই সহানুভূতির কাল আসিয়া পড়িবে। আপনারা ইহাতে সম্মত হইবেন কি?

সম্প্রতি একটা প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, স্ত্রীলোকেরা স্বাধীন হইয়া পুরুষেব ন্যায় উপার্জ্জনক্ষম হইবে না কেন? আমি জানি, এ বিষয়ের আপত্তি করিতে হইলে গালি খাইতে হইবে, কিন্তু তথাপি এ মতের পক্ষপাতী হইতে পারিতেছি না, কারণ প্রাচীন কাল হইতে একটা কার্য্য-বিভাগ চলিয়া আসিয়াছে, তাহাতে নারীরা অন্তঃপুরে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইয়া সাংসারিক আভ্যন্তরীণ বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ করিবার অধিকারিনী; পুরুষেরা বহিস্থ সমস্ত কার্য্য সম্পাদনের অধিকারী। নারীদিগকে সুশিক্ষা দেওয়া উচিত, কারণ সুশিক্ষা ব্যতিরেকে মানুষের পশুত্ব দূর হয় না, বিশেষতঃ সুশিক্ষিত পুরুষের ঔরসে অশিক্ষিত নারীর গর্ভে সন্তান জন্মিলে সে সন্তান অংশত মূর্খতা ধাতুদ্বারা গঠিত বলিয়া তাহার পূর্ণ মনুষ্যত্ব হইতে পারে না; আরও বিস্তার করিয়া বলি, শিক্ষিত পুরুষের অরা ১০০ ও তদীয় স্ত্রীর শিক্ষার অরা ০ শূন্য হইলে তাহাদিগের সন্তানের অরা উভয়ের সমষ্টির অর্দ্ধাংশ $\frac{১০০+০}{২}$=৫০ হইতে পারে, কিন্তু পিতা মাতা উভয়ের শিক্ষার অরা ১০০ একশত পরিমাণ হইলে, সন্তানও ১০০ অরা বিশিষ্ট হইবে।

কিন্তু শিক্ষা দেওয়া বিধেয় বলিয়া নারীদিগকে স্বাতন্ত্র্য দেওয়া যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না, কারণ তাহাদিগের প্রকৃতি স্বভাবতঃ কোমল। স্বাতন্ত্র্য দিলে রাক্ষসদিগের মধ্যে তাহারা আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। আরও দেখা যাইতেছে, তাহাদিগের গর্ভ, প্রসবাদি কতকগুলি কঠোর প্রাকৃতিক বাধ্যতা আছে, তাহাতে সময় সময় তাহাদিগের শ্রম-যোগ্যতা থাকে না। প্রচলিত শ্রমবিভাগের নীতিটা ভঙ্গ করিলে সংসার গঠন হয় না। যাহাতে কেবল উপার্জ্জন আছে, রক্ষণ নাই, সে আবার সংসার কিসের? মানব জীবনের অর্দ্ধেক সুখ সাংসারিক সুশৃঙ্খলতার উপর নির্ভর করে; যে মনুষ্যের উত্তম সংসার নাই, সে সন্ন্যাসী। বুনা, বাগ্দী, সাঁওতাল ও অন্যান্য যে সকল জাতিরা স্ত্রীদিগকে আংশিক বা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে অপবিত্রতার পূতিগন্ধ সর্ব্বদাই প্রতীয়মান হয় এবং তাহাদিগের সন্তান গুলিও দুর্ব্বল, কাপুরুষ ও পশু সদৃশ। পাশ্চাত্যেরা নারীদিগকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেন নাই, যে [illegible]
তাহাতেই এই ফল [illegible]
পুরুষেরা এক্ষণ অনে[illegible]
অনিচ্ছুক। এ [illegible]
জিতেন্দ্রিয়তা হইতে [illegible]
ঔদাস্যও কখনও ই[illegible]
বিশেষরূপে জানিয়া [illegible]
স্বেচ্ছাচারিতাই [illegible]
সুরা খাইতে [illegible]
জল আনিয়া [illegible]
দিয়া যদি [illegible]
টুকু [illegible]
[illegible]

এ দেশের মধ্যবর্ত্তীদিগের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে স্ত্রীনীতির কোন ব্যতিক্রম করিলে এই শ্রেণীই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, তাহার কারণ এই যে, মধ্যবর্ত্তীর এক্ষণ সংসার আছে, কেবল নারীদিগের গুণে। অক্ষম অলস পুরুষ ঘরের চালের খড় যোগাইয়া উঠিতে পারেন নাই। বৃষ্টি পড়িয়া মেজে ডোয়া গলিয়া যায়, প্রত্যেক প্রত্যূষে গৃহ-দেবী লেপিয়া তাহার সৌন্দর্য্য রক্ষা করেন, যে দর্শক চালের দিকে চাহিয়া পুরুষটিকে অবজ্ঞা করে, সেই আবার মেজে ডোয়ার দিকে তাকাইয়া পত্নীকে সম্মান না করিয়া পারে না, সুতরাং ইহাতে বাড়ীটের একটু সম্মান রক্ষা হয়, এবং আগস্তুকের বসিবার অশ্রদ্ধা থাকে না।

প্রভুরা ধোপার পয়সা দিয়া কাপড় কাচাইতে পারেন না, অথচ ময়লা কাপড় পরিয়া প্রকাশ্য স্থানে যাইতে যথেষ্ট লজ্জা বোধ করেন, এরূপ স্থলে গৃহলক্ষ্মীরা ক্ষারের দ্বারা কাপড় কাচিয়া স্বামীর সম্মান রক্ষা করেন। রিপু করিবার জন্য দরজীর পয়সা

...না নারীদিগের সাহায্য

...লা, মাকড়সাও নারী-

..., পুরুষগণ তাহাতেও

...লস অপদার্থ হইলে

...অবধি নাই। পুরুষেরা

...মাচ, তরকারী, দুধ,

...থচ মন্দ খাইতেও

...বিরক্ত না হইয়া

...রজী তুলিয়া

...না পরিতোষ

...তিগিকে

সামাজিক ব্যবস্থার গুণে, নারীরা এই সকল অসাধারণ গুণের অধিকারিনী হইয়াছেন; স্বাধীনতা পাইলে তাঁহারা অধিক জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন, একথা আমি অস্বীকার করি না, কিন্তু সে সকল জ্ঞান সুক্ষ্মদৃষ্টিতে ততটা সুখজনক হইবে না, আর সংসার নামে যে একটা সুখের বস্তু পূর্ব্বে উজ্জ্বলভাবে ছিল, বর্ব্বর পুরুষদিগের দোষে নষ্ট হইয়াও নারীদিগের গুণে এক্ষণও যাহার ভগ্নাবশেষ আছে, তাহা একবারে লোপ পাইবে, তখন কাঁদিয়াও পাপের স্রোত ফেরান যাইবে না।

যদি রমণীরা মনে করেন, আমি স্বজাতির (পুরুষদিগের) সুখের পক্ষপাতী হইয়া নারীদিগের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছি, তাহা হইলে আমার প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হইবে, কারণ আমার ইহা অটল বিশ্বাস যে, সংসারটা স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই এজমালী সম্পত্তি, একজন ভিতরে ও একজন বাহিরের ভার না লইলে কদাচ সংসার হইতে পারে না। যদি আমার স্বদেশীদিগের উদ্ভট বুদ্ধিতে এ সংসার ধ্বংস হইয়া যায়, অসুখী কেবল পুরুষেরা হইবে না, নারীরাও হইবেন, এই জন্য আমি ব্যগ্র হইয়াছি।

যে সকল উন্নতমনা পুরুষেরা স্বাধীনতা দিয়া নারীদিগের মনস্তুষ্টি সাধন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা যে, দেশের কি প্রকারের হিতৈষী, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। যে নারীর গৃহ-পারিপাট্যে সুখে কাল কাটাইতেছ, যে নারীর স্বহস্ত-রচিত কাথায় শুইয়া মানুষ হইয়াছ, যে নারীর পাক খাইয়া হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছ, তাহাদিগকে আজ মানুষের হাটে বেচিবার চেষ্টা কেন? যদি মনুষ্যত্ব থাকে, পরিশ্রমী হইতে চেষ্টা কর; যাহাতে

ঘরে জল না পড়ে, ছেড়া কাপড় না পরিতে হয়, নারীর সংগৃহীত শাক খাইয়া না জীবন ধারণ করিতে হয়, তাহার চেষ্টা দেখ। তুমি অক্ষম দরিদ্র বলিয়া তোমার স্ত্রীর মনে যে দুঃখ, তাহা জলন্ত দীপ শিখার ন্যায় তাহার কোমল হৃদয়ে অহর্নিশি জ্বলিতেছে, ভূয়া স্বাধীনতার একটা দিল্লীর লাড্ডু দিলে সে দুঃখ কদাচ অপনীত হইবে না। যদি পুরুষত্ব পদবীর উপযুক্ত হইতে চাও, শ্রমশীল হইয়া নারীর মনোদুঃখের নিরাকরণ কর। ঘরের ভিতরে এরূপ বিস্তর কাজ আছে, যাহার সুচালন ও সুপর্য্যবেক্ষণের দ্বারা নারীরা সমাজে পুজনীয় হইতে পারেন।

যে সকল দুঃখের কথা বলিলাম, ইহা মধ্যবর্ত্তী সাধারণের অবস্থা, যদি সংস্কারক মহোদয়গণ এরূপ অক্ষম দরিদ্র না হন, তাহা হইলে শতকরা হিসাবে তাহারা নগণ্য হইলেও, তাঁহাদিগের নিকটে আমি এই নিবেদন করিতে পারি যে, সমাজ সংস্কারটা একটা ব্যাঙ্গাচি খেলা নহে; যদি শ্রীমতীদিগের প্রতি তাহাদিগের বিশেষ অনুকম্পা হইয়া থাকে, সুশিক্ষা দিউন; সুশিক্ষা সমাপ্ত হইলে সুন্দররূপে সংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে শিক্ষা দিউন। আমাদের সামাজিক আচার ব্যবহারগুলি এরূপ বাতুল বুদ্ধি প্রসূত নহে যে, ইহার যে কোনটী ভাঙ্গিলেই অমনি খরতর বেগে মঙ্গলের স্রোত প্রবাহিত হইবে। আমি বলি, সর্ব্বাগ্রে নিজেরা ভাল হও, তারপর সমাজে হাত দিও। সংস্কার করিতে হইলে প্রথমে লঘু বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, মানুষের সামাজিক কর্ত্তব্য শিক্ষার প্রয়োজন। আত্মকার্য্য শিক্ষার বেলা মানুষকে কতকটা আত্মম্ভরী হইতে হয়, সাংসারিকতায় তাহার অনেকাংশ বিসর্জ্জন দেওয়া আবশ্যক, কিন্তু সামাজিকতা শিক্ষার সময় আত্মকে একেবারে বলিদান দিতে হয়। পরিবারিক সাম্যনীতি অপেক্ষা সামাজিক সাম্যনীতিটা অত্যন্ত উচ্চ ক্ষেত্রের উপর সংস্থাপিত। যে সেই লোকোত্তর সাম্যের উজ্জ্বল ভাব পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছে, সে ক্ষুৎ পিপাসাদি সামান্য দৈহিক অভাব সকলের বশবর্ত্তী থাকিলেও জনসমূহের নিকট দেবতার ন্যায় পূজ্য হইতে সমর্থ। যদি কেহ সম্পূর্ণ অত্মোৎসর্গে না হইয়া কিয়ৎ পরিমাণে হইয়া থাকে, সে সেই পরিমাণে পূজা পাইবার অধিকারী।

মিল প্রভৃতি বিখ্যাত পাশ্চাত্য সমাজ তত্ত্ববিৎদিগের বিবেচনায় ব্যক্তিগত বিষয়ের সহিত সামাজিক বিষয়ের সহিত সংঘর্ষটা একবারে পরিত্যাগ করা উচিত। তাঁহারা বলেন, ব্যক্তিগত বিষয়গুলি পরিমাণে বিপুল ও প্রকৃতিতে জটিল, কিন্তু সমাজ সম্বন্ধে তাহার ইষ্টানিষ্টকারিতা সামান্য, সুতরাং এই সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইলে সমাজের অমূল্য পরিদর্শন শক্তির একটা প্রধান অংশ এই বিষয়ই গ্রাস করিয়া ফেলিবে; কিন্তু যদি ঐ বিষয়গুলিকে ব্যক্তিগত, অ[illegible]
হিতাহিত মূলীভূত ব[illegible]
করা যায়, তাহা হ[illegible]
বিষয় চিন্তার যথেষ্ট [illegible]
রাও ক্রমে ক্রমে দে[illegible]
করিয়া সংশোধিত হইতে

ভাব, একজন [illegible]
করেন; পাশ্চাত্য
ইহাতে হিন্দ [illegible]
নহে, [illegible]

বিসর্জ্জন দিয়া একটী লোককে শত্রু করিতে হইবে, অবশেষে হয়ত বিষয়টি প্রমাণ হইবে না; কিম্বা যদি প্রমাণ হয়, তাহা হইলে সেই লোকটীকে শাস্তি দিতে পার, কিন্তু তাহাকে সমাজের একটা প্রতিশ্রুত বৈরি না করিয়াও পারিবে না এবং দোষ গোপনে চলিবে ভিন্ন তাহাকে একেবারে দোষ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিবে না; কাজেকাজেই এবিষয়ের হস্তক্ষেপে সমাজের শাসন শক্তির অপচয় হয় মাত্র। আবার পক্ষান্তরে ভাব, এক ব্যক্তি একখানা জাল খত প্রস্তুত করিল, ইহা কখনই ব্যক্তিগত দোষ নহে, সামাজিক দোষ, কারণ ইহাতে কার্য্যকারক ব্যক্তি একাকী সংস্পৃষ্ট নহে, অন্য ব্যক্তির ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং ইহাতে সমাজের বিপক্ষ হওয়া আবশ্যক।

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ বলেন যে, এই উদারনীতির অনুসরণ ব্যতিরেকে কোন জাতি উন্নতি লাভ করিতে পারে না, আমিও এই নীতিটা অত্যন্ত সত্য ও সঙ্গত বিবেচনা করি, এজন্য আমার একান্ত ইচ্ছা যে, আমার স্বদেশীয়গণ ক্রমে ক্রমে এই নীতিটা সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করেন। এই নীতিটাকে
... গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ব্যক্তিগত
স্বেচ্ছাচারিতার যে স্বর্গ
সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম
স্বেচ্ছাচারিতা হইতে
লইবার এই এক
ধীনতা সর্ব্বদাই সমাজের
বং স্বেচ্ছাচারিতা অনি-
ব্যক্তিগত স্বাধীন-
... যাইয়া আমরা
...পি, তাহা
...র।

মানুষের ৩ প্রকারের উন্নতির আবশ্যক আছে, যথা—দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক; যে ব্যবহার এই তিনের একতমেরও পরি-পোষক; আমরা নির্ভয়ে তাহার সমর্থন করিতে পারি।

রাজনীতি শিক্ষা, সমাজনীতি শিক্ষার অন্তঃর্গত! যে জনসমাজের সুখ-শান্তির বিষয় পরিগ্রহে পটু, সে নিশ্চয়ই রাজনী-তিজ্ঞ। প্রত্যেক দেশের ও প্রত্যেক জাতির রাজনৈতিক অবস্থা তত্তৎ দেশ বা জাতির সামাজিক অবস্থার অদ্বিতীয় ফলস্বরূপ। তোমার সমাজ যদি নিমগাছ হয়, তাহাতে নিম ফল অবশ্যই ধরিবে, যদি অম্রগাছ হয়, তাহাতে অম্রফল ধরা কেহ রোধ করিতে পারিবে না। পরিশ্রমিতা, সত্যবাদিতা ও সচ্চরিত্রতাই স্বাধীনতার জীবাণু। যে জাতির ব্যক্তি বিশেষের চরিত্রে স্বাধীনতার জীবাণু সকল না লক্ষিত হয়, সে জাতি কখনও স্বাধীন হইতে পারিবে না। যে জাতির অনুপূবক ব্যক্তিরা শ্রমশীল হইতে পারিয়াছে, সত্যবাদী হইতে তাহাদিগের কষ্টবোধ হইবে না; এবং সত্যবাদী হইলে পর, সচ্চরিত্র হইতে আর কোন বাধা থাকিবে না। পরিশ্রমের এরূপ জাজ্বল্য-মান মহিমা আছে যে, তাহার ফল তৎক্ষ-ণাৎ প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়; মানু-ষের যেরূপ ফল-লিপ্সা আছে, সেইরূপ শ্রম লিপ্সা থাকিলে এ জগতে কেহই হাহাকার করিত না। যে মিতাচারী নহে, অর্থাৎ পরিমিত আহার নিদ্রাদিযুক্ত ও জিতেন্দ্রিয় নহে, সে অবিলম্বে রুগ্ন, শীর্ণ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে; সুতরাং পরিশ্রমের প্রয়োজন-বত্তা অবধারণ হইবামাত্র মানুষ পরিমিত হইতে বাধ্য হইয়া থাকে। ক্ষুধা পরিশ্র-

মীর কুটীরে উঁকি দেয়, কিন্তু প্রবেশ করিতে সাহস করে না, কারণ প্রচুরতা সর্ব্বদাই পরিশ্রমের অনুগামী। প্রচুরতা থাকিলে মিথ্যা বলিবার আবশ্যকতা থাকে না, সুতরাং পরিশ্রমী হইতে পারিলে সত্যবাদী হওয়াটা অত্যন্ত সহজ হইয়া পড়ে, আবার সত্যবাদী হইতে পারিলে লোককে বাধ্য হইয়া সচ্চরিত্র হইতে হয়।

একবার উচ্চজাতি ও শ্রমজীবিদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিতে পাইবে, লম্বোদর উপবেশন-বিশারদ ধনীদিগের অপেক্ষা শ্রমজীবী সমাজে সত্য অধিক পরিমাণে বিরাজিত। অলস ধনীর জীবনের অধিকাংশ সময় এরূপ জঘন্য চিন্তায় অতিবাহিত হয় যে, তাহা কোন প্রকারে যদি ব্যক্ত হইত, তাহা হইলে লোকে তাহাদিগের প্রতি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিত। অলস ব্যক্তিরা পরিশ্রমীদিগের ভার্য্যাস্থানীয়; যেমন উপবৃক্ষ সকল মূলবৃক্ষদিগের স্কন্ধে উপবেশন করিয়া তদীয় রসে আত্ম-পোষণ করে, অসল ব্যক্তিরাও সেইরূপ পরিশ্রমীদিগের মস্তকে বসিয়া শ্রমফলভোগ করে, কিন্তু বিনিময়ে কিছুই দেয় না। এজন্য অলস লোক সকল পরিশ্রমীদিগের গলগ্রহ। তাহারা অনর্থক বাঁচিয়া থাকিয়া কেবল পৃথিবীর ভার বাড়াইতেছে, তাহারা মরিলে ভার পাতলা হইয়া যেমন বসুমতী ত্রাণ পাইত, তেমনি কতকগুলি অন্নস্তূপ বাঁচিয়া যাওয়াতে, পরিশ্রমীরা পূর্ণ আহার পাইতে পারিত। যে জাতির মধ্যে পরিশ্রমী লোক অল্প, কিন্তু অলস ভোগদক্ষ লোক অধিক, সে জাতির পতন অনিবার্য্য; সুতরাং যে জাতির উন্নতি করিবার ইচ্ছা হয়, তাহার ব্যক্তিদিগের সর্ব্বাগ্রে আলস্য পরিত্যাগ করিয়া ঘোর পরিশ্রমী হওয়া আবশ্যক। যদি তুমি আমাকে বল, অমুক জাতি অপেক্ষা অমুক জাতি উন্নত, তাহা হইলে আমি তৎক্ষণাৎ বুঝিব যে, প্রথম অপেক্ষা দ্বিতীয় জাতি অধিক পরিশ্রমশীল।

আমবা পবাধীন হইয়াছি আমাদিগের জাতি সাধারণের দুরাচারের দোষে, কিন্তু শ্রেণী বিশেষের দোষের অংশ বিশ্লেষণ কবিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহা শ্রমজীবিদিগের দোষে ঘটে নাই, মধ্যবর্ত্তীদিগেব দোষে ঘটিয়াছে। এদেশের শ্রমফলের লোভে ইংরেজ, ফরাসী উভয়েই আমাদিগের উপকূলে ঘুরিতেছিল, এমত সময়ে এদেশের দ্বারপাল মধ্যবর্ত্তীগণ ধনজনের দ্বারা সাহায্য করিয়া ইংরাজদিগকে প্রবেশ করাইযাছেন। সেই কলঙ্কী মধ্যবর্ত্তীগণ এক্ষণও আলস্যের সাগরে নিমগ্ন। সাঁই সাঁই করিয়া তাস খেলিতেছেন, শ্রম করিবার আবশ্যকতা বোধও নাই, ক্ষেত্রও খুঁজিয়া পান না। আজ কাল শুনিতেছি, কেহ কেহ গবর্ণমেণ্টের নিকট "আমাদিগকে ব্যবহারিক শিল্প শিখাও, আমাদিগকে ব্যবহার শিল্প শিখাও" বলিয়া এক একবার বিকট চীৎকার করিতেছিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই সে চীৎকার অনন্ত আকাশে মিশিয়া যাইতেছে। 'কতদিনে এ পোড়া হাড়ে আত্মগ্লানি জাগিয়া উঠিবে, তাহা কেমন করিয়া বুঝিব?

তুমি পরিশ্রমের ক্ষেত্র খুঁজিয়া পাও না! ঘরের চালে এক লক্ষ মাকড়সার বাসা, থুপথাপ করিয়া গুঁড়া পড়িতেছে, আরসুলায় (তৈলপায়ী) বাক্স, পেটরা বোঝাই, সমস্ত জিনিস নষ্ট করিতেছে; বাড়ীর উঠান, চতুঃপার্শ্ব ঘাসে জঙ্গলে আকীর্ণ, জোঁক সকল পিল পিল করিয়া বেড়াইতেছে

ঘরে বেড়ায় উই ধরিয়াছে, দিবানিশি মচ মচ করিয়া খাইতেছে; ইহাতে তোমার ভ্রুক্ষেপ নাই! শ্রমশীলতা স্বতঃই কাহারও ঘাড়ে চড়িয়া বসে না, উহা অতি কঠোর অভ্যাসের ফল। শরীরকে দৃঢ় ও শ্রম-সহিষ্ণু করিয়া প্রস্তুত করা, জীবনের পক্ষে অত্যন্ত উপকারজনক। একজন পাশ্চাত্য ধর্ম্ম-যাজক বলিয়াছেন "কেবল ভারতবাসীই জগতের একমাত্র জাতি, যে ভ্রমণ অপেক্ষা দণ্ডায়মান থাকা, দণ্ডায়মান থাকা অপেক্ষা উপবেশন করা এবং উপবেশন করা অপেক্ষা শয়ন করা প্রিয়তর মনে করে"। এ অপ-বাদের কি কখনও ক্ষালন হইবে না? আমরা কি ক্রীড়া কৌতুক করিয়া যাত্রার দলের সং সাজিয়া জীবন অতিবাহিত করিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছি? শয়নাশন ও সন্তানোৎপাদন কখনই মনুষ্যের প্রধান কর্ম্ম নহে, ইহার দ্বারা কখনও কোন মনুষ্য গৌরবান্বিত হইতে পারে নাই। কে কত বৎসর বাঁচিয়া থাকে, তাই ধরিয়া জীবনের গুরুত্ব পরিমিত হয় না; কে কতগুলি কার্য্য করিয়াছে, তাহার দ্বারা জীবনের মূল্য অব-ধারিত হয়।

যদি তোমরা এই বিষ্ঠার কীটত্বেই তৃপ্ত, তবে আমার কিছুই বক্তব্য নাই, আর যদি মানুষ হইবার অভিপ্রায় থাকে, তাহা হইলে আমার কিছু বলিবার আছে। পরদিনের কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি পূর্ব্বদিনে শয়নকালে তালিকা দ্বারা স্থির কর; নিদ্রা হইতে প্রত্যূষে উঠিয়া একটী যন্ত্রের ন্যায় একে একে সেই কর্ম্মগুলি সম্পন্ন কর; হাসিয়া খেলিয়া গল্প করিয়া দিন কাটাইও না। স্থিরীকৃত কার্য্য সমাধা করিতে যে বিশুদ্ধ ক্ষুধা উপস্থিত হইবে, তাহাতে আহারে উত্তম রুচি অনুভব করিবে, ভুক্ত বস্তু সুচারু রূপে পরিপাক হইবে এবং রাত্রিকালে নিদ্রায় অসাধারণ তৃপ্তি পাইবে। ইহাতে মনের প্রফুল্লতা, স্বাস্থ্য ও উন্নতি ক্রমে ক্রমে আপনা হইতে হস্তগত হইবে। কার্য্যের তালিকাটা খুব সতর্কতার সহিত প্রস্তুত করিবে, যেন তাহার মধ্যে কোন অনুপযুক্ত বিষয় না প্রবেশ করে।

যে সকল উন্নতিশীল লোকের জ্যোতিতে দশ দিক্ আলোকিত হয়, তাঁহারা সকলেই প্রাতরুত্থায়ী, অক্লান্ত কর্ম্মচারী ও মিতব্যয়ী। ভারতবর্ষে যে অধ্যবসায়ী লোক জন্মে না, একথা মিথ্যা, তবে প্রভেদ এই যে, ইংলণ্ডের অধ্যবসায়ী লোক উপযুক্ত জনসাধারণের শতকরা ৯৯ জন, আর এ দেশের শতকরা ৫ জন। জীবিকার সুলভতাবশতঃ ভারত বাসী এত উপবেশন-লিপ্সু হইয়াছিল, উপবেশনের দ্বারা যাহার জীবিকা নির্ব্বাহ হইত, জনসাধরণেও তাহাকে অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী বলিয়া মান্য করিত, কিন্তু এক্ষণ সে জীবিকার সুলভতা একেবারে তিরোহিত হইয়াছে; তথাপি আমা-দিগের বীরেরা আত্মচিন্তা পরিত্যাগ করিতেছেন না। সাধারণেও অলস অক্ষম-দিগকে উপেক্ষা করিতে শিখে নাই, কিন্তু প্রথম ফল এই দেখা যাইতেছে যে, মধ্যবর্ত্তীদিগের গৃহ দিন দিন শ্রীভ্রষ্ট হই তেছে; ন্যূনাহারে শরীর বলহীন ও তেজো-হীন ও শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে।

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও দাসত্ব এই চারি প্রকারে প্রশস্ত জীবিকা লাভ হইতে পারে। স্কন্ধে হল লইয়া কৃষিকার্য্য করিতে মধ্য-বর্ত্তীকে বলি না; কিন্তু নারিকেল, সুপারি ও আম, কাঁঠালের বাগিচা করিতে যে

কৃষিকার্য্যের আবশ্যক, তাহা তাঁহাদিগের অস্বীকার করাটা কি সঙ্গত?

মধ্যবর্ত্তীদিগের শিল্প-স্কুলে প্রবেশ করা আবশ্যক, কারণ দেখা গিয়াছে, মধ্যবর্ত্তী যে কার্য্যে না প্রবেশ করে, তাহার উন্নতি রুদ্ধ হইয়া থাকে। পাল ও পটুয়াগণ মান্ধাতার আমল হইতে পট চিত্র করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু পরিশেষে মধ্যবর্ত্তীগণ আর্টস্কুলে প্রবেশ করিয়া চিত্র বিদ্যাকে না সংস্কৃত করিলে অদ্যাপি পাল পটুয়ারা সেই শিরাপেশীশূন্য দেবচক্ষু বিশিষ্ট মূর্ত্তি আঁকিতে থাকিত। এজন্য বলি, যদি আমাদিগের কুম্ভকার, কর্ম্মকার ও সূত্রধর প্রভৃতির কার্য্যের সংস্কার করিতে হয়, তবে সে মধ্যবর্ত্তীর দ্বারা ভিন্ন হইবে না। ভাল করিয়া ছুরি, কাঁচি, আলপিন, স্ক্রু গড়িতে গড়িতে ছাতা ও কল কারখানার কার্য্যে পটুতা জন্মিবে। ভারতবর্ষে গত বৎসর পর্য্যন্ত ৯৭টা তুলার কল ও এতদ্ভিন্ন আরও ৩৬টা পাটের কল, ১০টা কাগজের কল ও অন্যান্য কল হইয়াছে; যদি শিল্পশিক্ষায় মধ্যবর্ত্তী প্রবেশ করে, তাহারা এই সকল কলের অনেক কার্য্য করিতে পারিবে এবং ক্রমে ক্রমে কলের প্রস্তুত-কর্ত্তা হইয়া উঠিবে।

বাণিজ্য মধ্যবর্ত্তীদিগের অতি প্রধান অবলম্বন। শ্রমজীবীকে মূলধন দাদন করা, তাহার নিকট হইতে শ্রমজাত দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়া সময়ানুসারে ভোগীদিগের নিকট পৌঁছিয়া দেওয়া পর্য্যন্ত বাণিজ্য ব্যাপারের অন্তঃর্গত কার্য্য, কিন্তু মধ্যবর্ত্তী-দিগের ঔদাসীনতা ও মূর্খতা প্রযুক্ত এ বিষয়ে এক্ষণ অন্য লোক প্রবেশ করিয়াছে। কত যে শ্রমজীবী ও বিদেশী এক্ষণ ব্যবসায়ী হইয়াছে, তাহার অবধি নাই, মধ্যবর্ত্তীর তাহাতে তাপ উত্তাপ নাই, হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিয়াছেন। ইহা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে যে, শ্রমজীবী কখনও মধ্যবর্ত্তী হইবে না, কিম্বা মধ্যবর্ত্তী কখনও শ্রমজীবী হইবে না, কাহারও বিরুদ্ধে কোন জীবি-কার দ্বার অবরুদ্ধ হইতে পারে না। আমি এই বলিতে চাহি যে, আপনাপন শ্রেণীর আত্মত্ব রক্ষার জন্য সকলেই কঠোর চেষ্টা করুক, কেহ যেন অন্যের আলস্যের ও অমনোযোগের ফলভোগ না করিতে পারে।

যৌথ বাণিজ্য (Joint stock company) এদেশে চলিতে পারে না কেন? বাবু আনন্দমোহন বসু তাঁহার ব্যাঙ্কিং কর-পোরেসনের কার্য্য ঠিক সেইরূপ উৎসাহ ধরিয়াছিলেন, যেমন কোন ইউরোপীয় ধনী ধরিয়া থাকেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার চেষ্টা ফাঁসিয়া গেল কেন? ইহার কারণ এই যে, আমরা এক্ষণও এরূপ কার্য্যের যোগ্য হইতে পারি নাই। আমি জানি, আমাদের সমাজের নৈতিক অবস্থা অতিশয় হেয়, কিন্তু তথাপি ইউরোপীয় ব্যবসায়ীগণ পা ছাঁদিয়া, গোরু দুইবার মত করিয়া, আমা-দিগের নিকট হইতে যে ভাবে ভাল কাজ আদায় করিতেছে, কাজ জানিলে আনন্দ-মোহন বাবুও তাহা পারিতেন। শিক্ষিত ও সদুদ্দেশ্যশীল হইলেই কার্য্যসম্পাদিকা শক্তি জন্মে না, তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ। আমার মতে কার্য্যজ্ঞ তস্কর অপেক্ষা কার্য্য মূর্খ সাধু আরও ভয়ঙ্কর। কিন্তু ঐ কার্য্য কেবল আনন্দমোহন বাবুর দোষেই যায় নাই। যাহাদিগের বিবেকের মূল্য এক কড়া কড়ী নহে, এরূপ ঘড়ী, চেন, চস্‌মা-ওয়ালা, ত্যাড়াকাটা বর ছন্তেরা অনুরোধ

উপরোধের নানা প্রকার কৌশলে কত ক্ষুধার্ত্ত চিহ্নিত চোরকে ঐ হতভাগা ব্যাঙ্কের মধ্যে প্রবেশ করাইয়াছিল, তাহার অবধি নাই; শেষে যখন কিস্তী মাত হইল, সব বদ্‌মায়েস দাড়ী ভাসাইয়া 'ছাউথছি ররেলের তামাসা মনে' করিয়া সরিয়া পড়িল।

অতএব দেখা যাইতেছে, এই ব্যাঙ্কের ধ্বংস সাধনে একদিকে ব্যক্তি বিশেষের কার্য্যানভিজ্ঞতা ও অপরদিকে আমাদিগের পাশব দুর্নীতি এক যোগে কার্য্য করিযাছে। দেশের যত যৌথকার্য্য ধরাশায়ী হইয়াছে, ত্যহার প্রত্যেকেরই কারণ এই। দেশ এমনই দুরাচারে আচ্ছন্ন হইযাছে যে, কেহ কুকার্য্য করিতে থাকিলে অন্যে তাহা দেখিয়া চুপ করিয়া থাকে। দোষের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হওয়াকে যাহারা সৌজন্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চাহে, তাহারা মূর্খ। যাহারা দোষের প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করিতে অনিচ্ছুক, তাহারা নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে দোষীর কোন সাহায্যের প্রত্যাশা করে, সুতরাং তাহারা কাপুরুষ; এরূপ লোকের সংখ্যা সমাজে যত কমিবে, ততই দেশ উজ্জ্বল হইবে।

দাসত্ব মূলক জীবনটা এদেশের একান্ত অরদান বিরুদ্ধ। পিতামহেরা উহাকে ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে কুক্কুর বৃত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ইউরোপ বাসীরা যেরূপ শাসনপ্রণালীর অবতারণা করিয়াছেন, (আমি অবশ্যই প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালীর কথা বলিতেছি) তাহাতে দাসত্বে এক্ষণ অনুমাত্রও হেয়তা বিদ্যমান নাই। পূর্ব্বে একজন রাজা (চোদ্দপোয়া মানুষ) শাসনকার্য্য চালাইতেন, তাঁহার অধীনে কার্য্য করিতে হইলে তদীয় স্বেচ্ছাচারিতার অনুবর্ত্তন করিতে হইত, সুতরাং সে দাসত্ব ঘৃণিত গোলামত্ব ছিল, কিন্তু এক্ষণ প্রায় প্রত্যেক সভ্য দেশেই জনসাধারণ দেশের শাসনকর্ত্তা, এক্ষণ দাসত্ব করিতে হইলে প্রজা সাধারণের সুচিন্তাবিহিত নিয়মাবলী অনুসারে চলিতে হয়, সুতরাং এ প্রকারের দাসত্বকে শ্ববৃত্তি বলা বিধেয় নহে, ইহা কর্ম্মচারীত্ব এবং মহত্ত্বে দেবসেবার তুল্য, এজন্য আমার বিবেচনায় জনসাধারণের উপযুক্ত ভৃত্য হইতে পারাটা তুচ্ছ মানবজীবনের পক্ষে অত্যন্ত গৌরবের বিষয়। ভারতবর্ষ যদিও ভারতবাসী সাধারণের দ্বারা শাসিত নহে, তথাপি ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের শাসনপ্রণালীতে এরূপ অনেক বিষয় আছে, যাহা জাতির সম্পূর্ণ অনুমোদিত, অতএব আমার স্বদেশীগণ সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে যে সম্মান করেন, তাহা সর্ব্বথা সুনীতি-সম্মত।

শ্রীগঙ্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

---o---

আমারি কি দোষ?

১

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ?
তুমি যে দিয়েছ দেখা, দাঁড়াইয়া একা একা
হৃদয় দুয়ার দিয়া সহস্র সন্তোষ!
তুমি যে রয়েছ চেয়ে, নিরালা একেলা পেয়ে
ফুটিয়া পদ্মের মত—প্রভাত প্রদোষ!
আমারি কি দোষ খালি? মিছে দেও
গালাগালি—

ঠাকুরাণি! ঠেকাইয়া বৃথা কর রোষ।
আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ?

২

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ?
তুমি যে এলা'য়ে চুল, হেলাইয়া বক ফুল
দাঁড়া'তে নিকটে আসি—বিভল—বেহোস্—
আদরে লইতে আনি, হাতে টেনে হাত থানি;
বলনা কেমনে জানি শেষে আপ্‌শোষ?
আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ?

৩

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ?
তুমি যে লিখিলে ছাই, সে কি আর মনে নাই?
"তোমারি—তোমারি আমি"—কথা দেল্‌-খোস্!
সেত গো ফেলিনি ছিঁড়ে, তোমারে দিয়েছি ফিরে
এখনো পরাণে বাজে নীরব নির্ঘোষ!
আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ?

৪

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ?
তুমি যে চুমিলে ঠোঁটে, আজো শিরা বেয়ে ওঠে
আজিও তেমনি প্রাণ করে পরিতোষ!
তুমি যে দিয়েছ স্পর্শ, শত সুখ শত হর্ষ,
গত আজ চারিবর্ষ ভরা হৃদ্ কোষ!
আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ?

৫

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ?
তুমি যা করেছ—পুণ্য, সব গুলি দোষ শূন্য,
আমার সকলি পাপ—এত কি আক্রোশ?
আগে ত বলনি পাপ, আজ কর অভিশাপ,
দংশিয়া ফণীর মত শেষে ফোঁস ফোঁস্!
আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ?

৬

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ?
এবুদ্ধি কোথায় থু'য়ে, চুমা খে'লে বুকে শু'য়ে?
এখন বিবাদ বটে—তখন আপোষ!
রমণীর মত আর, দেখি নাই জানোয়ার,
কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতী—নাহি মানে পোষ!
আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ?

৭

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ?
আমি ত বাসিতে পারি, তুমি যে—তুমি যে নারী—
তুমিই কি এত দিন আছিলে উপোস্?
আজি বা হয়েছ পর, শত মৃত্যু দূরতর,
গেছে সে উৎকণ্ঠা নয় গেছে কণ্ঠশোষ।
আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ?

৮

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ?
তুমি যে রয়েছ চেয়ে, নিরালা একেলা পেয়ে,
অমন আঁখির ঠারে কার থাকে হোস্!
অমন চাঁদের হাসি, অধরে অমৃত রাশি,
কে না বল বাসে ভাল, কে না পরিতোষ?
গোলাপী দুইটী গালে, কেনা ভোলে? লালে লালে
একত্রে হাসিতে দেখে প্রভাত প্রদোষ!!
আমারি কি দোষ খালি? মিছে দেও গালা গালি,
ঠাকুরাণি! ঠেকাইয়া বৃথা কর রোষ!
আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ?

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গণনা।

ঊনবিংশ শতাব্দী উন্নতির যুগ। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্ম হইয়াছে বলিয়াই কত ব্যক্তির কত অহঙ্কার, কত আনন্দ। যাহা পূর্ব্বে লোকের স্বপ্নেরও অতীত ছিল, যাহার বিষয় আলোচনা করিলে পূর্ব্বে লোক সমাজে হাস্যাস্পদ হইতে হইত, যাহার কল্পনা করিলে লোক বায়ুরোগগ্রস্ত বিবেচনা করিত; স্থূল কথা, যাহা এতদিন অসম্ভব বলিয়া লোকের ধারণা ও প্রতীতি ছিল, তাহা আর এযুগে অসম্ভব নহে। চারিদিকের সর্ব্বশাস্ত্রের সর্ব্ববিদ্যার বিষয় স্মরণ করিলে মানবজাতির পরাক্রম ও অধ্যবসায়ের শক্তিতে বিস্মিত হইতে হয়। আরও অধিকতর বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এই সমুদায় উন্নতি ও আবিষ্কার করিতে বেশী দিন লাগে নাই। কত পুরাতন ও ভ্রমাত্মক সংস্কার সংশোধিত হইয়াছে, কত পুরাতন গণনা পুনর্গণিত হইয়া খাঁটি দাঁড়াইয়াছে; কত অভাবনীয় ব্যাপার সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এসমুদায় ঘটিতে অধিক দিন লাগে নাই। বস্তুতঃ আমারা ঊনবিংশ শতাব্দীর যে গৌরব করি, সেটা সমুদায় শতাব্দীর পক্ষে খাটে না। এখনও ঊনবিংশ শতাব্দী শেষ হইতে দশ বৎসর বাকী। এই দশ বৎসর ছাড়িয়া দিলে দেখা যায় যে, বিগত ৩০।৪০ বৎসরেই অধিকাংশ প্রাকৃতিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই অল্পকাল মধ্যে যেরূপ ভাবে ও যে হারে নব নব তত্ত্ব উদ্ভাবিত হইয়াছে; এবং সেই সেই তত্ত্ব দৈনিক কার্য্যের উপযোগী হইয়া মানবের করতলস্থ হইয়াছে, যদি সেই ভাবে এবং সেই হারে আরও ৩০।৪০ বৎসর কার্য্য চলে, তবে কি যে হইবে, কি যে হইবে না, এখন তাহার আভাষ দেওয়াও নিতান্ত দুরূহ।

যে আবিষ্কার দ্বারা মানবের শারীরিক পরিশ্রমের লাঘব হয়, যদ্দারা তাহার সুখ সচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হয়, তৎসমুদায় জানিতেই সাধারণ লোকের ব্যগ্রতা সমধিক দেখা যায়। মার্কিন দেশীয় এডিসন সাহেব শারীরিক সুখভোগের কত পন্থা বাহির করিয়াছেন যে, তাঁহার নাম করিলেই আনন্দে মন নৃত্য করিয়া উঠে। তিনি এবৎসর কি নূতন আবিষ্কার করিয়াছেন, বা কি নূতন কল বাহির করিয়াছেন, অথবা কি নূতন ব্যাপারে তিনি সম্প্রতি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন; মোট কথা, তিনি মাসে মাসে, দিনে দিনে, কি কার্য্যে লিপ্ত রহিয়াছেন, এরূপ একখানি পঞ্জিকা ক্রয় করিতে বোধ হয়, বিস্তর লোকের আকাঙ্খা। বিলাতের অমুক সাহেব কি করিয়াছেন, অমুক সাহেব যে কল নির্ম্মাণে ব্যস্ত ছিলেন, তাহা কতদূর সম্পন্ন হইয়াছে, প্রভৃতি প্রশ্ন অনেকের মুখে শুনা যায়। বস্তুতঃ এক তাড়িতের ক্রিয়াতেই অধিকাংশ লোকের চক্ষু ঝলসিয়া গিয়াছে। তাহার উপর আবার পদার্থ বিজ্ঞানের ও অন্যান্য রসায়নের কত অসংখ্য অমূল্য সামগ্রী দেখাইবার আছে।

টেলিফোন, টেলিফারেজ, ফনোগ্রাফ, ফটোফোন প্রভৃতি ট ও ফ বর্গের আবিষ্কার সাধারণ লোকের চিত্তকে আকৃষ্ট ও বদ্ধ রাখিয়াছে। 'ভৌতিক'

ব্যাপারে সহজেই লোকের মন আকৃষ্ট হয়। এই সমস্ত প্রধান প্রধান কল নির্ম্মাণে ও প্রাকৃতিক তত্ত্বের কার্য্যোপযোগিতায় উনবিংশ শতাব্দীর খুব গৌরব আছে বটে, কিন্তু গৌরবের বিষয় ইহাতেই পর্য্যবসিত নয়। এই শতাব্দীর শাসনকালে মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ যে সকল গূঢ় সত্যানুসন্ধানে ব্যস্ত রহিয়াছেন এবং যে সকল তত্ত্বের সম্যক্ উপলব্ধির পথে তাঁহারা কিয়ৎপরিমাণে অগ্রসর হইয়াছেন, যে সকল সত্যের বলে ভবিষ্যতের আবিষ্কার সম্ভবপর হইতেছে, এবং সুখসমৃদ্ধির সম্যক পরিণতি ও আরাম উপভোগের উপযোগী কল কারখানার অস্তিত্ব সূচিত হইতেছে, বোধ হয়, সেই সকল তত্ত্বের অনুশীলন ও কথঞ্চিৎ জয় লাভই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ এত গৌরবান্বিত করিয়াছে।

বোধ হয়, দশ বিশ বৎসরের মধ্যে রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞানের রাজ্যের আভ্যন্তরীন পরিদর্শনে বৈজ্ঞানিক জনগণ সমধিক লাভবান হইতেন। বস্তুতঃ অচিন্ত্যনীয় ও অজ্ঞেয় জড়ের প্রকৃতি সম্বন্ধে উক্ত দুই বিজ্ঞানের কিয়ৎপরিমাণে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা। আজকাল পদার্থ বিজ্ঞানে, সূক্ষ্ম পরিমাণের পরাকাষ্ঠা হইয়াছে। স্থান (space) ও কাল পরিমাণার্থ যেরূপ সূক্ষ্ম উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। উহাদিগের গণনা ও পরিমাণ আপাততঃ অবিশ্বাস্য ও প্রলাপ বলিয়া বোধ হইলেও, তৎসমুদায় যে সত্য, তাহাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র কারণ নাই। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলেই এবিষয়টি বুঝা যাইবে। ঈথর * অণুর কম্পনেই আলোক। ঈথরের কম্পন বা পরিদোলনেই নানাবিধ বর্ণবিশিষ্ট আলোকের উৎপত্তি। আলোক-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা নিরূপণ করিয়াছেন যে, বেগুনিয়া বর্ণের আলোক উৎপত্তি কালে সেই অদৃশ্য ঈথর পরমাণুর প্রতি সেকেণ্ডে ৮×১০^{১৪} অর্থাৎ ৮০০০০০০০ ০০০০০০০) টি এবং লাল বর্ণের আলোক উৎপত্তিকালে ৪×১০^{১৪} টি কম্পন হইয়া থাকে। সম্প্রতি বইস্ সাহেব কোয়ার্টজ নামক প্রস্তরের এত সূক্ষ্ম পাত প্রস্তুত করিয়াছেন যে, তাহা এক ইঞ্চিব পঞ্চ সহস্রাংশের একাংশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। অর্থাৎ মাকড়সার সূক্ষ্মতম তন্তু অপেক্ষাও সহস্রাধিকগুণ সূক্ষ্ম। কেবল তাহাই নহে, তিনি পরীক্ষার নিমিত্ত তাহা সুচারুরূপে ব্যবহার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। হুটেষ্টোন ও টেট্ সাহেবদ্বয় কিছু দিন হইল দেখাইয়াছেন যে, আকাশমার্গে যে বিদ্যুৎ দেখা যায়, তাহা এক সেকেণ্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ কাল অপেক্ষাও অল্পকাল স্থায়ী।

বিজ্ঞানের যাবতীয় ক্রিয়া জড়ের উপর সম্পাদিত হয়। সেই জড়েব মূল গঠন আমাদিগের নিকট এখনও অজ্ঞেয় রহিয়াছে। উহার বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান হইলেই যাবতীয় অদ্ভুত ব্যাপার আর বিচিত্র বলিয়া বোধ হইবে না। অতীব প্রাচীন কাল হইতে পণ্ডিত ও ঋষিগণের মন জড়ের তত্ত্বানুসন্ধানে ব্যস্ত দেখা যায়। কনাদ,

* আজ কাল ঈথরকে অনেকে আমাদিগেব আকাশ বলিতেছেন। ঈথর ও আকাশ একই পদার্থ জ্ঞাপক কি না, তাহার প্রমাণ প্রয়োগসহ একটা মীমাংসা হইলে ভাল হয়।

গৌতম প্রভৃতি ইহার বিষয় আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। দিমোক্রিটাস্, এপিকিউরস্ প্রভৃতি দার্শনিকগণ ইহার সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। জড়জগৎ যে অতীব সূক্ষ্ম অণুর সমষ্টিমাত্র, তাহা উক্ত পণ্ডিতগণ ব্যক্ত করিয়া গেলেও, এই মত সমর্থনের সম্পূর্ণ প্রমাণাভাব ছিল। Dalton দাল্তন নামক পণ্ডিত সেই পুরাতন মতকে সমর্থন করিয়া নিজের নামে প্রচার করিয়াছেন। তদবধি খ্যাতনামা বহু রসায়নবেত্তাগণ অসংখ্য পরীক্ষা করিয়া উক্ত মতকে বৈজ্ঞানিক সত্যের সীমায় উপস্থিত করিয়াছেন।

জড়ের আণবিক গঠন, রসায়নবিদ্ পণ্ডিতগণ দৃঢ়রূপে সমর্থন করিবার পর, পদার্থবিজ্ঞানবেত্তারা বহুবিধ পরীক্ষা দ্বারা তদ্বিষয় আরও অগ্রসর হইয়াছেন। কঠিন ও তরল পদার্থের ভিতর দিয়া আলোকের গতি অনুসন্ধানপূর্ব্বক গণিতশাস্ত্রজ্ঞ ফরাসী কচি সাহেব বিবেচনা করেন যে, জড় কখনও সমবস্থ (Homogenous) হইতে পারে না; এবং তিনি বলেন যে, অণুর বিস্তৃতি এক ইঞ্চির চল্লিশ কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র।

ইংলণ্ডে সার উইলিয়ম টমসন অন্য পথ দিয়া জড়ের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি তাড়িত সম্বন্ধে বহুবিধ পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, দস্তা ও তাম্রের এক একটি অণু এক ইঞ্চির সত্তর কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র।

ক্লসিয়ান ও ক্লার্ক ম্যাকসয়েল উক্ত প্রশ্ন অন্যপথ দিয়া মীমাংসা করিতে গিয়াছেন। নানাবিধ অবস্থায় বায়বীয় পদার্থের প্রকৃতি আলোচনা করিয়া বিবেচনা করেন যে, এক একটি অণু এক ইঞ্চির পঞ্চাশ কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র।

অণুদিগের আকৃতি ব্যতীত উহাদিগের মধ্যস্থিত অন্তর কতখানি, তাহার বিষয়ও কিছু জানা গিয়াছে। অণুর আকৃতি ও আণবিক অন্তর বিচার করিয়া পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, সাধারণতঃ এক ঘন ইঞ্চ গ্যাসে ৩×১০^{২০} গুলি (অর্থাৎ তিনের পর কুড়িটি শূন্য) অণু বর্ত্তমান থাকে। বায়বীয় অবস্থায় অণুগুলি সর্ব্বদিকে সকল ভাবে গতিবিশিষ্ট থাকে। সুতরাং তাহাদিগের মধ্যে সর্ব্বদা আঘাত প্রতিঘাত ঘটিতেছে। ম্যাকসয়েল বিবেচনা করেন যে, জলজনক গ্যাসের এক একটি অণু অপর অণুগুলিকে প্রতি সেকেণ্ডে সতের অর্ব্বুদ সত্তর কোটি বার আঘাত করিতেছে। অণুর আকৃতি বুঝাইবার জন্য সার উইলিয়ম টমসন সাহেব একটি বেশ উপমা দিয়াছেন। একটি ফোঁটা বৃষ্টির জলকে পৃথিবীর মত বৃহৎ করিলে, এবং সেই জলের এক একটি অণুও সঙ্গে সঙ্গে তদনুরূপ বৃহৎ করিলে, ঐ অণুগুলি একটি ক্রিকেট খেলাইবার বল অপেক্ষা কিছু ক্ষুদ্র হইবে।

উপরের কয়েক পঙক্তি পাঠ করিয়া হয়ত অনেকে প্রশ্ন করিতে পারেন যে, যে অণু প্রায় অজ্ঞেয় বলিলেই হয়, এবং যাহার বিষয় প্রায় কিছুই বর্ণনা করিয়া উঠা যায় না, তৎসম্বন্ধে আবার মানবগণ স্থির ভাবে কখনও কিছু বিচার ও মীমাংসা করিতে পারে কি? কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এরূপ গণনা অসম্ভবপর নহে। জ্যোতিষেও অনেক গ্রহ ধূমকেতু প্রভৃতির অস্তিত্ব ও গতি, তাহাদিগকে দেখিবার পূর্ব্বেই নিরূপিত হইয়াছে।

পুনশ্চ তাড়িতাকর্ষণ, চুম্বকার্ষণ ও মাধ্যা-

কর্ষণ প্রভৃতির মূল সম্বন্ধে মানবের কোন জ্ঞানই নাই; অথচ উহারা যে নিয়মের বশবর্ত্তী, তৎসমুদায় জ্ঞাত হইয়া মানব সমাজের কত প্রয়োজনীয় কার্য্য সাধন করিয়া লইতেছে।

কিছু দিন হইল বিখ্যাত টমসন সাহেব জড়ের প্রকৃতি সম্বন্ধে এক মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যে ঈথর দ্বারা চরাচর জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, সেই ঈথরের বিশেষ রূপে কুণ্ডলীকৃত আবর্ত্ত ভিন্ন পরমাণু অপর কিছু নহে। ঈথর আমাদিগের অদৃশ্য; সুতরাং আলোক ও তাড়িত প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের যেমন জ্ঞান, জগতের প্রকৃতি সম্বন্ধেও তদ্রূপ জ্ঞান থাকিবে। বিচক্ষণ-পণ্ডিতগণ জড়ের আদি গঠন সম্বন্ধে বহুবিধ মত প্রকাশ করিলেও তাহার একটিও সর্ব্ববাদিসম্মত হয় নাই। মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি সমুদায় যতদিন বুঝিতে পারা যাইতেছে না, তত দিন বোধ হয়, জড়ের প্রকৃতি অজ্ঞাত রহিবে।

প্রকৃতির রাজ্যের গূঢ়তম সত্য সকল আবিষ্কার করিতে বহুবিঘ্ন বিপত্তি থাকিলে বৈজ্ঞানিকগণ পশ্চাৎপদ হইবার নহেন। বরং যাহাতে যত বিঘ্ন, তাহাতেই যেন তাঁহারা তত অদম্য উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে কৃতসংকল্প। কয়েক শতাব্দী অগ্রে কতটুকু জানা ছিল, ও কয়েক বৎসরের মধ্যে কত জানা গিয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে বোধ হয়, তাঁহারা এক দিন না এক দিন প্রকৃতির গুপ্তধন অপহরণ করিতে পারিবেন। বিশ্বস্রষ্টা কীটাণু সদৃশ মনুষ্যকে কত ক্ষমতা দিয়াছেন, কিন্তু সেই শক্তি লইয়াও বিশ্বেরএক কণিকা জানিতে মানব অসমর্থ। বিশ্বরচয়িতার শক্তি অসীম।

শ্রীযোগেশ চন্দ্র রায়।

তত্ত্ব কথা।

(কোরাণ, হাফেজ, মোছ্‌নবী, এবং অন্যান্য গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত)

মহম্মদ বলিয়াছেন,—

১। যে পাপের প্রারম্ভে ভয়, পশ্চাতে ক্ষমা প্রার্থনা, তাহা সাধককে ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী করে। যে তপস্যার প্রারম্ভে নিঃশঙ্কতা ও পশ্চাৎ আত্ম গৌরব, সেই তপস্যা তপস্বীকে ঈশ্বর হইতে দূরে রাখে।

২। যে সাধকের সহিষ্ণুতা ও কৃতজ্ঞতা আছে, সেই ধনী। অহঙ্কারী সাধককে সাধক বলা যায় না; সে অপরাধী।

৩। যে ব্যক্তি জীবনের জন্য জীবনের সঙ্গে সংগ্রাম করেন, তিনি ঈশ্বরের মহিমা বুঝিতে পারেন। যিনি ঈশ্বরের জন্য জীবনের সহিত সংগ্রাম করেন, তিনিই ঈশ্বরকে পাইতে পারেন।

৪। তুমি যদি বিশ্বাসহীন হইয়া স্বর্গস্থ ও পৃথিবীস্থ সাধকগণের উপাসনা প্রণালীর অনুরূপ উপসনা কর, ঈশ্বর তাহা গ্রাহ্য করিবেন না।

৫। তুমি এই তিনটী বিষয় হইতে সর্ব্বদা সাবধান থাকিবে। সুখাদ্য বস্তু ভক্ষণ, উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান এবং ধনী লোকের সহবাস। এই ত্রিবিধ অভ্যাসের বশবর্ত্তী হইলে কেহই সাধক হইতে পারে না। নরক তাহার নিকটবর্ত্তী।

৬। হৃদয়কে হস্তগত রাখিবে। অসদিচ্ছাব বিপরীত কার্য্য করিবে। তাহাহইলে সয়তান (কুপ্রবৃত্তি) তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

৭। উন্নতি অন্বেষণ করিলে তাহা বিনয়ে পাওয়া যাইবে। পুরুষকাব তল্লাস করিলে তাহা সত্যে মিলিবে। গৌরবান্বিত হইতে ইচ্ছা করিলে ঈশ্বর ভয়ে পাইতে পারিবে। যদি মহৎ হইতে চাও, তবে ধৈর্য্যশীল হও। যদি শান্তি অন্বেষণ কবিতে বাসনা থাকে, বৈবাগ্যবান্ হইতে চেষ্টা কর। যদি সম্পদ্ চাও, ঈশ্বরে নির্ভর করিতে শিক্ষা কর।

৮। সেই সর্ব্বশক্তিমান্ মহান্ ঈশ্বরকে প্রতিপালক ও অদ্বিতীয় বলিয়া বিশ্বাস করিয়া তোমার সমস্ত গৌরব তাঁহাতে বিসর্জ্জন দিলে তুমি সাধু হইতে পাবিবে।

৯। যিনি করুণাময়ের করুণার প্রতি বিশ্বাস না করিয়া কেবল ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা নবকাগ্নি হইতে রক্ষা পাইবেন, মনে করেন, তিনি কদাপি নিরাপদ হইতে পারেন না।

১০। সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং বহু সাধু সঙ্গ করিলেই সাধু হওয়া যায় না; আত্ম শাসন চাই। যিনি সেবা ও সহবাসের নীতি শিক্ষা না করেন, নিষিদ্ধ বিষয় হইতে নিবৃত্ত না থাকেন, দুষ্ক্রিয়ার মন্দ ফল জ্ঞাত নহেন এবং ইন্দ্রিয়ের কুহক বুঝিতে না পারেন, তাঁহার অনুসরণ শ্রেয়ঃ নহে! মূল শুদ্ধ না হইলে সেই মূলের প্রকাশ শুদ্ধ হয় কি?

১১। তুমি স্বীয় আত্মাকে শুদ্ধ, ও সত্যে নির্ভর করিবে, তবে সাধু হইতে পারিবে।

১২। যে নিজকেই চিনিতে অক্ষম, সে ঈশ্বরকে কিরূপে চিনিবে?

১৩। তুমি যাহা জান, তাহা ভুলিয়া যাও। যাহা না জান, তাহারাই অন্বেষণ কব, তুমি শুদ্ধ তাঁহাতেই লিপ্ত থাক, তাহা হইলে তোমার আপনাকে এবং তাঁহাকে চিনিতে পারিবে।

১৪। মান, অপমান, অনুগ্রহ, নিগ্রহ, তুল্য মনে না করিলে মানুষের পূর্ণতা হয় না।

১৫। এই কয়েকটী বিষয়কে হৃদয়ের কল্যাণকর জানিবে। ঈশ্বরে দীনতা, ভোগ্য পদার্থে নিস্পৃহা, ধ্যান, বিনয়, তাঁহাব বিচার হইতে ভয়, করুণা হইতে আশা, সংসার হইতে নিবৃত্তি, বিশেষ ভয় বর্ত্তমানে, সাধারণ ভয় ভবিষ্যতে, অন্ন বস্ত্রের জন্য সাধারণ কৃতজ্ঞতা, বিশেষ কৃতজ্ঞতা তত্ত্ব জ্ঞানে। তত্ত্ব জ্ঞান আত্মায় স্ফুরিত হইয়া দিব্য চক্ষু বিকশিত হয়।

হাফেজ বলিয়াছেন—

১৬। যদি তুমি স্বীয় আত্মাকে দর্পণেব ন্যায় পরিষ্কার করিতে ইচ্ছা কর, তবে *তোমার শত্রু শয়তানের (কুপ্রবৃত্তির) প্রদত্ত* যে দশটী বিষয় তোমার আত্মাকে কলুষিত করিয়া আছে, তাহাদিগকে বাহির করিয়া দেও; তবে তুমি ধনী ও সাধু হইতে সমর্থ হইবে। তাহা এই—হিংসা, অহঙ্কার, লোভ, অত্যাচার, আত্মশত্রুতা, পরশত্রুতা, আপনাকে ধার্ম্মিক বলিয়া জ্ঞান, অন্যকে অধার্ম্মিক বলিয়া ঘৃণা, ক্রোধ এবং কাম। যে পর্য্যন্ত না তুমি এগুলি পরিত্যাগ করিতে পারিবে, সে পর্য্যন্ত তোমার মনও মলিন থাকিবে, ঈশ্বরকেও পাইবে না।

মহাপুরুষ মহম্মদ বলিয়াছেন—

১৭। মনের অবস্থা চারি প্রকার—সুস্থ, অলস, রুগ্ন এবং মৃত। যাঁহারা সতত সাধন ভজনায় লিপ্ত থাকেন, সংসারে

থাকিয়াও অনাসক্ত চিত্ত, সুখ দুঃখে যাঁহাদের মনোবিকার জন্মাইতে পারে না, তাঁহাদেরই মন সুস্থ। লোভী ও ঔদরিকদিগের মন অসল। কেননা তাহাদের মন কখনই পার্থিব চিন্তা ছাড়াইতে পারে না। ঈশ্বর আরাধনা তাহাদিগের নিকট আগ্রহের বিষয় নয়। পাপীর মন রুগ্ন। পাপকার্য্য তাহার সতত অভ্যস্ত হইলেও সে সর্ব্বদা ভীত। তাহার মন নিতান্ত দুর্ব্বল। অবিশ্বাসীর মন মৃত। অবিশ্বাসী নিরন্তর সন্দিগ্ধ, তাহার মনের সজীবতা নাই।

১৮। তুমি স্বীয় মনকে সুস্থ রাখিও, তাহা হইলে পরম পিতার প্রিয়পাত্র হইতে পারিবে। তুমি যখন যাহা করিবে, তখন মনে রাখিবে যে, তোমার কার্য্যের প্রতি ঈশ্বরের অনন্ত দৃষ্টি প্রসারিত রহিয়াছে। সৎকার্য্যে সাহস ও অসৎ কার্য্যে ভয় রাখিবে। শ্রবণ, কথন এবং মননাদি প্রত্যেক কার্য্যে স্মরণ রাখিবে যে, সেই অন্তর্যামী তোমার সমস্ত ই জানিতেছেন।

১৯। সাধুতার প্রথমাবস্থাই বিশ্বাস। ঈশ্বর যে অদ্বিতীয়, তাহা তোমার বিশ্বাস ভিত্তিতে সুদৃঢ়রূপে স্থাপিত রাখিও।

২০। যদি তুমি ভগবানের প্রিয়পাত্র হইতে চাও, তবে তাঁহার প্রত্যেক আদেশ শিরোধার্য্য করিবে। তাঁহার ইচ্ছার বিপরীত কার্য্য মনেও আনিও না।

২১। কোরাণে ভগবদুক্তিতে বর্ণিত আছে—যে আমার ইচ্ছার বিপরীতে চলিবে, সে আমার সৃষ্টির বহির্গত হউক। যদি তাহার দ্বিতীয় ঈশ্বর কেহ থাকে, তবে সে তাহারই অনুসন্ধান করুক।

২২। তুমি নিজ প্রভুকে স্মরণ রাখিবে, মনুষ্যকে ছাড়িয়া দেও।

২৩। তোমার যাত্রার সময় উপস্থিত হইতেছে। ঈশ্বর তোমার জন্য চারিটী সুসজ্জিত বাহন রাখিয়াছেন। তুমি তাহাতে আরোহণ করিয়া চলিবে। সম্পদ উপস্থিত হইলে কৃতজ্ঞতার বাহনে, উপাসনার সময় প্রেমের বাহনে, বিপদ সময়ে সহিষ্ণুতার বাহনে এবং পাপ করিলে অনুতাপের বাহনে আরোহণ করিবে। তবে তুমি শ্রেষ্ঠধামে উপস্থিত হইতে পারিবে।

২৪। যদি কেহ তোমার সহিত শত্রুতাচরণ করে, যদি কেহ পরোক্ষে তোমার নিন্দা চর্চ্চা করে, তবে তাহাদিগকে তোমার হিতকারী বলিয়া জানিও। তাহারা উভয়েই তোমার নিকটে স্বর্ণ রোপ্য উপহার পাইবার যোগ্য।

২৫। ভগবানকে প্রীতি মিশ্রিত ভয় করিবে। তাঁহাকে যেমন তোমার পুত্র কলত্রাদি হইতে, এমন কি তোমার প্রাণ হইতে প্রিয়তম মনে করিবে, তেমনি ভয়ানক হইতেও ভয়ানক বস্তু বলিয়া স্মরণ রাখিবে।

২৬। সতর্ক থাকিও, সংসার তোমার পূর্ব্বতন লোকদিগকে যেমন প্রতারণা করিয়াছে, তোমাকেও সেইরূপ প্রতারণা জালে নিক্ষেপ করিয়া বিপদগ্রস্ত করিতে না পারে।

কবি মৌলানা রুম বলিয়াছেন—

২৭। সংসারকে কুলটা স্ত্রীরূপে জানিও। এই কুলটা অবিশ্বাসিনী তোমার পূর্ব্বপুরুষদিগের সহিত আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাদিগকে যেমন বিনষ্ট করিয়াছে, অসাবধান হইলে তোমাকেও সেই রূপ বিনষ্ট করিবে। যে ব্যক্তি এই মায়াবিনীর প্রার্থী, সে ইহাকে বেশ ভূষায় সজ্জিত করে। যিনি বিরাগী, তিনি ইহার কেশ উৎপাটন করিয়া মুখে কালী চুণ প্রদান করেন।

১৮। সংসারাসক্ত ব্যক্তির সংসারে শোক ও চিন্তা, পরলোকে শাস্তি ভোগ।

২৯। যিনি এই স্থির যৌবনার কুহক-মুগ্ধ হইয়া ইহাকে আলিঙ্গন করিতে বাসনা করেন, তাঁহারই অধোগতি। যিনি ঈশ্বর প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষী, তাঁহারই উন্নতি।

৩০। স্থূলদর্শী প্রজ্ঞা বিহীন লোক আপাত মধুর সুখের প্রয়াসী হয়। পরিণাম দর্শী বিবেকবান্ লোক নিত্য সুখের অন্বেষণ করে।

৩১। তুমি ইচ্ছা করিলে সহজেই সংসারকে লাভ করিতে পার, কিন্তু সে তোমাকে ঈশ্বর হইতে অতি দূরে লইয়া যাইবে।

৩২। পৃথিবীতে এই তিন জন বুদ্ধিমান ;—যে সংসারকে ত্যাগ করিয়াছে, যে ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করিয়াছে এবং যে সমাধিস্থ হওয়ার পূর্ব্বে নিজ সমাধিস্থান (গোর) নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছে।

৩৩। যখন তুমি ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ হইবে, তখন জানিতে পারিবে যে, পৃথিবী তোমার সম্পূর্ণ আজ্ঞাকারিণী হইয়াছে।

৩৪। যখন তুমি কেবল সেই অদ্বিতীয় ভগবানকে জগন্ময় দেখিতে পাইবে, তখন তোমার প্রকৃতরূপ ঈশ্বর জ্ঞান লাভ হইবে।

মোহ্ নবীতে উক্ত হইয়াছে—

৩৫। যখন তুমি পার্থিব চিন্তারূপ অগ্নিকে আত্মা রূপ তন্দুরে * জ্বালিতেছ, তখন তুমি কোন অংশেই সেই জ্যোতির্ম্ময় পরম মহান ঈশ্বরের আরাধনা করিতে সক্ষম হইবে না। যখন তুমি সাংসারিক চিন্তায় লিপ্ত হইয়া ইন্দ্রিয়গণকে সুখোপভোগ শিক্ষা দিতেছ, তখন সেই পরম পবিত্র ঈশ্বরকে কখনই চিনিতে বা লাভ করিতে পারিবে না।

৩৬। যখন তোমার চক্ষুকে সুরাপানের পাত্রের ন্যায় করিয়া সুরার ন্যায় চক্ষুর জল বর্ষণ করিবে এবং তোমার আত্মাতে ভগবচ্চিন্তারূপ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাহাতে তোমার অনিত্য দেহের রক্ত মাংসাদি দগ্ধ করিবে, তখন তোমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিবে না। তিনি তোমার আত্মা অধিকার করিয়া বিরাজ করিতে থাকিবেন। ইহা তোমার পক্ষে কঠিন ব্যাপার নহে। যিনি তাঁহাকে পাইতে চেষ্টা করেন, তিনি আপনিই তাহার সহায় হইয়া মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি করেন।

কোরাণে উক্ত আছে—

৩৭। আমি তোমাদিগের পিতা মাতা হইতেও ভাল বাসি। সতত তোমাদেরই নিকটে অবস্থান করি। চেষ্টা করিলেই আমাকে পাইতে পার।

অবাধ্য পুত্রকে পিতা ত্যাগ করিয়া থাকেন। রাজা অপরাধী প্রজাকে নির্ব্বাসন দণ্ড করেন। প্রভু ভৃত্যকে পদচ্যুত করেন। পরম দয়ালু পরমেশ্বর কাহাকেও পরিত্যাগ করেন না। সহস্র অপরাধীকেও তাঁহার ক্রোড়ে স্থান দান করেন। তুমি জড় মাত্র ছিলে, যিনি তোমাকে কৃপা করিয়া জ্ঞান দান করিয়াছেন, যিনি সকল ইন্দ্রিয়কে তোমার সহায় করিয়াছেন, তাঁহাকে কখনই ভুলিও না। তুমি হৃদয়ের সহিত তাঁহাকে ভাল বাসিবে।

৩৮। আমি হৃদয়ের অন্বেষণ করি, কাহারও বাহিক অবস্থা দেখি না। তুমি যদি ঋষিদিগের পরিচ্ছদ পরিলেই ঋষি হইতে

* তন্দুর একরূপ চুলা।

পারিতে, তবে স্ত্রী লোকে পুরুষের পরিচ্ছদ ধারণ করিলেই পুরুষ হইতে পারিত। বাহ্য আকৃতিরই যদি গৌরব হইতে পারে, তবে সুমার্জ্জিত পিত্তলকেও স্বর্ণ বলা যায়।

৩৯। তুমি যদি ঝাউ বৃক্ষ রোপণ করিয়া তাহাতে জলের পরিবর্ত্তে দুগ্ধ ও মধু সিঞ্চন কর, কদাপি তাহার ফল ভোগ করিতে পারিবে না। ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ না করিলে, সুধু সাধু সঙ্গে থাকিয়া কদাপি সাধু হইতে পারিবে না।

৪০। তুমি আত্মাকে দর্পণের ন্যায় পরিষ্কার রাখিবে, তবে তাহাতে ভগবান নিরন্তর প্রতিবিম্বিত থাকিবেন।

৪১। তুমি জ্ঞানের জন্য তাঁহারই নিকট প্রার্থনা করিবে, তবে তুমি জ্ঞানী হইতে পারিবে। যিনি তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়া হৃদয় প্রাপ্ত হন, তিনিই প্রকৃত ধনী।

৪২। তুমি যদি স্বয়ং প্রায়শ্চিত্ত কর, তোমার পাপের শান্তি হইবে না। তোমার অন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হইবে। সেই ভগবানই তোমার প্রায়শ্চিত্ত করাইবেন, এবং তিনিই তাহা গ্রাহ্য করিবেন। তবে তোমার প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

৪৩। পাপকে অগ্নির ন্যায় মনে করিবে, কদাপি তাহাতে হাত দিবে না।

৪৪। তুমি মাটী হইয়া চলিবে, কেন না মাটীর দেহ লইয়াই বাস কর।

৪৫। তুমি দেহ ধারণের পূর্ব্বে যেমন ঈশ্বরের ছিলে, তেমনি তাঁহারই হইয়া থাকিবে।

৪৬। তুমি ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর রাখিবে। জীবিকার জন্য কোন চিন্তা নাই। যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তোমাকে জ্ঞানের অধিকারী করিয়াছেন, তাঁহার কার্য্যে সতত নিযুক্ত থাকিলে তিনিই তোমার নিকটে তোমার জীবিকা উপস্থিত করিবেন।

৪৭। তুমি সর্ব্বদা মনে সন্তোষ রাখিবে। নিজের কর্তৃত্ব ত্যাগ এবং বিপদকে সম্পদ বলিয়া গণ্য করাই সন্তোষ। যিনি এই সন্তোষ ধনের অধিকারী, তিনি সর্ব্বদা প্রফুল্ল চিত্ত।

কোরাণে আয়ুবকে সম্বোধন করিয়া উক্ত হইয়াছে—

৪৮। যে বিপদ্‌কে সম্পদ্ মনে করিয়া সহিষ্ণুতার বাহনে আরোহণ করিবে, আমি তাহাতে ও সে আমাতে। মহাত্মা এব্রাহিম এই উপদেশের সারবত্তা বুঝিয়াছিলেন জন্যই নমরুদের অগ্নিকাণ্ড হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। যিনি দুঃখে অনুদ্বিগ্ন, সুখেও স্পৃহা শূন্য, শত্রুতে তাঁহার কিছুই করিতে পারে না। তিনি নিশ্চয়ই সেই নিত্যধাম লাভ করিতে সমর্থ হন। তুমি এব্রাহিমের ন্যায় সংসারাশক্তি শূন্য এবং ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনে তৎপর হও। এস্‌মাইলের ন্যায় তাঁহাতে আত্ম সমর্পণ শিক্ষা কর। দাউদের ন্যায় পাপের জন্য অনুতাপ, মুষার ন্যায় অনুরাগ অভ্যাস কর। মহম্মদের ন্যায় প্রেমিক হইতে চেষ্টা কর। তবে তোমার সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে; তুমি ভক্ত হইতে পারিবে। পাপ করিলে ঈশ্বর হইতে শাস্তি পাইবার ভয় রাখিও। অবৈধ চিন্তা করিও না। অবৈধ দর্শনে বিরত থাকিও। অসত্য বাক্য শ্রবণ করিও না। নিষিদ্ধ বস্তু গ্রহণ করিও না। নিষিদ্ধ স্থানে গমন করিও না। ঈশ্বরের গুণানুবাদ ভিন্ন অন্য কথা বলিও না। তোমার শ্বাস প্রশ্বাস

যেন তাঁহার নামের সহিত চলাচল করে। যখন তোমাতে এই অভ্যাস বদ্ধমূল হইবে, তখন তোমাকে জিতেন্দ্রিয় বলা যাইবে।

কোরাণে উক্ত আছে—

৪৯। যখন আমার দাস আমার প্রেম লাভ করে, তখন আমিই তাহার কর্ণ হই, সে আমা দ্বারা শ্রবণ করে। আমিই তাহার চক্ষু হই, সে আমাদ্বারা দর্শন করে। আমিই তাহার রসনা হই, সে আমাদ্বারা কথা বলে। আমিই তাহার হস্ত হই, সে আমাদ্বারা গ্রহণ করে। তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় আমারই অনুগত থাকিয়া, আমারই কার্য্য করে।

৫০। নিকৃষ্ট শরীরের সহিত শত্রুতা করিয়া কেবল ঈশ্বরের সহিতই বন্ধুতা করিবে। তাহার সহিত শত্রুতা করিয়া কদাপি অস্থায়ী দেহের সহিত বন্ধুতা করিও না। নিজকে সকল অপেক্ষা ক্ষুদ্র মনে করিবে। অন্তরটী ঈশ্বরে অর্পণ করিও, বহিঃশরীর নরনারীগণকে অর্পণ করিও।

৫১। ভূত ও ভবিষ্যৎ ভাবিবার আবশ্যক নাই। বর্ত্তমানে যাহা উপস্থিত আছে, তাহাই লইয়া ঈশ্বরের উপাসনায় নিবিষ্ট চিত্ত থাক।

তাপস বায়েজিদ্ বলিয়াছেন—

৫২। যে চক্ষু ঈশ্বরের শাসনাধীন হইয়া দৃষ্টি করে না, তাহার অন্ধ হওয়াই উচিত। যে জিহ্বা ঈশ্বরের গুণানুবাদে রত নহে, তাহার কথন-শক্তিহীন হওয়াই কর্ত্তব্য। যে কর্ণ সত্য শ্রবণ বিমুখ, তাহার বধির হওয়াই শ্রেয়ঃ। যে দেহ ঈশ্বরের সেবায় আসিল না, তাহার পতনই মঙ্গল।

৫৩। তুমি সতত ঈশ্বর সেবা করিবে। তাহাতে তোমার প্রাণকে উৎসর্গ করিবে, তবে তাঁহার প্রেম লাভ করিতে পারিবে। প্রেম বিনা প্রসন্নতা লাভ করা যায় না।

মছ্‌নবীতে উক্ত আছে—

৫৪। বিনা প্রেমে উপাসনা (নমাজ) হয় না। করিলে, সে কেবল উষ্ট্রের ন্যায় উঠাবসা মাত্র। হাজি লোকেরা মক্কার মন্দির প্রদক্ষিণ করেন এবং মক্কা বাসের আকাঙ্ক্ষা করেন। প্রেমিকগণ অন্তর দ্বারা স্বর্গলোক প্রদক্ষিণ করেন এবং মনশ্চক্ষু দ্বারাই ঈশ্বর দর্শন অভিলাষ করেন।

কোন হিন্দুসাধক বলিয়াছেন—

৫৫। যদি হরি আরাধিত হন, তবে তপস্যায় কি প্রয়োজন? যদি তিনি আরাধিত না হন, তবেই বা তপস্যায় কি প্রয়োজন? হরি যদি অন্তরে বাহিরে বিদ্যমান, তবে তপস্যার দ্বারা কি লাভ? যদি তিনি অন্তরে বাহিরে বিদ্যমান না থাকেন, তবেই বা তপস্যায় কি লাভ? ফল কথা যিনি ভগবানকে জানিয়াছেন, তিনি সর্ব্বদা অন্তরে বাহিরে তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করেন। তাহার তপস্যায় কোন প্রয়োজন নাই। ঈশ্বরকে পাইবার জন্য তাঁহার তীর্থ পর্য্যটনাদিরও আবশ্যকতা নাই।

ভক্ত কবির বলিয়াছেন—

৫৬। মালা জপিতেই তোমার দিন গত হইল, কিন্তু তোমার মনের মলিনতা দূর হইল কৈ? তুমি মালা পরিত্যাগ করিয়া হৃদয়কে মালা করিয়া জপিতে থাক।

৫৭। হৃদয়ের সহিত ভালবাসাই প্রেম। কেহ কেহ রোমশ বস্ত্র পরিধান ও যব রোটিকা খাইয়া ঈশ্বর প্রেমিকের পরিচয় দেন; কিন্তু উহা কেবল ভণ্ডামি মাত্র। রোমশ বস্ত্র পরিধান করিলেই যদি ঈশ্বর

প্রেমিক হওয়া যায়, তবে পশুমাত্রেই ঈশ্বর প্রেমিক।

তুলসী দাস বলিয়াছেন—

৫৮। যদি পাথর পূজা করিলে হরি লাভ হয়, তবে আমি পাহাড় পূজা করি। যদি তৃণ থাইয়া থাকিলে হরিকে পাওয়া যায়, তবে গরু, ছাগল প্রভৃতি অনেক আছে। যদি ফলমূল ভক্ষণ করিয়া থাকিলে হরি মিলিতে পারে, তবে বাদুড় ও বানরদিগের পক্ষে হরি সুলভ। যদি দুধ পান করিয়া থাকিলে হরিকে পাওয়া যাইতে পারে, তবে গো-বৎসাদির পক্ষে সহজ। বস্তুতঃ প্রেম বিনা হরি লাভ হয় না। প্রেমই তাঁহাকে লাভ করার প্রধান সাধন।

মছ্নবীতে আছে—

৫৯। তুমি স্বীয় অঙ্গকে সুবর্ণের ন্যায় পরিষ্কার করিয়াছ বটে, কিন্তু তোমার হৃদয় যে লৌহাপেক্ষাও মলিন। তবে কিরূপে সুবর্ণের বিনিময়ে বিক্রীত হইতে পারিবে?

৬০। তুমি যখন অবিশ্বাসী এজিদের কুমন্ত্রণা গ্রহণ করিয়াছ, তখন তাপসবর বাএজিদের পরিচ্ছদ পরিধান করিলেই বা তোমার কি লাভ?

শ্রীমির্জ্জা আমিন উদ্দিন আহাম্মদ।

—o—

তত্রৈব রমতে হরিঃ।

বিষ্ণুভক্তির্যথা সাক্ষাজ্জীবনিস্তারকারিণী।
গৃহিণী রাজতে যত্র তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥১॥

সর্ব্বজীব নিস্তারিণী গৃহিণী যথায়,
বিরাজে সাক্ষাৎ যেন বিষ্ণুভক্তি প্রায়;
গৃহস্থ-আশ্রম সেই পুণ্যনিকেতন,
নিত্য বিরাজেন তথা দেব নারায়ণ।১।

পুণ্যব্রতো গৃহীযত্র গৃহিণী চ পতিব্রতা।
পিতৃভক্তাশ্চ সন্তানাস্তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥২॥

যে গৃহে গৃহস্থ সদা পুণ্যকর্ম্মে রত,
পতিমাত্র গৃহিণীর জীবনের ব্রত;
পিতৃভক্ত গুণবান্ যে গৃহে সন্তান,
তথায় করেন হরি নিত্য অধিষ্ঠান।২।

আতিথ্যং গুরুভক্তিশ্চ পাতিব্রত্যং দয়ার্জ্জবম্।
সত্যং শৌচং ক্ষমা যত্র তত্রৈব রমতে হরিঃ॥৩॥

সতীত্ব, আতিথ্য, দয়া, ভক্তি গুরুজনে,
সত্য, শৌচ, সরলতা, ক্ষমা, যে ভবনে;
সে গৃহ ধর্ম্মের ক্ষেত্র শান্তির আধার,
শ্রীহরি তথায় নিত্য করেন বিহার।৩।

অরিষড়্বর্গদমনং দীনোপগত রক্ষণম্।
সর্ব্বভূতাভয়ং যত্র তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥৪॥

যে ভবনে ছয় রিপু নিত্য বশে রয়,
অভ্যাগত দীন হীন লভয়ে আশ্রয়;
যথা আসি' সর্ব্বজীবে লভয়ে অভয়,
বিহরেন নিত্য তথা হরি দয়াময়।৪।

পিতা মাতা গুরুঃপত্নী জ্ঞাতয়ো বান্ধবাস্তথা।
যত্রৈতে নিত্যসন্তুষ্টাস্তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥৫॥

পিতা, মাতা, গুরু, পত্নী, পুলকিত মনে,
লভয়ে অতুল তৃপ্তি নিত্য যে ভবনে;
জ্ঞাতি বন্ধুগণে যথা সদানন্দে রয়,
বিহরেন হরি তথা সদানন্দময়।৫।

মোদন্তে শিশবো যত্র মোদন্তে চ গৃহেঽঙ্গনাঃ।
তির্য্যক্ষেতাঽপি প্রমোদন্তে তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥৬॥

যে ভবনে শিশুগণ প্রফুল্ল বদন,
প্রফুল্ল বদন যথা কুলনারীগণ;
যে ভবনে পশু পক্ষী প্রফুল্ল বদন,
শ্রীহরি সদাই তথা করেন্ রমণ।৬।

শ্রদ্ধান্নং গৃহিণা দত্তং ভুঞ্জতে সর্ব্বজন্তবঃ।
প্রীত্যা যত্র গৃহে নিত্যং তত্রৈব রমতে হরিঃ॥৭॥

যে গৃহে গৃহস্থ নিত্য ভক্তিপূর্ণ মনে,
অন্নদান মহাদান করে জীবগণে;
সকলে আনন্দে তাহা করয়ে আহাব,
সে গৃহে শ্রীহরি সদা করেন বিহার।৭।

অহো তৃপ্তোঽস্মি জীবানামিতি নিত্যং প্রবর্ত্ততে।
যত্রানন্দরবো গেহে তত্রৈব রমতে হরিঃ॥৮॥

'আহা! হইলাম তৃপ্ত'—এ আনন্দ-রবে,
যে গৃহ করয়ে পূর্ণ জীবগণ সবে;
জীবের শান্তির স্থান ধন্য সে ভবন,
নিত্য বিরাজেন তথা শ্রীমধুসূদন।৮।

অদ্বৈত ভক্তিসূত্রেণ যত্র গৃহেজনাঃ।
সর্ব্বেঽভিন্নমনঃ প্রাণাস্তত্রৈব রমতে হরিঃ॥৯॥

পতি, পত্নী, পুত্র, ভৃত্য আদি পরিজনে,
অদ্বৈত ভকতি-সূত্রে বদ্ধ যে ভবনে;
সবার একই মন, একই পরাণ,
শ্রীহরি করেন তথা নিত্য অধিষ্ঠান।৯।

যত্র নির্লিপ্তভাবেন সংসারে বর্ত্ততে গৃহী।
ধর্ম্মং চরতি নিষ্কামং তত্রৈব রমতে হরিঃ॥১০॥

নিষ্কাম নির্লিপ্তভাবে গৃহস্থ যথায়,
সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মে জীবন কাটায়;
ধরাধামে একমাত্র ধন্য সে ভবন,
নিত্য বিরাজেন তথা দেব নারায়ণ।১০।

গৃহী যত্রাখিলক্লেশান লীলয়া সহতে স্বয়ম্।
হরত্যাশ্রিতসন্তাপং তত্রৈব রমতে হরিঃ॥১১॥

অশেষ ক্লেশের ভার গৃহী যে ভবনে,
আপনি করিয়া সহ্য অম্লানবদনে,
প্রাণপণে আশ্রিতের হরে দুঃখভার,
নিত্য তথা নারায়ণ করেন বিহার।১১।

পরিশ্রমো মিতাচারো যত্র ধর্ম্মেণ জীবিকা।
দেবাতিথি গুরুশ্রদ্ধা তত্রৈব রমতে হরিঃ॥১২॥

পরিশ্রম, মিতাচার, ধর্ম্মপথে আয়,
দেবতা-অতিথি-গুরু-অর্চ্চনা যথায়;
পরম পবিত্র সেই গৃহস্থ ভবন,
নিত্য বিরাজেন তথা দেব নারায়ণ।১২।

প্রযত্নলালিতা যত্র ধেনবো নিত্য দুগ্ধদাঃ।
সুপুষ্পফলবা বৃক্ষাস্তত্রৈব রমতে হরিঃ॥১৩॥

যতনে লালিত হ'য়ে যথা ধেনুগণ,
সুধাসম ক্ষীরধারা করে বিতরণ;
দিব্য ফল পুষ্প যথা দেয় তরুগণ,
সে গৃহে সতত হরি করেন রমণ।১৩।

সুসংস্কৃতে সুসংমৃষ্টে যদগৃহে সর্ব্বতঃ শুচৌ।
বিশুদ্ধান্যন্নপানাদি তত্রৈব রমতে হরিঃ॥১৪॥

পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন নিত্য যে ভবন,
পবিত্র পানীয় শয্যা অশন বসন;
অশুচি দ্রব্যের যথা নাম গন্ধ নাই,
বিহরেন সেই স্থানে শ্রীহরি সদাই।১৪।

সর্ব্বং যত্রান্নপানাদি গৃহী বিষ্ণুনিবেদিতম্।
পরিবারৈর্বৃতো ভুঙ্‌ক্তে তত্রৈব রমতে হরিঃ॥১৫॥

অন্নপান সমস্তই গৃহী যে ভবনে,
ভক্তিভাবে নিবেদন করে নারায়ণে;
পশ্চাৎ সকলে মিলি করয়ে আহার,
সে গৃহে শ্রীহরি সদা করেন বিহার।১৫।

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

মহারাষ্ট্র।

(১ম)

মনুষ্যদেহে যেমন অস্থি, পৃথিবীর স্থলভাগে সেইরূপ পর্ব্বত। এই জন্য পর্ব্বতের নাম ভূধর। ঘাটাখ্য পর্ব্বত অরঙ্গাবাদ হইতে কন্যা কুমারী পর্য্যন্ত বিশাল প্রাচীরবৎ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বোধ হয়, সমুদ্রকে ভারত প্লাবিত করিতে নিষেধ করিতেছে। এই পর্ব্বতের উত্তর ভাগকে সহ্যাদ্রি কহে। বদলাপুর অতিক্রান্ত হইলে পর্ব্বতের শোভা নয়নগোচর হইতে লাগিল। ভোরঘাট উত্তানপথে উঠিবার জন্য করজট নামক স্থানে যাইয়া বৃহৎ ইঞ্জিন লওয়া হইল এবং নামিবার কালে শকট শ্রেণী যদি গড়াইয়া পড়ে, সেই জন্য পশ্চাৎ হইতে আকর্ষণার্থ কয়েকখানি ব্রেক শকট যোজনা হইল। এখান হইতে লনৌলি পর্য্যন্ত ১৬ মাইল অদ্রিবক্ষে লৌহবর্ত্ম উন্নত এবং আনত ভাবে চলিয়াছে। ঘাট পর্ব্বতের পশ্চিম হইতে পূর্ব্বপারে যাওয়া আবশ্যক। অবশ্য প্রাকৃতিক ছেদ আছে, তাহার নাম ভোর-ঘাট। সেই সরণি অবলম্বন করিয়া সানু নির্ম্মাণ করতঃ গিরি কটক ভেদ করিয়া পথ গিয়াছে। চড়াই দুই সহস্র ফিট। এক পর্ব্বত হইতে অন্য পর্ব্বতে যাইবার জন্য বহু সেতু আছে। মোহকীমলি সেতু ১৬৩ ফিট উচ্চ। সহ্যাদ্রির শোভা অবশ্য মোহজনক। তরুগুল্ম ও নির্ঝর, এ সকলের অপ্রতুল নাই, কিন্তু আমরা পর্ব্বত বলিলে, হিমবৎ স্মরণ করি। বড় বড় পাইন জাতীয় বৃক্ষ দেখিতে ইচ্ছা হয়। চক্ষু নীহার মণ্ডিত শৃঙ্গ দেখিতে চায়। ভৈরব ভাব যদি না দেখিতে পাইলাম, তবে আর অদ্রির সৌন্দর্য্য কি? অনেক শৈল দেখিলাম, হিমালয়ের ছবি অন্যত্র মিলিল না। ঘাট পর্ব্বত, আর এক বিষয়ে বিশেষ আগ্রহের কারণ হইতেছে। এমন পর্ব্বতগাত্রে পথ (রেইল) কোথাও দেখি নাই। ভারতের মধ্যে ইহা একটী প্রধান দর্শনীয় স্থান। বাষ্পীয় যান এখনে ব্যোমযান স্বরূপ হইয়াছে। আকাশে গাড়ী ছুটিতেছে, মর্ত্ত্যলোকে গ্রাম, শস্যক্ষেত্র ও অবিরল বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী রাজপথ কঙ্কণ প্রদেশ শোভা করিয়া বিরাজ করিতেছে। যেস্থলে প্রভূত প্রস্তর কর্ত্তন করিত হইবে, সেখানে সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পথ হইয়াছে। দ্বিদশতি (বিংশতি) সংখ্যক বা ততোধিক টনেল হইবে। অন্ধকারে যখন ঐ পথে যাইতে হয়, আরোহীগণ "বিঠ্ঠল হরি" বলিয়া চিৎকার করিতে থাকে। রিভরসিং ষ্টেশনে যাইয়া দেখা গেল, আর সম্মুখে পথ নাই। যে পথ আসিয়াছি, তাহার উপর স্তর দিয়া চলিতে হইল। বহু উচ্চে খণ্ডালার বাঙলা দেখা যাইতেছে। ক্রমশঃ তথায় পৌছিলাম। এই স্থান মৃগয়াপ্রিয় মানবের বাঞ্ছনীয়। ব্যাঘ্র ও হরিণ প্রভৃতির অভাব নাই। এখনে বারশিঙ্গা পাওয়া যায়। বেলা দুই-টার সময় পুণ্যপত্তনের গণেশ খিন্দ প্রাসাদ দৃষ্টিগোচর হইল। মহারাষ্ট্র রাজধনী পুনা নগরে অবতরণ করিয়া এক ব্রাউহাম ভাড়া করিয়া "রাজমান্য রাজেশ্বরী" অর্থাৎ শ্রীল শ্রীযুক্ত সাঠে মহাশয়ের বাটীতে যাত্রা করিলাম। পথি মধ্যে কয়েকখানি মাড়য়ারির মুদিখানার দোকান দৃষ্ট হইল। ইহারা দেখিতেছি সর্ব্বত্র আছে। সকলেই ইহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখে, কিন্তু ইহারা নহিলেও চলে না।

সর্ব্বপ্রথমে পর্ব্বতী (পার্ব্বতী) দর্শন করিতে যাওয়া হইল। পর্ব্বতের উপর এই পার্ব্বতীর মন্দির সাতারা রাজের স্মরণার্থ বালাজী বাজীরাও কর্ত্তৃক পাণিপথের যুদ্ধের পূর্ব্বে নির্ম্মিত। মহারাষ্ট্র গৌরব চিরদিনের জন্য পাণিপথের যুদ্ধস্থলে বিসর্জ্জন দিয়া বালাজী ভগ্নমনে প্রত্যাগমন করিয়া রোগ শয্যায় শয়ন করিলেন এবং এইশৈলে প্রাণ-ত্যাগ করিলেন। হরিগোবিন্দ আমাদিগকে দেবালয় প্রভৃতি দেখাইয়া একটী বাতায়নের নিকট লইয়া গেলেন ও ইংরাজি ভাষায় কহিতে লাগিলেন,—এই স্থান হইতে পেশোয়া বংশের শেষ ভূপতি, ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে, দুই সহস্র আটশত সৈন্য কর্ত্তৃক তাঁহার অষ্টা-দশ সহস্র যোদ্ধাকে খিরকি নামক স্থানে পরা-জিত হইতে দেখিয়াছিলেন। যে বৎসর বাজীরাওর রাজ্য ইংরাজ গ্রহণ করিলেন, সেই বৎসরেই বজ্রাঘাতে এই বাটী ভগ্ন হইয়া যায়। মন্দিরজীবী অনাথগণের সাহায্যের নাম করিয়া প্রদর্শক ঠাকুর আমা দের নিকট কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রার্থনা করি-লেন। এখান হইতে অবতরণ করিয়া মূলামুতা তটিনী উপরে বন্দ উদ্যান ভূমিতে বিচরণ করিবার সঙ্কল্প হইল। পুনার নরনারী সন্ধ্যাকালে এই প্রদেশে ভ্রমণার্থ উপস্থিত হন। ইংরাজি বাদ্য উদ্যম হয়। উদ্যা-নের নূতত্ব এই যে, টবে বসান গাছ দ্বারা উপবন রচিত। একটী প্রস্রবণে ছত্রের আকারে বারিধারা উত্থিত হইতেছে! বন্দ জল প্রপাত অতি সুন্দর দৃশ্য। কিছু ক্ষণের জন্য অভিভূত হইলাম। প্রভূত জলরাশি মহাবেগে সশব্দে পতিত হইয়া ফেণিল ভাবে দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া ধাবমান হইয়াছে। বাঁধ ছাপাইয়া ধারা-গুলি স্ফটিক রেখার মত নিপতিত হই-তেছে। জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে প্রপা-তের সৌন্দর্য্য আর একরূপ দেখিলাম। আলোক ক্ষীণ বলিয়া বাঁধ বা জল দেখা যাইতেছে না। কেবল জলের যে ভাগ ক্ষুব্ধ হইয়া শ্বেত হইয়াছে, তাহাই চন্দ্রিকা মাখিয়া নয়ন পথগামী হইতেছে। দৃশ্য অতি অপূর্ব্ব।

চতুঃ শিঙ্গি দেবীর মন্দির "ডোঙ্গরের" (পাহাড়) উপর। সোপানাবলির উভয় পার্শ্বে সানুদেশে ইতস্তত কুনবীমরঠগণ আহারান্তে কাদম্বরী সেবা ও তাস ক্রীড়া করিতেছে। সেদিন দেবীর পর্ব্বাহ। দেবা-লয়ের অভ্যন্তরে যাইয়া মদিরার গন্ধ পাইতে লাগিলাম। এটি বীরমার্গ অনুবর্ত্তীদের স্থান। দেবীর গলদেশে তাম্বুলবল্লির মালা। ভাত, লুচি ও মদ্য দিয়া নৈবেদ্য হইয়া থাকে। একটি স্ত্রীলোকের উপর দেব আবির্ভাব হইয়াছে, সে নানা প্রশ্নের উত্তরে দুই একটি শব্দ উচ্চারণ করিতেছে। দেব পূজা করিয়া পূজারি রমণীর নিকট একখণ্ড নারিকেল প্রসাদ পাইলাম। পর্ব্ব-তের নিম্নে এক চত্বর আছে, উহাতে বলিদান হয়। নানা ফরণবিশ কৃত দেবায়তনের নাম বেলবাগ। প্রাতঃকালে মৃদঙ্গ ও বীণা সহযোগে নারায়ণ সমক্ষে স্তুতি গীত হয়। একাদশীর দিন অপরাহ্নে বিপুল জনতা দৃষ্ট হয়। চন্দ্রাতপতলে অসংখ্য নরনারী উপবেশন করিয়া কথকতা শ্রবণ করিতে-ছেন। কথক দণ্ডায়মান হইয়া মহাভারত কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গীতের সাহায্য করিবার জন্য কয়েকজন করতাল ও মৃদঙ্গ লইয়া পশ্চাৎ রহিয়াছে। কথক যদি ব্রাহ্মণ হন, তাহা হইলে কীর্ত্তন অন্তে ব্যক্তি বিশে-

চনায় আলিঙ্গন ও প্রণাম গ্রহণ করেন। শ্রোতৃবর্গ দেবতার কিছু প্রসাদ লইয়া বিদায় হন। কীর্ত্তন সরস করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে টুকারামের অভঙ্গ নামক কবিতা ব্যবহার করেন। (টুকারামের ইষ্টদেবতা বিঠোবা পানঢর পুরে অবস্থিত। সম্প্রতি তত্রত্য মহা উৎসব উপস্থিত। বিসূচিকা রোগ প্রাদুর্ভূত হওয়ায় শান্তিরক্ষক কর্ত্তৃক গমন নিষিদ্ধ হইয়াছে।) তুলশিবাগ পুনার মধ্যে প্রধান দেবালয়। একজন "সাউকার" কয়েক বর্ষ হইল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মন্দিরের আকার—রাজসিংহাসনের ন্যায় কতক গুলি তোরণ (খিলান) উপর্য্যুপরি গ্রথিত হইয়াছে। মন্দির উচ্চ হওয়ায় সেইরূপ আকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবয়ব স্তরে স্তরে নির্ম্মিত হইয়া শিখর দেশ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়াছে। মঙ্গল চিহ্ন স্বরূপ আলিপনা প্রত্যহ মন্দিরের তাবৎ প্রকোষ্ঠে দেওয়া হয়। ইহা সুখসাধ্য করিবার জন্য ছিদ্রযুক্ত "বোলর" মধ্যে চূর্ণ রক্ষা করিয়া থাকে, তাহাতে চিত্র অঙ্কিত হইয়া যায়। গর্ভগৃহে রাম লক্ষ্মণ জানকী বিরাজ করিতেছেন। অবশ্য তাঁহারা মহারাষ্ট্রীয় পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়াছেন। প্রাঙ্গণের প্রাচীরে রামায়ণ প্রতিপাদক চিত্র অঙ্কিত আছে ও ইহার নিম্নে লীলার নাম লিখিত হইয়াছে। যে দেবালয়ে সমারোহ আছে, আগন্তুক ব্যক্তি সে স্থানে কিয়ৎকাল অবস্থান করিলে অর্দ্ধেক নগর দেখার ফললাভ করিতে পারেন। এই স্থান ও বাঁধসন্নিহিত উদ্যান এখানকার মধ্যে ভ্রমণের বিলাস ভূমি।

বোম্বাইয়ের অনেক প্রধান ব্যক্তি এখানে বাস করেন। প্রাবিটকালে গবর্ণরের পুনায় নিবাস হয়। বোম্বাই অপেক্ষা এখানকার জলবায়ু উত্তম। বোম্বাই প্রদেশের ইংরাজি-সৈন্য এখানে অবস্থিতি করেন। সহরে বিজাতীয় হর্ম্ম্যনির্ম্মাণ প্রণালী প্রবেশ করে নাই। অবশ্য একথা ইংরাজপল্লি সম্বন্ধে প্রযুজ্য নহে। জোশী হল বা সার্ব্বজনিক সভাগৃহ ও স্বাস্থ্যরক্ষকের কার্য্যালয়টি বোম্বাই প্রণালীর কাচের সার্শিমণ্ডিত। অধিবাসীগণের পরিচ্ছদেরও সেইরূপ কোন পরিবর্ত্তন নাই। তবে উহাদের মধ্যে কেহ কেহ কোট পেণ্টুলেন পরিধান করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে,পরিধান দেখিলে,যে ইংরাজি নবিশ নহে, তাহাকে চিনা যায়। এখানে "সুধারণে আলাকে" ও (সংস্কারক) মস্তক মণ্ডিত করিয়া দীর্ঘ শিখা রাখিতে হয়। পায়ে দেশীয় উপানৎ। পরিধেয় রজকালয় দর্শন করে নাই। এইরূপ পুরস্ত্রীধৌত প্রশস্ত রক্তকুল বস্ত্র ও উত্তরীয়। দীর্ঘ অঙ্গরক্ষাটী কিন্তু পরের বাড়ী দিতে হয়। মস্তকে রথচক্রের মত শির বেষ্টন। স্ত্রীলোকে কাছা কোঁচা দিয়া গাত্র আবৃত করিয়া যে দেশী রঙ্গিন সাড়ি পরিধান করে, তাহার অন্যথা হইবার নহে। আমরা পারসি মহিলার সাড়ি দেখিয়া মোহিত হইয়া আপনার গৃহিণীর জন্য ক্রয় করিতে পারি, কিন্তু মরাঠী অঙ্গনা কদাপি তাহা ব্যবহার করিবেন না। শ্লথ পাদুকা ব্যবহার স্ত্রীলোকের পক্ষে দূষ্য নহে। বাঙ্গালার ন্যায় ছত্রদণ্ডের বহুল ব্যবহার আর কোথাও নাই। সুদরিদ্র কৃষাণ সজ্জা করিয়া কোন স্থানে যাইতে হইলে ছাতাটী লইবে। এ বিষয়ে কলিকাতা-বাসিদের এক কৌতুকাবহ ব্যবহার আছে। রৌদ্র বা বৃষ্টিতে পারগ পক্ষে আতপত্র লইয়া যাইবেন না, যদি লইলেন বৃষ্টি রৌদ্র না থাকিলে

মাথায় দিয়া যাইতে হইবে। কলের জল লইবার জন্য ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের পৃথক কুণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে। লিখিত আছে "ব্রাহ্মনাচা হৌজ" "শূদ্রাচা হৌজ"। যখন এপথে প্রবেশ করিয়াছি, বস্ত্র প্রক্ষেপের শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে। বোধ হইতেছে, ব্রাহ্মণ জাতি এখানকার আদিম অধিবাসী নহেন, নতুবা সে মরঠ জাতির বাস বলিয়া দেশের নাম মাহারাষ্ট্র বা মরঠ্ঠা হইয়াছে, সে মরঠ শব্দে কেবল শূদ্র বুঝাইবে কেন? একদা শ্মশান দেখিতে যাওয়া হইল—এখানে (ঘুঁটে) দ্বারা চিতাপ্রস্তুত হয়। ডাল ও রুটি দ্বারা পুরুক পিণ্ড প্রদত্ত হইয়া থাকে।

গবর্ণরের কাউন্সিল হল অতি বৃহৎ গৃহ। এখানে অনেক গুলি তৈল মিশ্র বঙ্গের চিত্র আলম্বিত আছে। দেশের খ্যাতিবান ব্যক্তিদিগকে দর্শন করিবার কার্য্য ইহাতে নির্ব্বাহ হইল। যাহাদের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাদের নাম যথা—খান বাহাদুর পদমজী পেসতনজী, খান বাহাদুর নৌশির ওয়ানজী, পেসতনজী, সোরাবজী, যামজী পটেল, ত্রিবাঙ্কুরের যুবরাজ, সরমঙ্গল দাস নাথুভাই, ডাক্তার ভাউদাজি, কোচিনের রাজা. সর সালারজঙ্গ, ভাউনগরের ঠাকুর, মোরভীর ঠাকুর, খণ্ডে রাও গায়কবাড় এবং সর ত্র্যম্বক মাধব রাও, ও শঙ্কর শেট। এই বিপুল সমৃদ্ধিসম্পন্ন প্রাসাদ অবলোকন করিয়া যদি পেশয়ার ভবন দর্শন করিতে যাওয়া হয়, তাহা হইলে জগতের বৈচিত্র্য চমৎকার অনুভূত হইবে। শনিবার পেট আমাদের বাটীর অতি নিকটে অবস্থিতি, এখানে একটী প্রাকার বেষ্টিত বাটীতে মহারাজ পেশয়া বাস করিতেন। প্রহরীর অনুমতি লইয়া সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখা গেল, কাল সমস্ত গ্রাস করিয়াছে। দুর্ভেদ্য প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাচীরের মধ্যে কেবল পতিতভূমি অবশিষ্ট রহিয়াছে। আর সকল আগুণ লাগিয়া পুড়িয়া গিয়াছে। এই স্থানে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ শে অক্টোবর প্রাতঃ-কালে তরুণ পেশয়া মধুরাও অট্টালিকার উপর হইতে পতিত হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। প্রধান মন্ত্রী নানা ফাবনাবিস রাজকীয় তাবৎ ক্ষমতা ধারণ করিতেন। তিনি পেশয়ার ভ্রাতাকে বন্দী করায় মধুরাও অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং আপনাকে কর্ম্মচারীর অধীন দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়া সভায় আসা ত্যাগ করিলেন। শয়ন গৃহের বাহির হইতেন না। বিজয়াদশমীর দিন না হইলে নয় বলিয়া সৈন্যগণের সমক্ষে দেখা দিলেন। এবং রাত্রে দরবারে সরদার ও দূতগণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কিন্তু তাঁহার মন শান্তি লাভ করিতে পারিল না। দুই দিন পরে ইহলোক ত্যাগ করিবার জন্য ছাদের উপর হইতে পতিত হন। ফুহারার উপর পড়ায় অতিশয় ক্ষত হইল ও দুই খানি অস্থি ভগ্ন হইয়া গেল। তারপর দুই দিন গত হইলে প্রাণ বহির্গত হইল। তাঁহার অতি প্রিয় বাবারাও ফড়কের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া মরিবার সময় বলিয়াছিলেন, নানার শত্রু বাজীরাও মসনদের উত্তরাধিকারী হইবেন। আর এই "জুনাবাড়া" তেই ১৭৭৩ খ্রীঃ অঃ ৩০শে আগষ্ট ঊনবিংশ বয়সে নয় মাস মাত্র রাজ্যকালে নারায়ণ রাও তাঁহার রক্ষক সোমর সিং ও এলিয়া কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। নারায়ণ, তদীয় পিতৃব্য রঘুনাথ রাওকে এই বাটীর এক দেশে বন্দী দশায় রাখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি আপন মুক্তি

কামনায় ঐ ঘাতকদ্বয় দ্বারা পেশয়াকে ধৃত করিবার জন্য আজ্ঞা লিপি দেন। রঘুনাথের পত্নী আনন্দী বাই গোপনে সেই লিপির ঘৃত শব্দ হত শব্দে পরিবর্ত্তিত করিলেন, নারায়ণ পিতৃব্যকে জড়াইয়া ধরিলেন। তিনি নিষেধ করিলেও সোমব সিং অনুমতি পত্রের নির্দ্দেশ অনুসারে অস্ত্রাঘাত করিল। এই সকল চিন্তা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আগমন করিলাম। এই বাটীর চতুর্দ্দিক বাজার, সেই জন্য এই স্থানে অপর নাম মণ্ডি। সম্মুখে তরকারি ও বিবিধ ফল এবং লঙ্কা মরিচ ও পলাণ্ডু, সকল বস্তুই অপরিমিত ভাবে বিক্রয় হইতেছে। এক পার্শ্বে কুম্ভকারের দ্রব্যজাত, অন্য পার্শ্বে ইন্ধন বিক্রয়ের স্থান। বাড়ীর পশ্চাৎভাগে শুষ্ক মৎস্য বিক্রয় হয়। লিমজীর হোটেল এই দিকে। অধিক রাত্রে এখানে আসিলে বিলক্ষণ কৌতুক দেখিতে পাওয়া যায়। লিমজী পরিহাস করিয়া বলেন, আমার হোটেল কেবল ব্রাহ্মণ জাতির জন্য স্থাপিত। অন্যকে মদ্য মাংস বিক্রয় করি না; ফলতঃ ইংরাজি শিক্ষিত নিরামিষ-ভোজী পুনার ব্রাহ্মণ এক্ষণে গোপনে মদ্য মাংস ব্যবহার করা অন্যায় বিবেচনা করেন না।

পুনানগরে তিন খানি নাট্যশালা আছে। টিকিট বাজারে বিক্রয় হয়। আমরা এক জন মহারাষ্ট্রীয় সহচরের সহিত কর্ণপর্ব্ব অভিনয় দর্শন করিতে গেলাম। নিয়মিত সময়ে নাট্য আরম্ভ না হওয়ায় কিয়ৎকাল বহির্দ্দেশে থাকা হইল। পার্শ্ববর্ত্তী ভবন হইতে ঘরট্ট সঞ্চালিনীর কোকিল কণ্ঠ গীতি নিস্বন আগমন করিয়া কর্ণ পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল। রঙ্গভূমির মুখপটের চিত্রের দৃশ্য অতি জঘন্য। দশভুজা অসুর সংহার করিতেছেন। প্রথমতঃ শংখ ঘণ্টা বাজাইয়া গণপতির পূজা হইল। তাহার পর সরস্বতী বন্দনা করায় তিনি স্বয়ং কটিদেশে বাহনের অবয়ব সংলগ্ন করিয়া আগমন করতঃ মহানৃত্য করিতে লাগিলেন। এক জন ইংরাজ সাজিয়া আসিয়া ব্রাহ্মীর সহিত পরিহাস করিতে লাগিল। সরস্বতী পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন, আমরা দেবতা, আমার সহিত এ ব্যবহার করিও না। এইরূপ ভাবে প্রস্তাবনা আরম্ভ ও শেষ হইয়া কাব্য আরম্ভ হইল। পাত্রের শেষ গান গুলি পটের বাহিরে মহারাষ্ট্রীয় কীর্ত্তনের প্রণালীতে মৃদঙ্গ ও মন্দিরা সহযোগে অপর ব্যক্তি কর্ত্তৃক গীত হইতে লাগিল। অভিনেতাদের অঙ্গবিক্ষেপ এমন প্রবল যে, আলোকের একটী কাচনালী পতিত হইল। এ দলে দুই একটী স্ত্রী অভিনেত্রী আছেন। এতদ্দেশে অবরোধ প্রথা না থাকায় কুলবতীর দ্বারা অভিনয় হওয়ার প্রতিবন্ধক নাই। তথাপি সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে দেখা যাইতেছে না। বাঙ্গালায় যাঁহারা বারস্ত্রী কর্ত্তৃক অভিনয়ের বিরোধী, তাঁহারা এই বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিবেন। বিশেষতঃ কলিকাতার মত স্থান, যেস্থানের রুচিতে বেশ্যাবৃত্তি-নিরতা ঠিকে চাকরাণী পুরস্ত্রীগণের সহিত থাকিতে পায়, সেখানে নটী কুলটা হইলে নীতি-বিরুদ্ধ হইবে না। স্ত্রীচরিত্র পুরুষে অভিনয় করিলে দৃশ্য অস্বাভাবিক হয় বলিয়া স্ত্রীলোক গ্রহণ করা হইয়াছিল। অধুনা কলিকাতার রঙ্গভূমিতে স্ত্রীলোকে পুরুষ সাজে; এ কুদর্শন সহ্য হইতেছে। রাত্রি শেষ পর্য্যন্ত আমরা থাকিতে অক্ষম বলিয়া কুঞ্চিকা আনাইয়া দ্বারের তালকোদ্ঘাটন করত বিদায় লইতে হইল।

এদেশের প্রাকৃত লোক মল্লযুদ্ধকে অতিমাত্র প্রিয় জ্ঞান করে। তাহারা নাটক অভিনয় দেখিতে যায় না। কুস্তি অবশ্য দেখিবে। রঙ্গস্থলে প্রবেশের মূল্য এক আনা বা দুই আনা। প্রবর্ত্তক জয়ীকে কিঞ্চিৎ অর্থ পুরস্কার দিয়া থাকেন।

নাট্যশালার দ্বারে নিবিড় জনতার মধ্য দিয়া প্রবিষ্ট হইয়া অসংখ্য দর্শকের মধ্যে দণ্ডায়মান থাকিয়া বহুক্ষণ প্রতীক্ষা করিতে হইল। একজন পঞ্জাবীর শিষ্যের সহিত এক মরহাঠার শিষ্য ক্রীড়া করিল। শেষোক্ত ব্যক্তি জয়লাভ করিবামাত্র তাহার ওস্তাদ সাগ্‌রিদকে লুফিয়া লইলেন ও গুম্ফে চাড়া দিতে লাগিলেন। আত্মীয় লোকের সহিত অভিবাদন ও করমর্দ্দন হইতে লাগিল। কেহ জয়ীকে ব্যজন করিতেছে, কেহ বা অঙ্গের ধূলা মুছাইতেছে, তাহার আজ আহ্লাদের সীমা নাই। যে পরাভূত হইয়াছে, সে কোথায় লুকাইল, দেখিতে পাওয়া যাইতেছেনা। যখন উভয়ে মল্লভূমিতে অবতরণ করিয়া করস্পর্শ করিয়াছিল, তখন তাহদের হৃদয়ে বৈরভাব ছিল না। কিন্তু অবস্থা ব্যতিক্রমে একের পৃষ্টে পতিত হইয়া মুখে ধূলি প্রক্ষেপ করিতেছে ও মনিবন্ধ দ্বারা প্রহার করিতেছে। দেখিলে জ্ঞান হয়, অনিচ্ছা সত্বেও ঘটনাচক্র মনুষ্যকে বিপথে লইয়া যায়। জেতার বন্ধুগণ তাহাকে সুপরিচ্ছদ ও জরির পাগড়ী পরিধান করাইয়া বাদ্যোদ্যম সহকারে পুর মধ্যে লইয়া চলিল। এক্ষেত্রে কোনও উচ্চবর্ণের লোক দেখিলাম না। এই মহাপুরুষেরা বাঙ্গালায় যাইয়া বর্গির হেঙ্গাম করিতেন। ইহাদিগকে দলবদ্ধ দেখিলে রঘুজী ভোঁসলে ও ভাস্কর পণ্ডিতকে (১৭৪২—৫১ খ্রীষ্টাব্দ) স্মরণ হয়। এই কুস্তি দেখার দিন প্রাতেঃ অত্যত্র প্রার্থনা সমাজে যাওয়া হইয়াছিল। অনারেবল রাওসাহের মহাদেবগোবিন্দ রানড়ে আচার্য্যের কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। আমার পরিচিত একটি বাঙ্গালা ব্রহ্মসঙ্গীত মরাঠীতে গীত হইল। ব্রাহ্মধর্ম্ম বাঙ্গালার বস্তু বলিয়া আমি প্রার্থনা সমাজে বসিয়া আত্ম গৌরব অনুভব করিলাম।

দাদোবা পাণ্ডরঙ্গ জাতিভেদ প্রভৃতি নিবারণ উদ্দেশে ১২ বার জন ছাত্রকে লইয়া পরম হংস সভা স্থাপন করেন। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনার পর সামাজিক বিষয়ে তর্ক বিতর্ক হইত। পাঁউরুটি ভক্ষণ ও মুসলমানের হস্তে জল গ্রহণ করিতে হইত। ঐ সভার ভগ্নাবশেষ হইতে বোম্বাইয়ে প্রার্থনাসমাজ স্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে সভ্যেরা বিবেচনা করিয়াছেন, সামাজিক নিয়মে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। ধর্ম্মোন্নতি সাধন হইলে সমাজসংস্কার আপনি হইতে পারে। তাঁহারা বলেন, ধর্ম্মোৎকর্ষ, বিদ্যাবিস্তার, স্ত্রী শিক্ষা, গার্হস্থ্য প্রণালী সংশোধন হইলে, জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ, চিরবৈধব্য প্রভৃতি আপনি উঠিয়া যাইবে। ইদানীং যাঁহারা ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়া থাকেন, নাসিক যাইয়া প্রায়শ্চিত্ত করত তাঁহারা হিন্দুসমাজে গৃহীত হন। দুই একটি ব্রাহ্মণ বিধবা বিবাহ করিয়াছে, কিন্তু সমাজে তাহারা স্থগিত আছে। মহাদেব গোবিন্দ রানড়ের স্ত্রীবিয়োগ হইলে অনেকে আশা করিয়াছিলেন, ইনি কুমারী বিবাহ করিবেন না, কিন্তু সমাজ ভয়ে বিধবা বিবাহ করিতে পারিলেন না। রাজনৈতিক শিক্ষায় পুনা বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছে। যে মহাশয় সার্ব্বজনিক সভার প্রাণ, সভ্য শ্রেণীতে

তাঁহার নাম নাই। রাজসদনে উক্ত সভা হইতে যে সকল আবেদনপত্র পাঠান হয়, তাহা উঁহার লিখিত। দেশ হিতকর কোন সমিতি বা অপর কার্য্যে যাইয়া যদি ইংলিশ রাজপুরুষ দেখিতে পান, তাহা হইলে অদৃশ্য হন। মনে করিয়াছিলাম, এখানে আসিয়া সংস্কতের বিলক্ষণ চর্চ্চা দেখিতে পাইব। বেদ ধ্বনিতে কর্ণ পবিত্র হইবে। যজ্ঞীয় ধূমের দর্শনলাভ হইবে। ইংরাজ অধিকারে সে সমস্ত লোপ পাইয়াছে। "বেদত্তেজনী সভাকে" বেদপাঠীদের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়া পাঠানুরাগ বৃদ্ধি করিতে হইতেছে। সময়ে সময়ে এক এক জন বৈদিক ভ্রমণ করিতে আসিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া যান।

প্রভুজাতি এদেশের কায়স্থ। মদ্য মাংস ভক্ষণ ইহাদেব মধ্যে প্রচলিত আছে, কুক্কুট মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ নহে। লেখা পড়া দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। শেনেবি ব্রাহ্মণও মৎস্য মাংস ভোজী। এদেশের বিদ্যাসাগর মহাশয় রামকৃষ্ণ গোপাল ভণ্ডারকর ও মৃত ভাউদাজী এই শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ। চিত পাবন ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে ক্যাম্বেল কহেন, মনুষ্যজাতির আদিম জন্মস্থান হইতে সরস্বতী ও সিন্ধু নদ বহিয়া সমুদ্রপথে এই জাতি কঙ্কন ভূভাগে আসিয়া আবাস স্থাপন করিয়াছেন। হিন্দুস্থানের মধ্যে বাস না করায় অনার্য্য রক্ত সংমিশ্রণ হয় নাই। দেশস্থ প্রভৃতি শ্রেণীর বাহ্মণেরা চিতপাবনদিগকে অধম বিবেচনা করেন। পেশয়া এই শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করায় কোকনস্থ ব্রাহ্মণের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। সহ্যাদ্রিখণ্ড নামক গ্রন্থে চিত পাবনদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু অপকর্ষ বর্ণিত থাকায়, বাজিরাও ঐ পুস্তকের তাবৎ খণ্ড নষ্ট করেন। চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চানক্য কোকনস্থ ছিলেন। কল্যাণ নামক স্থানে তাঁহার বাটী ছিল। রাজনীতিতে মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ অত্যন্ত পটু। রাজা যে জাতির হউন, তরবারি তাঁহার হস্তে থাকুক, কিন্তু ব্রাহ্মণ মেধা ও লেখনীর বলে রাজ্যের শাসন কার্য্য গ্রহণ করিবেন। ইদানীং বোম্বাই রাজ্যে তাবৎ না হইলেও অধিকাংশ লিখাপড়ার কার্য্য এই জাতি দ্বারা সম্পন্ন হয়। শিক্ষা বিভাগের নিয়ন্তা "লিওয়ার্নর" আজ্ঞা করিয়াছেন, পারদর্শিতা অনুসারে আর না দেখিয়া নির্দ্দিষ্ট বৃত্তির এক ভাগ বিদ্যোপার্জ্জনবিমুখ কুনবি প্রভৃতি জাতির ছাত্রকে দেওয়া হইবে। সার্ব্বজনিক সভা অতি কঠোর ভাষায় ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। এই প্রতিবাদের উত্তর আরো কর্কশ হইয়াছে। ডিরেক্টর বলেন, সমস্ত লিখন পঠনের কর্ম্ম ব্রাহ্মণেরা একচেটিয়া করিয়া রাখিতে চায়। উহাতে হস্তক্ষেপ হইলেই ব্রাহ্মণ জাতির যন্ত্র পুনার দেশীয় সংবাদপত্রগুলি তার স্বরে চিৎকার আরম্ভ করে। সার্ব্বজনিক সভারও ঐ কর্ম্ম। হাই স্কুল নাম দিয়া একটি বিদ্যালয় স্থাপন হইয়াছে। প্রথম হইতে শেষ শ্রেণী পর্য্যন্তের সকল শিক্ষক গ্রাজুয়েট্। তাহাদের সংকল্প গবর্ণমেণ্টে চাকরি করিবেন না। এই বিদ্যালয়ে যাহা লাভ হইবে, তুল্যাংশ করিয়া গ্রহণ করিবেন। স্ত্রীজাতির কিঞ্চিৎ বিদ্যাশিক্ষা পূর্ব্বাপর প্রচলিত আছে। পণ্ডিতের ঘরের কন্যা হইলে অল্প সংস্কৃত পঠন অভ্যাস হয়। বোধ হয় এক বৎসর পূর্ণ হয় নাই, ইংরাজী শিক্ষার জন্য ফিমেল হাই স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। সম্প্রতি বিদ্যালয়ের পারিতোষিক

বিতরণ উপলক্ষে মহা আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। এই সময় সয়াজীরাও গায়কয়াড় এখানে আগমন করেন। তাঁহার অভ্যর্থনা জন্য রেলওয়ে ষ্টেশন সজ্জিত করা, সার্ব্বজনিক সভা হইতে পান শুপারি দেওয়া প্রভৃতি নানা আয়োজন হইয়াছিল। ইংরাজগণ তাঁহাকে অধিকক্ষণ পান নাই। উক্ত বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ সভায় মাহারাষ্ট্র ভূপতি সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন, স্থিরীকৃত হইল। ইতি পূর্ব্বে স্কুল ইনেস্পেক্টর কর্ত্তৃক সে দিনকার সভায় কি কার্য্য হইবে, তাহার অনুষ্ঠানপত্র মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছিল। ছাত্রিগণ কর্ত্তৃক ন্যাসনেল অ্যান্‌থম্ গীত হইবে লিখিত ছিল। ডিরেক্টর বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদিগকে কহেন, উক্ত সঙ্গীতের সময় সভাস্থ সকলকে ইংরাজী প্রথা অনুসারে মহারাণীর প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য দণ্ডায়মান থাকিতে হইবে। তাহাতে অধ্যক্ষগণ কহিলেন, দর্শকদের মধ্যে বহুবৃদ্ধ ও স্ত্রীলোক হইতে পারে, তাহাদিগকে দণ্ডায়মান থাকিতে হইলে অত্যন্ত কষ্ট হইবে, সুতরাং "জয়শ্রী ভিক্টোরিয়া" গান হইয়া কাজ নাই। নিয়মিত সময়ে সভায় যে অনুষ্ঠান-পত্র দেওয়া হইল, তাহাতে যে স্থানে সঙ্গীতের নাম ছিল, তাহা কাটিয়া দেওয়া হইলে। লিওয়ার্ণর তাহা দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া উক্ত সঙ্গীতের এক অংশ গাওয়াইয়া তবে ছাড়িলেন, এবং গভর্ণমেণ্টে এসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। ঋগ্বেদের মরাঠী অনুবাদক (বেদার্থযত্ন সম্পাদক) ও হাই কোর্টের অনুবাদক শঙ্কর পাণ্ডারঙ্গ পণ্ডিত ন্যাশনল আন্‌থম্ গীত হইবার কথা মসিদ্বারা কর্ত্তিত করিয়াছেন বলিয়া রাজকীয় কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইলেন। লিওয়ার্ণর কহিলেন, গায়কবাড়কে সন্তুষ্ট করিবার জন্য এই কর্ম্ম করিয়াছ। মহারাষ্ট্রীয়েরা কহিলেন, "জয়শ্রী ভিক্টোরিয়া" গীত ন্যাশনেল অ্যানথমের অনুবাদ নহে। উহা দিল্লীর দরবার উপলক্ষে রচিত হইয়াছে, অতএব সে স্থলে দণ্ডায়মান হইবার প্রথা রক্ষা না করা দূষ্য হইতে পারে না। গুজরাতিরাও কহিলেন "রাণী জীনো ছন্দ" গাইবার কালে শ্রোতৃবর্গকে দাঁড়াইতে হয় না। এই বিতণ্ডা সমাধানের জন্য বিক্টোরিয়া গীতিকা ত্যাগ করা শ্রেয়ঃ বোধ হওয়ায় কাটিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এ বিষয়ে বহু বাদানুবাদ হইল, তথাপি শঙ্কর পাণ্ডারঙ্গ কর্ম্ম পাইলেন না।

শ্রীদুর্গাচরণ ভূতি।

যাহোক্ বিধান।

"I embrace the purpose of God, and the doom assigned."

—*Tennyson.*

(১)

যে জগতে জীব গোষ্ঠি কোটি পরিমিত,
জগৎ যেখানে অণু, সৃষ্টি তুলনায়;
সে বিশ্বে, হে নারায়ণ,
আমার কি প্রয়োজন?
দাঁড়ায়ে সৃষ্টির কূলে হৃদয় স্তম্ভিত;
আমি কারে চাই প্রভু, কে আমারে চায়?
কাহার সেবার তরে,
হৃদে অনুরাগ ঝরে?
এত প্রীতি ভালবাসা কাহার আশায়?
আমি কারে চাই হরি, কে আমারে চায়?

(২)

কিবা মোহ মেখে বুকে,
বেঁচে থাকি কিবা সুখে,
কেন হাসি কেন কাঁদি বুঝিতে না পাই।
জীবনের মহোৎসবে,
কোথা হোতে এলো সবে?
আমিতো কাহারে প্রভু, ডেকে আনি নাই?
কে সাজায় এসংসার,
কে সাজায় পরিবার?
কি ছার সুখের আশে বল সদা ধাই?
কেন হাসি কেন কাঁদি বুঝিতে না পাই।

(৩)

জীবনের এ আহবে,
শেষ ফল কিবা হবে?
শেষ মৃত্যু;—তার পর কি রবে আমার?
দীক্ষিত কর্ত্তব্য পথে,
শিক্ষিত জীবন ব্রতে,
এ মোর হৃদয়, প্রভু, কিবা হবে তার?
ফুরাবে কি কান্না হাসি,
নিবিবে আলোক রাশি,
যাবে সুখ যাবে দুঃখ, আলোক আঁধার?
শেষ মৃত্যু—তারপর কি রবে আমার?

(৪)

স্বপ্ন যদি সুখ ভোগ,
স্বপ্ন যদি পরলোক,
স্বপ্ন যদি, স্বপ্নরাজ্য করিছে বিস্তার;
কেন তবে ভুলে থাকি,
কেন বা জীবন রাখি?
কেননা আপনি করি আপনা সংহার?
হাসি বিসর্জ্জিব হেসে?
স্নেহ প্রীতি যাবে ভেসে?
যাবে ডুবে হৃদয়ের কামনা আমার;
স্বপ্ন যদি, স্বপ্ন রাজ্য করিছে বিস্তার?

(৫)

হোক্ স্বপ্ন, হোক্ মায়া,
হোক্ ভ্রান্তি, হোক্ ছায়া,
তবুও বাঁচিতে চিতে অপার বাসনা।
চক্ষু জলে গণ্ড ভাসে,
বক্ষ কাঁপে দুঃখ ত্রাসে,
তবুও ঘোচেনা যেন প্রাণ উপাসনা।
কর্ম্ম অন্তে অনুতাপ
পাদক্ষেপে বাড়ে পাপ
প্রতারিত আশায় সে লোলুপ রসনা;
তবুও বাঁচিতে চিত্তে অপার বাসনা।

(৬)

ইচ্ছা তব ইচ্ছাময়,
ক্ষুদ্র কীট (ও) বেঁচে রয়;
হোক্ তব ইচ্ছা পূর্ণ আমিও বাঁচিব।
কিন্তু প্রভু, কিবা লক্ষ্যে,
রয়েছি ধরণি-বক্ষে?
একবার সেই কথা কহগো শুনিব।
নতুবা জীবন ব্রতে,
গুরু কর্ত্তব্যের পথে,
আঁধারে হারায়ে পথ কেমনে চলিব?
হোক তব ইচ্ছা পূর্ণ আমিও বাঁচিব।

(৭)

দুঃখ শোক যত হোক্,
নাই থাক্ পরলোক,
যা হোক্ তা হোক্ বিধি তোমার বিধান;
তাই মাথা পেতে লই,
দুঃখেই বাঁচিয়া রই,
নাই বুঝি, কি লক্ষ্যের করিছি সন্ধান;
তোমারি, তোমারি রাজ্যে,
আছি প্রভু তব কার্য্যে,
হোক্ মৃত্যু, হোক ক্লেশ, বিনাশ, নির্ব্বাণ,
যা হোক্ তা হোক্ বিধি তোমার বিধান।

শ্রীবিজয় চন্দ্র মজুমদার।

ভারত কন্‌গ্রেস্ ইংলণ্ডের ক্রোড়ে।

"Well begun is half won.'

১৪ই এপ্রেল ১৮৯০, ভারত ও ইংলণ্ড উভয় দেশের পক্ষে বিশেষ আনন্দ ও গৌরবের দিন। পৃথিবীর ইতিহাস লেখকগণ স্বর্ণাক্ষরে লিখুন যে, এই শুভদিনে ভারতের হৃদয়রাজ্যে ইংলণ্ডের উজ্জ্বল সিংহাসন চিরদিনের জন্য স্থাপিত হইবার সূত্রপাত হয়। আমাদের জাতীয় কন্‌গ্রেস এতদিন গর্ভাবস্থায় হাত পা নাড়িতেছিল, আজ প্রসূত হইয়া সংসারের আলোক দেখিল। গর্ভ মধ্যে ভ্রূণজীবন নষ্ট হইবার অনেক আশঙ্কা থাকায় আমরা সর্ব্বদা সশঙ্কিত ছিলাম; এখন আর ভয় নাই; স্বাধীনতার জননী শ্বেতদ্বীপ স্বয়ং ধাত্রীরূপে নব প্রসূত শিশুর পোষণের ভার গ্রহণ করিলেন। এস ভাই ভারতবাসি, আজ এই মহানন্দের দিনে প্রাণ ভরিয়া কোলাকুলি করি, এবং অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে আকাশ পাতাল কাঁপাইয়া সুগভীর রবে তিনবার বলি, "জয় দয়াময়!" "জয় দয়াময়!" "জয় দয়াময়!" ঘরে বাহিরে প্রবল শত্রু সত্ত্বেও যাঁহার কৃপায় প্রাণের কন্‌গ্রেস ইংলণ্ডের নগর সুপটুও পালনক্ষম হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, তাঁহার করুণার সীমা ও পরিমাণ নির্দ্দেশ করে সাধ্য কাহার? বিধাতার অনন্ত দয়ার প্রভাব আমাদের ন্যায় হতভাগা জীবগণের একমাত্র সম্বল ও ভরসাস্থল। তাই বলি ভাই, "দুর্ব্বলে সবলে যাঁর, অবারিত কৃপাদ্বার, নিরাশ না হবে কেহ, রাখরে নির্ভর তাঁতে।" ভারতের দুঃখ বিমোচন জগদীশ্বর ভিন্ন আর কেহ করিতে পারেন না।

"ভগবান বিচার করিবেন," এই গভীর মর্ম্মভেদী জীবন্ত নির্ভরশীলতা ভিন্ন কাঙ্গাল অসহায় ভারতবাসী আর কোন উপায় জানে না। রাজপুরুষের উৎপীড়ন, জমীদারের উৎপীড়ন, গ্রামের ভদ্র লোকদের উৎপীড়ন, উৎপীড়নের উপর উৎপীড়ন সহ্য করিয়া 'রাইয়ত' চলিয়া যাইতেছে, একটী শব্দ নাই, প্রতিবিধানের কোন চেষ্টা নাই; ভারতে গরিব দুঃখী "চাষাভূষোর" সহিষ্ণুতার নিকট মেষশিশুও সময়ে সময়ে পরাস্ত হয়। চারি কোটী জীব, যাহারা আমাদের ভরণপোষণ, সুখ সচ্ছন্দতা, আরাম আমোদের জন্য দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়াও দিনান্তে একবার বই দুই বারকার শাকান্ন জুটাইতে পারে না; সহস্র অত্যাচারেও যাহাদের মুখে রা নাই; দুর্ভিক্ষ কালে অন্নাভাবে সপরিবারে প্রাণ দিবার পূর্ব্বেও একবার রাজা জমীদার বা মহাজনকে অভিসম্পাত করিতে জানে না, কেবল মাত্র বিধাতার বিধানের দিকে তাকাইয়া দুর্লভ মানবজীবন বিসর্জ্জন করে; আমরা তাহাদের প্রতি উদাসীন,—একথা শুনিয়া ইংরেজ শিহরিয়া উঠেন, "shame" "shame" ধ্বনি দ্বারা ধিক্কার দেন। বাস্তবিক যে দেশে এত অধিক সংখ্যক নিরীহ, শান্ত-সেবক শ্রমজীবীর এরূপ দুর্দ্দশা, সে দেশ রসাতলে যায় না কেন, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। মহারাজা! রাজা! রায় বাহাদুর! বাবুগণ! ক্ষীর-সর-নবনীত ভোজনে মেদবৃদ্ধিকরত আলস্যের ক্রীতদাস হইয়া সুগন্ধচর্চ্চিত সুকোমল শয্যায় সুখে নিদ্রা যাইতেছে; একবার ভাব না যে,

তোমাদের ভীষণ অত্যাচারে ভিত্তি ক্রমে ফোঁপ্‌রা হইয়া আসিতেছে; কোন দিন সপ্ত-তল অট্টালিকা হীরা-মাণিক-মুক্তা-কোম্পানির কাগজভরা লোহার সিন্দুক সহ ঝুপ্ করিয়া তোমাদের ঘাড়ে চাপিয়া পড়িবে। আর্য্যানার্য্য প্রভেদের কাল নাই, কলিযুগের আর্য্য ইংরেজ, আর তোমরা সবাই সমান অনার্য্য, সুতরাং গরিব, দুঃখী, চাসা, শ্রমজীবী সকলকে আপনার জাত্‌ভাই মনে করিয়া নিজের কল্যাণের ন্যায় তাহাদের কল্যাণে যত্নবান হও; নচেৎ ভদ্রস্থ নাই। উল্লিখিত নির্ব্বাক আত্মত্যাগীদিগের (Martyrs) অন্তর্বেদনা বিশ্বেশ্বরের সিংহাসন পার্শ্বে পৌঁছিয়াছে; ইহাদের দুঃখ ক্লেশ দূরীকরণ জন্যই কন্‌গ্রেসের আবির্ভাব; হোমরা চোম্‌রা বাবুদের রাজদরবারে বিপুল ক্ষমতা হইয়া নিরক্ষর শ্যালক পুত্রকে ডিপুটিগিরি জোগাড় করিয়া দিবার জন্য নয়। ভাই সরল কৃষক! তোমার জন্য চক্ষের জল ফেলে, তোমার প্রকাণ্ড দেশে এমন কেহ নাই, কিন্তু এথানে আছে; সহ্য কর, ভগবান্ অবশ্য দিন দিবেন। ভারতোদ্ধার-ব্রতধারী মহামনা কন্‌গ্রেসাবতার দয়াল হিউম যখন দেশের চারি কোটী ব্রিটীশ প্রজার অন্নবস্ত্রাভাবের কথা ইংরেজ-মণ্ডলীর গোচর করিলেন, সাধারণ মজুর পর্য্যন্ত "ছি! ছি! ছি! ছি!" করিয়া উঠিল।

কনগ্রেসের সাহার্য্যার্থে ইংলণ্ডে প্রথম সভা।—বিগত ১৪ই এপ্রেল সোমবার দিবস লণ্ডনের অন্তর্গত Clerkenwell পল্লিস্থ **Foresters' Hall** গৃহে রাত্রি ৮৷৷০ সাড় আট ঘটিকার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভাপতি Sir William Wedderburn আন্তরিক ভাবে যথাবিহিত মিষ্ট কোমল স্বরে এই কয়েকটা কথা "The humblest Roman citizen had the right of appeal to Cæsar, and in India a considerably larger population than that of the Roman Empire now desire to appeal to their Cæsar, the sovereign British people." * দ্বারা ভূমিকা করিয়া সংক্ষেপে ভারতের অভাব, কনগ্রেসের মহৎ উদ্দেশ্য ও তৎপ্রেরিত উপস্থিত প্রতিনিধির পরিচয় দিয়া দিলে বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যথাসাধ্য পরিস্ফুট ভাষায় তাহার কর্ত্তব্য সাধন করিলেন। "Righteousness exalt th a nation":—কেবল পুণ্য প্রতাপ জাতীয় উন্নতির কারণ। এবং "No taxation without representation.":—প্রজা প্রতিনিধির সদ্ভাব ব্যতীত কর নিদ্ধারণ অন্যায়।—এই দুইটী মৌলিক সূত্রের উপর দাঁড়াইয়া শ্রোতৃবর্গের সাহায্য যাচিত হইল। প্রথমটী "বলং বলং ব্রহ্ম বলং," ধর্ম্ম রাজ্যের কঠোর সত্য; জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতির ইতিহাস তাহার জীবন্ত সাক্ষী। জনবুল এই মহা সত্য বিলক্ষণ জানেন ও বুঝেন। সভা ভঙ্গের পর জনৈক প্রবীণ ইঙ্গ-বন্ধু স্পষ্ট বলিলেন, "It is not policy, or extent of dominion, or supremacy on land

* অতি সামান্য রোমান প্রজাও তাহাদের সম্রাট সিজারের নিকট আবেদন করিতে অধিকারী ছিল। রোমান সাম্রাজ্য অপেক্ষা বহু পরিমাণে অধিকসংখ্যক ভারতবর্ষীয় প্রজা আজ তাহাদের সিজার, সর্ব্বময় কর্ত্তা, ব্রিটনবাসীর নিকট দুঃখ জানাইয়া অভিযোগ করিতে উপস্থিত।

and on sea, that is the stability of a nation, but righteousness"—কল কৌশল, রাজ্য বিস্তার, বা জলে স্থলে একাধিপত্য জাতীয় সমৃদ্ধি অটুট রাখিতে না, কেবল পুণ্যবল পারে। আর একজন বলিলেন, It is only in righteousness that the throne of kings is established"—কেবল মাত্র পুণ্য তেজে রাজার সিংহাসন দৃঢ়রূপে স্থাপিত হইয়া থাকে।

বন্দ্যো মহাশয়ের পরে সুবিখ্যাত দেশ হিতৈষী বৃদ্ধ দাদা ভাই নাওরোজি শান্ত সমাহিত ভাবে কিছুক্ষণ বলিলেন। ক্রমান্বয়ে পাঁচ ছয় জন ইংরেজ ও অবশেষে প্রসন্ন বদন প্রশস্তাত্মা মহামতি হিউম দুই চারি কথায় হৃদয়ের গভীর সহানুভূতি প্রকাশান্তর দুঃখ প্রপীড়িত ভারতের প্রকৃত অবস্থা ও অভাব সভার গোচর করিতে চেষ্টা পাইলেন। বক্তৃতাদির মধ্যে "Black man" কথা লইয়া সচিব প্রধান সল্‌সবারি (Marquis of Salisbury) মহাপ্রভুকে অনেকবার বিদ্রূপ করা হয়; এক জন বলিলেন, "Perhaps the noble Marquis has not used a looking-glass for the last ten years, as otherwise he would have known which of them is the darker" (বোধ হয় মারকুইস্ মহাত্মা দশবৎসর হইতে দর্পণ ব্যবহার করেন নাই, নতুবা দেখিতে পাইতেন, উভয়ের মধ্যে কে অপেক্ষাকৃত শ্যামবর্ণ।)। বাস্তবিক দাদা ভাইকে ইউরোপীয় বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। অনেক ইংরাজকেও একথা বলিতে শুনিয়াছি। যাহা হউক, পল্লিস্থ প্রজাবর্গের উহার প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ পাইল। ইহা আমাদের সুখের বিষয়।

প্রচণ্ড উৎসাহ ও বিশেষ আনন্দের সহিত সভা দ্বারা নিম্নলিখিত নির্দ্ধারণ স্থিরীকৃত হইল। ইহা পরম শুভ চিহ্ন জানিতে হইবে। কৃপা ভগবানের।

RESOLVED

"That this meeting of the inhabitants of the Finsbury Division and its neighbourhood, having heard the grievances of the Indian people stated by representative Indians and by others, and having had laid before it the reforms put forward by the Indian National Congress, declares that in its opinion the grievances from which our Indian fellow subjects are suffering should be removed, and believes that the reforms advocated by the Congress will be greatly helpful to this end This meeting therefore expresses its most cordial sympathy with the efforts which, by its constitutional means, the Indian people are making to obtain the redress of their grievances through the good will and help of the British people, and those present pledge themselves, by every means in their power, to move the British Parliament to grant the reforms so temperately and so forcibly advocated

That this meeting authorises the chairman to sign a petition for presentation to the House of Commons, praying that House to allow of the insertion in the Indian Councils' Bill of a section permitting the election of one half of the members of the Supreme and Provincial Legislative Councils, and of a large increase in the numbers of the respective Councils."

অর্থাৎ সভাস্থ প্রজাবর্গ ভারতের দুঃখ মোচন জন্য পার্লামেণ্টে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে বাক্‌বদ্ধ হইলেন। আমাদের দগ্ধ অদৃষ্টের পক্ষে ইহা কম সৌভাগ্যের বিষয় নহে; এবং প্রথম উদ্যোগে এরূপ আশা পাওয়া, প্রবল উৎসাহের কথা সন্দেহ নাই।

ইহাতে সুলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে, জানিতে হইবে।

যত লোকের সহিত এবিষয়ে আলোচনা হইয়াছে, দুই জন ভিন্ন কাহাকেও কোন আপত্তি করিতে শুনি নাই ঃ—এক ব্যক্তি জড়বুদ্ধি বৃদ্ধ রক্ষণশীল (conservative), অপর ভারত-ফেরত বোম্বাই প্রদেশের জনৈক ভূতপূর্ব্ব কমিশনর। প্রথমের আপত্তি, ভারতে নানা জাতি ও নানা ধর্ম্ম সত্ত্বে পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষভাব অনিবার্য্য; এক্ষেত্রে প্রজার হস্তে কোন প্রকারের কোন ক্ষমতা বা ভার দেওয়া অসঙ্গত, অন্যায় ও অহিতকর, মুসলমান সম্প্রদায়ের বিপক্ষতা বিশেষ বিবেচ্য; সুতরাং বর্ত্তমান ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকাই বিধেয়। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলেন, অতি সামান্য সংখ্যক শিক্ষিত লোক ব্যতীত সমস্ত প্রজা পশু (brute) বলিলে দোষ হয় না; তাহাদের পক্ষে "নির্ব্বাচন" "ভোট" ইত্যাদি শব্দের অর্থ বুঝিতে এখনও বহুকাল বাকী। উদাহরণ স্বরূপ বলিলেন, কয় বৎসর হইল সুরাটের লোকাল বোর্ড (Local Board) নির্ব্বাচনের সময় ভোটের জন্য গরুতাড়া করিয়া মামলতদারগণকে প্রজা (voter) একত্র করিতে হয়; সে দৃশ্য মনে পড়িলে এখনও হাসি পায়। উভয়ের আপত্তিই প্রবল; সম্যক খণ্ডন করা সহজ নয়। এ অবস্থায় ঘর ঠিক করা নিতান্তই কর্ত্তব্য। যদি কেহ বলেন, যদি ঘরই ঠিক করা যাইবে, তবে বিদেশীয়ের মুখাপেক্ষার প্রয়োজন কি? ইহারও উত্তর দেওয়া কঠিন। সুতরাং এই খানে বিজ্ঞ পণ্ডিতের মত উল্লেখ করিয়া নিস্তব্ধ হইতে হইল।

"It is the beginning of a movement which our generation will not see the end of, but which must be fraught with momentous consequences for England and India alike. Whether they shall prove alike happy for both lands, or shall be disastrous to either or to both, depends upon the wisdom, patience, and forbearance, which are mutually practised.

* * * *

We English people have now such an opportunity as no other people has ever had of setting to the world an example of high minded, disinterested, straight dealing. Upon the way in which we meet the demands of India, upon the plan we adopt for the future government of the Empire, upon our justice, patience, and temperance, during the next few short years, not only the future of India but that of England herself, and, in no small measure, of the civilized world, depends. In this matter our national honour is deeply pledged. Our lot is in our own hands. God grant that we may be wise and just whilst yet there is time!"

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

ভুলি।

অনেকেই জানেন, আমাদের মধ্যে বাঘভুলি শব্দ দ্বারা কি বুঝাইয়া থাকে। বাঘ, সিংহ প্রভৃতি বিড়াল জাতীয় জীবের লোম যে অধিক পরিমাণে বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন, তাহাও বোধ হয় বিজ্ঞান-শিক্ষার্থী মাত্রেই অবগত আছেন। এই বিপুল বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা হিংস্র জন্তুগণ তাহাদের ভক্ষ্যজীবগণকে আচ্ছন্ন করিয়া আয়ত্তাধীন করে, বা

অন্য কোন অজ্ঞাত শক্তি তাহার কারণ, সে বিষয়ের বিচার বা অনুসন্ধান, এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয়। বৈজ্ঞানিক সুপণ্ডিত মহোদয়গণ কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ কতকগুলি প্রকৃত ঘটনা পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া তাহাদের অনুসন্ধিৎসা বৃত্তির উত্তেজনা করাই অভিপ্রায়।

ডাক্তার বার্ড (Dr Bird) বলেন :— আমেরিকায় দুইটী বালক বনে ভ্রমণ করিতে করিতে একটা বড় কৃষ্ণসর্প দেখিতে পায়। উক্ত বিষধরের বিখ্যাত মোহিনী শক্তি পরীক্ষা করিবার উদ্দেশে এক জন তদ্দিকে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া এক স্থানে দাঁড়াইয়া উহার পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকে। বালককে ঐ অবস্থায় দেখিয়া সর্প সতেজে মস্তকোত্তোলন করিয়া তাহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। বালকের বর্ণনানুসারে, রৌদ্রে আরসি ধরিলে যেমন একটা তীব্র আলোক প্রতিফলিত হয়, সেইরূপ ঝকমকে একটা জ্যোতি যেন তাহার চক্ষে পড়ে।* তদ্দ্বারা তাহার চক্ষু ঝলসাইয়া গেলেও সঙ্গে সঙ্গে এমন মনোহর বর্ণ সমূহের সমাবেশ সম্মুখে শোভমান হয় যে, সে সৌন্দর্য্য বিমুগ্ধ ভাবে অজ্ঞাতসারে নাগের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে আরম্ভ করে, এবং প্রত্যেক পাকে তাহার নিকটতর হইতে থাকে। এই ব্যাপার দেখিয়া দূরস্থ মানুষ দৌড়িয়া আসিয়া তাহাকে ধরে ও সর্পকে গুলি করিয়া মারে।

পণ্ডিতবর কাম (Professor Kalm) বলেন, উত্তর আমেরিকার ঝুনঝুনি সর্প (rattle snake), গাছের তলা হইতে শাখাস্থ কাষ্ঠমার্জ্জারকে আচ্ছন্ন করে। সর্প উহার দিকে দৃষ্টি স্থির করিলে আর উহার পলাইবার ক্ষমতা থাকে না, শোক-সূচক চিৎকার করিতে করিতে গাছের উপর দিকে কিছু দূর উঠিয়া আবার নীচে নামে; ক্রমাগত এইরূপ করিতে থাকে, কিন্তু প্রত্যেকবার কিছু কিছু করিয়া নীচের দিকে অগ্রসর হয়। এ যাবৎকাল সর্প আপন আসন ও শিকারের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিয়া একরূপ সংযত (concentrated) চিন্তাবস্থায় থাকে যে, মানুষ কাছে দাঁড়াইয়া ভয়ানক শব্দ করিলেও তাহাকে এক তিল বিচলিত করিতে পারে না। অবশেষে কাঠ বিড়াল লাফাইয়া নীচে পড়ে এবং আর একবার মর্ম্মভেদী চিৎকার করিয়া দ্রুতগতিতে সর্পের ব্যাদনীকৃত মুখের ভিতর প্রবেশ করে।

ফরাসি প্রকৃতি তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত কাতেস্‌বি (Mark Catesby) তৎপ্রণীত কার লিনা প্রভৃতি দেশের বৃত্তান্তে বহু শ্রেণীর পর্য্যটকের প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে, নানাবিধ ক্ষুদ্র জীব বিশেষ পক্ষী ও কাঠবিড়াল অনেকস্থলে উল্লিখিত রূপে সর্প দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে। ইহার বহু পরে সুইডেন দেশীয় সর্প বিদ্যাবিশারদ আক্রেল (John Gust of Acrell) তাঁহার Morsura Serpentum নামক গ্রন্থে উক্ত বিষয় সম্যক সমর্থন করিয়া একটী নূতন উদাহরণ দিয়াছেন। একটা

* এডিনবরা (Edinburgh) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব রসায়ণ শাস্ত্রাধ্যাপক ডাক্তর গ্রেগরি (William Gregory M D F R S E) বলেন জর্ম্মন পণ্ডিত রাইকেন বাকের (Professor Reichenbach) সুপ্রসিদ্ধ গবেষণার বহুপূর্ব্বে সংসার জানিত যে, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় দেহগত রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে একরূপ জ্যোতি (Mesmeric or Odylic light) বাহির হয়। সম্ভবতঃ ইহাও তাহার ন্যায়।

ঝুনঝুনি সর্পের লৌহ পিঞ্জর মধ্যে একটী মূষিককে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। উহা প্রথমে সর্পের বিপরীত দিকের কোণে আশ্রয় গ্রহণ করে। পরে সর্প ভয়ঙ্কর তেজের সহিত তাহার উপর দৃষ্টি স্থির করিলে কম্পমান ইঁদুর লম্ফ প্রদান করত ফণীর মুখ মধ্যে আত্ম বিসর্জ্জন করে। লসন (John Lawson, Surveyor General of North Carolina) উত্তর কারলিনার বিবরণে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ঝুনঝুনি সর্পের দ্বারা কাঠবিড়ালকে বিমুগ্ধ ভাবে আকৃষ্ট হইতে তিনি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

ফর্ব্‌স (Captain Forbes) Dahomey and the Dahomans গ্রন্থে বলেন:— আফ্রিকার অন্তর্গত আহোমী প্রদেশের ঘাসের জঙ্গলে তাঁহার পায়ের একেবারে নিকটে একটা গিরগিটীর ন্যায় সরীসৃপ মন্ত্রমুগ্ধ ভাবে স্থির দৃষ্টিতে স্থিত দেখিতে পান; এরূপ সংজ্ঞাহীন যে তিনি অতি নিকটে যাওয়াতেও একটু মাত্র নড়িল না। সেই মুহূর্ত্তেই একটা গোখরা সাপ তাহাকে ছোবল মারিয়া লইয়া গেল।

পাদরি ইলিস(Ellis)তাঁহার Three visits to Madagascar নামক গ্রন্থে পুলেন সাহেবের (Farmer Mr Pollen, ইনি অনেক দিন মাদাগাস্কার দ্বীপে কাটাইয়াছিলেন) বর্ণনানুসারে প্রকাশ করিয়াছেন,—তাঁহার ক্ষেত্রে একদা একটী মূষিক অনতিদূরে একটা বিষধর সর্প দেখিতে পায়; দৃষ্টিমাত্র স্থির হয় এবং সর্প তাহার দিকে তীক্ষ্ণ কটাক্ষপাত করিলে কাঁপিতে কাঁপিতে ও চিৎকার করিতে করিতে তদ্দিকে ধীরে ধীরে চলিতে থাকে; পরে একেবারে নিকটে উপস্থিত হইয়া অবসন্নভাবে অচল হয়, এই সময় সর্প তাহাকে গ্রাস করে। আর এক সময়, এইরূপ গ্রস্ত একটী ইঁদুরকে তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন। গ্রাস করিবামাত্র যষ্টি দ্বারা সর্পপৃষ্ঠে আঘাত করিলে ফণী মুখব্যাদন করত আহারকে ত্যাগ করে, শক্রমুখ হইতে নির্গত মূষিক কিছুদূর দৌড়িয়া গিয়া অবসন্ন হয়, কিন্তু এক মিনিট কাল পরেই সুস্থ হইয়া পলায়ন করে। শুদ্ধ ভয়ে আচ্ছন্ন হইলে এরূপ নির্গমন ও পলায়ন অসম্ভব।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রসিদ্ধ প্রাণীতত্ত্ববিৎ ডাক্তার স্মিথ(Dr Andrew Smith) বলেন, তিনি নিজে এরূপ অনেক ব্যাপার প্রত্যক্ষ প্রমাণাদি দ্বারা রীতিমত গবেষণা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, কোন অবর্ণনীয় শক্তি দ্বারা এক জীব আর এক জীবকে আচ্ছন্ন করত আকর্ষণ করিতে পারে। তাহার একটী উদাহরণ এইঃ— (Bucephalus capensis) পাখী ধরিবার জন্য সচারচর বৃক্ষারোহণ করে, উহাকে দেখিবামাত্র বৃক্ষস্থ বিহঙ্গ সমূহ তাহার চারিদিকে জড় হইয়া ব্যস্ততা প্রকাশ ও চিৎকার করিতে থাকে এবং দলমধ্যে যেটী সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আচ্ছন্ন, সেইটী সর্পের মুখের মধ্যে প্রবেশ করে। এযাবতকাল ভুজঙ্গ সমস্ত শরীর ডাল জড়াইয়া, আধ হাত, তিনপোয়া মস্তক উন্নত করত মুখব্যাদন করিয়া স্ফীতকণ্ঠে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে থাকে।

তাঁহার Zoology of South Africa তে ডাক্তার স্মিত প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষীকৃত এই পক্ষী-সর্প ব্যাপার ব্যতীত মৃগাদি চতুষ্পদ জন্তুগণকে কুম্ভীর দ্বারা এই প্রকারে আচ্ছন্ন ও বিনিষ্ট হইতে শুনিয়াছিলেন। ফরাসি পণ্ডিত Le Vaillant তাঁহার Disc-

aux d' Afrique পুস্তকে সর্পদ্বারা এবম্প্রকারে মূষিক ও পক্ষী নাশের কতিপয় উদাহরণ প্রকাশ করিয়াছেন।

১৮৫২ খ্রীঃ অব্দে লণ্ডন নগরস্থ জুওলাজিকাল বাগানে একটী বিষঘ্ন ঔষধীর পরীক্ষা হেতু ইবান্স সাহেব (D F Evans) দ্বারা কতকগুলি প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াতে যতদূর যত্ন ও সতর্কতা আবশ্যক, তাহা অবলম্বন করিতে তিনি ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার রিপোর্টে জানা যায় যে, শিকারের পলাইবার কোন প্রকার সম্ভাবনা না থাকিলেও সর্প উন্নত শির গ্রীবায় আসন স্থির ও ফণা বিস্তার পূর্ব্বক দণ্ডেক কাল তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য দ্বারা আহারীয় জীবকে নিস্পন্দ না করিলে আঘাত করেনা। আর শিকার (ছোট ছোট গিনিশূকর, খরগোশ, ইন্দুর প্রভৃতি; তন্মধ্যে কেহ কেহ হয়ত ইতি পূর্ব্বে সর্প কখন দেখে নাই) খাঁচার মধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র দুঃখব্যঞ্জক চিৎকার ও চঞ্চলতা প্রকাশ করে; পরে সর্প দৃষ্টির অধীন হইলে জড়বৎ নিস্পন্দভাব অবলম্বন দ্বারা আত্মত্যাগ করে। Zoologist পত্রে সর্প সম্বন্ধে অনেক দৃষ্টান্ত আছে। অন্যান্য জন্তুর বিষয় কিরূপ প্রমাণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, দেখা আবশ্যক।

১৮৩৬ খ্রীঃ অব্দের অক্টোবর মাসের Bengal Sporting Magazine পত্রে উত্তর পশ্চিম প্রদেশান্তর্গত গোরক্ষপুর হইতে একজন সাহেব লেখেন,—বাঙ্গালায় একটা মধ্যমাকৃতির গিরগিটি কর্ত্তৃক আচ্ছন্ন হইয়া একটী প্রজাপতি ক্রমে ক্রমে তাহার মুখ মধ্যে প্রবেশ করে। যে ভাবে সরীসৃপ স্থির দৃষ্টি দ্বারা উড্ডীয়মান পতঙ্গকে আপন আয়ত্তাধীনে আনিয়াছিল, তাহাতে লেখকের মনে সেই অবধি ভুলি সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ থাকে নাই। আমরাও দেশে অনেকবার দেখিয়াছি, ঘরের দেয়ালে টিকটিকির দ্বারা মাছি এই রূপে আক্রান্ত হইয়াছে।

মধ্য প্রদেশস্থ নাগপুর নগরে ১৮৪৭ খ্রীঃ অব্দে হন্টর সাহেব (Robert Hunter) ও তাঁহার বন্ধু পাদরি হিস্লপ (Rev Hislop) দ্বারা পরিদৃষ্ট একটী ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ Zoologist পত্রিকায় প্রকাশ হয়। তাহাতে বিচ্ছুর (কর্কট) দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া তিন চারিবার পতন ও উত্থানের পর একটী প্রকাণ্ড ডাঁশ মক্ষিকা শত্রু গ্রাসে আত্ম সমর্পণ করে।

অর্মিন (Ermine- উদ্‌বিড়ালের মত জীব) কর্ত্তৃক খরগোশাদি ও খেঁকশেয়ালি কর্ত্তৃক কুক্কুটাদি একরূপ প্রকারে বিনষ্ট হওয়ার বৃত্তান্ত অনেক আছে। বণ্ড সাহেব (Henry Bond) Zoologist পত্রিকায় প্রকাশ করেন;—একদা ইংলণ্ডের অন্তর্গত সোমারসেট শায়রস্থ পেনবেক (Penbeck) গ্রামে বিচরণ করিতে করিতে (১৮৬০ অব্দে) কোন ক্ষুদ্র জন্তুর চিৎকার শুনিতে পান এবং শব্দের অনুগমন করিয়া দেখেন, অর্মিন কর্ত্তৃক আচ্ছন্ন হইয়া বিকৃত ধ্বনি করত একটী রাবিট (rabbit) তাহার চারি দিকে ধীরে ধীরে ঘুরিতেছে; এবং প্রত্যেক পাকে নিকটতর হইতেছে; এবং উহার গতির সঙ্গে সঙ্গে অর্মিনও মাথা ঘুরাইয়া শিকারের প্রতি দৃষ্টি ঠিক রাখিতেছে। সাহেব হস্তস্থিত যষ্টিদ্বারা সজোরে মৃত্তিকায় আঘাত করাতে যাদুকরের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া যাদুভঙ্গ হওয়ায় রাবিট বেচারি তৎক্ষণাৎ সোজা দৌড় মারিয়া প্রাণ রক্ষা করিল।

উক্ত পত্রিকায় গর্নি সাহেব (J. H. Gurney) প্রকাশ করেন;—কোন সময়ে স্বর্ণ ইগল (Golden eagle) পক্ষীর খাঁচার মধ্যে একটী রাবিট ছাড়িয়া দেওয়া হয়। প্রবেশ মাত্র ইগল তাহার প্রতি দৃষ্টি স্থির করিলে রাবিট পক্ষীর প্রতি চক্ষু রাখিয়া চারিদিকে ঘুরিতে থাকে ও ক্রমে নিকটস্থ হয়। ইগলও আপন আসনে ঠিক থাকিয়া চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে থাকে। একেবারে সম্মুখে উপস্থিত হইলে রাবিট পশ্চাৎপদে দাঁড়াইয়া পক্ষীর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে। এই সময়ে লোভপরবশ ইগল তাহার উপর ঝম্প প্রদান করিলে যাদু ভঙ্গ হয় ও রাবিট প্রাণ ভয়ে বিপরীতদিকে দৌড়ে; কিন্তু খাচায় আবদ্ধ, সুতরাং ইগল হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয়।

পতঙ্গের অনলে পতন কাহারও অবিদিত নাই। অগ্নির শোভা যে পতঙ্গকে আচ্ছন্ন করিয়া আকৃষ্ট করে, তাহাতে সন্দেহ নাই। উপরোক্ত ঘটনাবলীর সহিত আলোক বা বহ্নি-ভুলির কোন সংশ্রব আছে কি না, বলা যায় না; কিন্তু ক্ষুদ্র টিট মাউস (Titmouse) পক্ষী ও বৃহৎ হেরিংগল (Herring-gull) আলোক দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নষ্ট হইয়াছে, এদেশের পত্রাদিতে এরূপ প্রকাশ আছে। স্কটলণ্ড দেশের সমুদ্র তীরস্থ বেলরক (Bellrock) বাতিঘরের (Light house) দীপ একদা হেরিংগল কর্তৃক চূর্ণ বিচূর্ণ হয়, এবং এক খণ্ড বেলওয়ার গলায় প্রবিষ্ট হওয়ায় তাহার মৃত্যু হয়।

যে ভাবেই আচ্ছন্ন হইয়া এক জীব অন্যের মুখে পতিত হউক, হিংস্র জন্তু দ্বারা আক্রান্ত হইলে মৃত্যু কালীন যে কোনরূপ দুঃখ উপস্থিত না হইয়া বরং এক প্রকার আমোদদায়ক অবসন্ন ভাব ("pleasurable paralysis of the animal powers") শরীর মনকে অধিকার করে, এবং কি প্রকারে গ্রস্ত হইবে এ সম্বন্ধে এক অভিনব ঔৎসুক্যের প্রফুল্লতা উপস্থিত হয়, সে বিষয়ে বিস্তারিতরূপে বিশেষ সাক্ষী দিয়াছেন দুইজন;—আফ্রিকার সিংহ কবল হইতে মুক্ত বিখ্যাত ডাক্তার লিভিংষ্টোন এবং সুন্দরবনের ব্যাঘ্র দ্বারা আক্রান্ত, নীত ও পরিশেষে ত্যক্ত আর একজন সাহেব। মহাত্মা লিভিংষ্টোনের একটী হস্ত ও স্কন্ধ সিংহ দন্ত দ্বারা বিলক্ষণ আহত হয়, দ্বিতীয় ব্যক্তি বিনা আঁচড়ে রক্ষা পান; কিন্তু উভয়েই, নেশার ঘোরের প্রফুল্ল চিত্ততার মত, ক্লোরোফরম দ্বারা অর্দ্ধ অচেতনীকৃত অবস্থার ভাব ব্যাখ্যা করেন।

শ্রী চন্দ্রশেখর সেন।

বঙ্গবাসী ও অনাচরণীয় হিন্দু।

ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় যে সকল সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়, তন্মধ্যে "বঙ্গবাসী" অপেক্ষা কাহারও কাট্‌তি অধিক আছে কি না, জানি না। যদি বঙ্গ-বাসীর নিজের কথা বিশ্বাস করা যায়, তবে তাহার গ্রাহক সংখ্যা ৩০,০০০ হাজারের কম নহে, এবং ন্যূনকল্পে গড়ে একখানি কাগজ ৪ জনে পাঠ করিলে, পাঠকের সংখ্যা লক্ষাধিক হইবে।

সুশিক্ষিত সমাজে বঙ্গ-বাসীর প্রবেশ

ও প্রতিষ্ঠা অল্প হইলেও যে সমাজে "বিদ্যা-সুন্দর" ও "কালাচাঁদ" উপাদেয় জিনিষ, সে সমাজে বঙ্গ-বাসীর প্রভুত্ব দেখে কে? বিশেষতঃ বঙ্গ-বাসী অপেক্ষা বঙ্গবাসীর "কাণ্ড" অধিক; এই কাণ্ডপ্রিয় দেশে সে আকর্ষণ বড় নহে। তার পর, বঙ্গবাসীর মধ্যে একটুক জিনিষ আছে, তাহা বড় খাটী—সেটুকু প্রাচীন বয়সের আফিঙের তুল্য—তাহার ঝোঁকেও বঙ্গবাসীর আড্ডায় অনেক সেকেলে রকমের উকীল মোক্তার ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গড়াগড়ি হইয়া থাকে। সেই আফিঙটুকু ধর্ম্মচ্ছলে বাবু নিন্দা। বাবুগণ ত নিন্দার পাত্রই বটে; কেন না, অবাবুগণ দেশে যত কীর্ত্তিকর কার্য্য করিযাছেন; বাবুগণ তাহার কিছুই করিতে পারেন নাই!

কিন্তু কেবল নব্যভারতের বাবুগণকে বঙ্গবাসীর করালকবল হইতে রক্ষা করার জন্য এ প্রবন্ধ নহে। বঙ্গ দেশের বৈদিক ও কোরাণী হিন্দুর লক্ষাধিক লোকে যে কি খাদ্য খায় এবং তাহাতে তাহাদের ইষ্টানিষ্টের সম্ভাবনা আছে কি না, এ প্রবন্ধে তাহাই প্রদর্শন করার যত্ন করা যাইবে।

অনেকের বিশ্বাস আছে, বঙ্গ-বাসী "হিন্দুর মুখপাত্র।' বঙ্গবাসী নিজেও ইহা ঘোষণা করিয়া থাকেন। তারকেশ্বরের মোহন্তের বিরুদ্ধে ব্যর্থ চীৎকারেই যদি "হিন্দুধর্ম্মের মুখপাত্র" হওয়া যায়, তবে হিন্দুর মুখপাত্র হওয়া বড় কষ্টকর ব্যাপার নহে। বাস্তবিক পক্ষে হিন্দুজাতি যে প্রকার নাওয়ারিশ মাল হইয়াছে, তাহাতে যে সে ইহার মুখপাত্র হইবে, ইহা বড় বিস্ময়জনক নহে।

আমরা ভ্রান্ত হই আর যাহাই হই, বঙ্গ দেশের মুসলমানগণকে আমরা হিন্দু ভিন্ন অন্য মনে করি না। তবে আমরা যদি বেদের অন্তর্গত হই, তাহারা কোরাণের অন্তর্গত, এই মাত্র বিভিন্ন। এই সুত্রানুসারে খাস-বঙ্গে অর্থাৎ যে স্থানে বাঙ্গলা-ভাষা প্রচলিত আছে, তথায়

১। বৈদিক হিন্দু	১,৭২,৫৪০০০
২। কোরাণী হিন্দু	২,১৭,০৪০০০
মোট	৩,৮৯,৫৮০০০

এই প্রায় ৪ চারি কোটী লোকের মধ্যে ১০,৭৬০০০ ব্রাহ্মণ। তন্মধ্যে বোধ হয় ৪০০০০০ লক্ষ অনাচরণীয় হিন্দুর ব্রাহ্মণ, যথা শুড়ীর ব্রাহ্মণ, নবশূদ্রের ব্রাহ্মণ, কাপালীর ব্রাহ্মণ ইত্যাদি। অবশিষ্ট পৌণে সাত লক্ষ আচরণীয় হিন্দুর ব্রাহ্মণ। বঙ্গ-বাসী যদি কাহার মুখ-পাত্র হয়, তবে এই পৌণে সাত লক্ষ ব্রাহ্মণের মুখ-পাত্র বটে। ইহাদের স্বার্থই তাহার কাম্য পদার্থ এবং তাহার ধর্ম্মপ্রচার ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম প্রচার মাত্র। কিন্তু বঙ্গ দেশে এমন ভ্রান্তি অদ্যাপি আছে যে, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মকে হিন্দু ধর্ম্ম বলিয়া অনেকের বিশ্বাস আছে। এই ভ্রান্ত-বিশ্বাসের উপরই বঙ্গবাসীর ব্যবসায় চলিতেছে। কিন্তু বিপুল হিন্দু সংখ্যার মনোগতি যাঁহারা অনুভব করিতে পারেন এবং সাধারণ শিক্ষার এই লৌকিক প্রবৃত্তি কোন্ পথে ধাবিত হইতেছে, ইহা যাঁহাদের অভ্রান্তরূপে জানিবার সুবিধা আছে, তাঁহারা অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম যে প্রকৃত হিন্দু ধর্ম্ম নহে, এ বিশ্বাস ক্রমেই বিস্তারিত হইতেছে।

যাঁহারা বঙ্গ-বাসী মনোযোগের সহিত পাঠ করেন, তাঁহারা দেখিবেন, বঙ্গ-বাসীর মৌলিক নীতি নিম্নলিখিত প্রকারের

১। বঙ্গবাসী আচরণীয় ব্রাহ্মণের স্বার্থে অন্ধ।

২। বঙ্গবাসী কায়স্থের উন্নতির বিরুদ্ধ।

৩। বঙ্গবাসী সমুদায় অনাচরণীয় হিন্দুর উন্নতির বিরুদ্ধ।

৪। বঙ্গবাসী কোরাণী হিন্দুকে অস্পৃশ্য ও ঘৃণ্য মনে করে।

৫। বঙ্গবাসী জাতীয় একতা ও সমতার বিরুদ্ধ।

৬। বঙ্গবাসী সাধারণ শিক্ষার বিরুদ্ধ, সুতরাং সর্ব্ব সাধারণের উন্নতির বিরুদ্ধ।

৭। বঙ্গবাসী—স্বয়ত্ত শাসনের বিরুদ্ধ, কেননা তাহাতে "লঘু গুরুভেদ" থাকে না, অর্থাৎ বঙ্গবাসী হিন্দু ধর্ম্মের সাম্যবাদের বিরুদ্ধ।

৮। বঙ্গ-বাসী জন্মগত জাতিভেদের পক্ষপাতী, একজন "বেশ্যা সহচর" অন্নবিক্রয়ী-ব্রাহ্মণ বাবু চন্দ্র মাধব ঘোষের শিরোভূষণ, ইহাই তাহার বিশ্বাস।

৯। বঙ্গ-বাসী বিদেশ গমনের বিরুদ্ধ, সুতরাং আরব, গ্রীস, মিসর, ইতালী প্রভৃতি দেশে হিন্দুধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ পূর্ব্বক তত্তৎ দেশের হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান বঙ্গবাসীর মতে হইতে পারে না।

১০। বঙ্গবাসী বেদ একচেটিয়া করার পক্ষপাতী।

বেদকে যদি হিন্দুধর্ম্মের আকর স্থল বলা যায় এবং বেদে যখন দেখা যায়, শূদ্রেও বেদের সুক্ত রচনা করিয়াছেন, এবং অনেক শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, যথা ব্যাস ইত্যাদি, তাহা হইলে বঙ্গবাসীর মতকে কি বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মের মত বলা যাইতে পারে? বঙ্গ-বাসী ভেদ-নীতির পরবশ হইয়া উপবর্ণ ধর্ম্ম রক্ষার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়াছে। ইহারই অকৃত উদ্দেশ্য ব্রাহ্মণ প্রাধান্য সংস্থাপন। যদি তাহাই হয়, কথাটী স্পষ্ট করিয়া বলা উচিত।

এই সকল সত্ত্বেও বঙ্গবাসীকে একেবারে সামাজিক পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধ বলা যায় না। কুলীন ব্রাহ্মণের মেল ভঙ্গ ও কন্যাপণ উঠাইয়া দিয়া যদি কেহ আচরণীয় ব্রাহ্মণগণের বিবাহ দায় উঠাইয়া দিতে পারেন, তবে বঙ্গবাসীর পরিচালকগণ লুচি মোণ্ডার ন্যায় এ পরিবর্ত্তনটুক গ্রহণ করিতে পারেন। আর যদি কেহ বলে যে, বঙ্গদেশে যে ১৫, ৬৪০০০ নবশূদ্র (চণ্ডাল) আছে, তাহাদিগকে সজল ব্যবহারের অন্তর্গত কর, এবং তাহাদের ব্রাহ্মণগণের সহিত একত্র ক্রিয়া কর্ম্ম কর, তাহা হইলে অনেক পরিমাণে কন্যাদায় উঠিয়া যাইবে, তখন বঙ্গবাসী উপবর্ণ ধর্ম্মের ঝুড়ি মাথায় করিয়া নাচিতে আরম্ভ করেন। বলি, এই স্বার্থপরতার নাম কি হিন্দু ধর্ম্মের মুখ পাত্রতা? অহো হিন্দুধর্ম্ম। তুমি নিঃস্বার্থতার জলন্ত দৃষ্টান্ত হইয়াও এইক্ষণ সম্পূর্ণ স্বার্থপরতার দুর্গন্ধময় কূপে ডুব দিয়া বসিয়া আছ?

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কোন গ্রামে একটী গোপ সমিতি হইয়াছিল, গত সনের বঙ্গবাসীতে তাহার কার্য্য প্রণালী প্রকাশিত হইয়াছে। এই সমিতিতে বঙ্গবাসীর এক জন পরিচালক, সম্পাদক কি না ঠিক স্মরণ হয় না, উপস্থিত ছিলেন। গোপগণ যে যে বিষয় স্থিরীকৃত করেন, তন্মধ্যে কায়স্থের বাড়ী ভৃত্য থাকা হইবে না, ইহা একটী বিষয়। সমিতির কার্য্য বিষয় বঙ্গবাসীতে উল্লেখ করিয়া যখন মন্তব্য লেখা হয়, তাহাতে যে গোপ সকলের প্রতিজ্ঞার প্রশংসা করা হইয়াছিল, এমত নহে, ইহাও

বলা হইয়াছিল, অন্যান্য নিম্ন জাতি সকল এইরূপ করিলে (কায়স্থের বিরুদ্ধতা করিলে) ভাল হয়। আমরা বাস্তবিক পক্ষে কোন জাতির উর্দ্ধ গমনের বিরুদ্ধ নহি। গোপ গণ এবং কোরাণী হিন্দুগণ যদি আপন অবস্থা উন্নত ও পরিবর্ত্তিত করিয়া কায়স্থের সহিত অভিন্ন ভাবে মিশ্রিত হইতে পারেন, তবে কোন্ কায়স্থ অস্বীকার করিবেন? কিন্তু বঙ্গবাসী যে প্রকার ভেদনীতির বশবর্ত্তী হইয়া গোপ-জাতিকে কায়স্থের বিরুদ্ধতা করিতে পরামর্শ দিয়াছে, ইহাতে যদি কায়স্থ গণের কিছু বুদ্ধি থাকে, তবে বঙ্গ বাসী আর তাঁহাদের পাঠ করা উচিত হয় না। কিন্তু বলিব কি, কায়স্থগণ ক্ষত্র ধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইয়া এমন হীনবীর্য্য হইয়াছে যে, তৃণ তুল্য প্রলোভনেও তাঁহাদের কর্ণ ধরিয়া টানিতেছে। হে কায়স্থগণ! তোমাদের পতনেই দেশের এই পতন হইয়াছে, তোমরা একবার পূর্ব্বের অবস্থা স্মরণ কর।

ঢাকার শৌণ্ডিককুলতিলক বাবু রূপলাল রঘুনাথ দাসের জাত্যংশ লইয়া যে মোকদ্দমা হাইকোর্টে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে উক্ত দাস মহাশয়েরা জয়ী হইয়াছিলেন। যদি তাঁহাদের যশোহানি ও মান হানি ঘটিত, তবে বঙ্গ বাসী যতদূর সন্তুষ্ট হইত, তাঁহাদের মান রক্ষায় সেইরূপ হয় নাই। আমি অনাচরণীয় হিন্দুর যাহাতে সজল ব্যবহার হইয়া উচ্চ শ্রেণীর সহিত একতা ও সমতা হয়, তৎসম্বন্ধে একাধিক পত্র বঙ্গবাসীর নিকট প্রেরণ করিয়াছি এবং মাণ্ডরার সমাজ-উন্নতি সভা হইতে "জল-চল" নামধেয় এক পুস্তিকাও প্রেরিত হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গ-বাসী এমনই হিন্দুর মুখ-পাত্র যে, মাত্র পৌণে সাত লক্ষ ব্রাহ্মণের ভ্রান্ত স্বার্থের অনুরোধে কোটী কোটী লোকের কল্পিত উন্নতির প্রস্তাবও প্রকাশিত করিতে সাহস বা ইচ্ছা করেন নাই। অনাচরণীয় হিন্দুবর্গ, বঙ্গবাসীকে তাঁহাদের হিন্দু ধর্ম্মের ধ্বজা বাহক বিবেচনা করার পূর্ব্বে, বঙ্গবাসীর এই সকল কুটিলনীতি হৃদয়ঙ্গম করুন। বঙ্গবাসী তাঁহাদের ধার্ম্মিক ও সামাজিক উন্নতির একেবারে বিরুদ্ধ। অথচ শৌণ্ডিক প্রভৃতি অনাচরণীয় হিন্দুর মধ্যে যদি কোন কাগজের কাটতি থাকে, তাহা বঙ্গবাসীর। ইহাতেই বোধ হয়, বঙ্গ-বাসীর কৃতজ্ঞতাও যেমন, অনাচরণীয় হিন্দুর বুদ্ধিমত্তাও তেমন।

৩য় হইতে ৯ম নীতির অনুকূলে প্রমাণ সংগ্রহের প্রয়োজন নাই। প্রত্যেক বারের বঙ্গ-বাসীই তাহার প্রমাণ। কিন্তু বেদ একচেটিয়া বিষয়িণী ১০ম নীতি সম্বন্ধে দু একটী কথা বলা আবশ্যক।

বঙ্গ দেশের গত চারি শতাব্দীর ব্যর্থ-মনোরথ প্রচারক সম্বন্ধে আমরা একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছি। বলিতে বড় বেশী সাহস করি না, বঙ্গ-দেশে একজন নির্ব্বাক প্রচারক আছেন, আমরা যত দূর বুঝি, তাঁহারই প্রচার বোধ হয় কালে টিকিয়া যাইবে। পাঠকেরা বোধ হয় অনুভব করিতে পারিয়াছেন, আমি বাবু রমেশ চন্দ্র দত্তের কথা উল্লেখ করিতেছি। সত্য বটে, সেণ্টপল গির্জ্জাঘর, তাঁহার বাক্ যন্ত্রে প্রতিধ্বনিত হয় নাই, সত্য বটে, তিনি কোন নূতন ধর্ম্মের ধূঁয়া লইয়া সহরে ভ্রমণ করেন নাই, কিন্তু তিনি বাঙ্গলা ভাষায় বেদ অনুবাদিত করিয়া, হিন্দুর মূলধর্ম্ম গ্রন্থ সর্ব্ব সাধারণের নয়নগোচর করিয়া যে প্রকৃত তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে দেশে, এপুরুষে না হইলেও, পরপুরুষে বিষম ধর্ম্মান্দোলন উপস্থিত

করিবে। লুথারের ধর্ম্মান্দোলনের মূল কারণ, রাণী এলিজাবেথের রাজত্ব কালে ইংরেজীতে বাইবেল অনুবাদ। কথিত ভাষায় মূল ধর্ম্ম গ্রন্থের অনুবাদ জাতীয় জীবনের প্রথম উন্মেষ। বঙ্গ-বাসী রমেশ বাবুকে যতই গালি বর্ষণ করুক না, তাঁহার বেদানুবাদ ও ইতিহাস সংগ্রহ যে কি পদার্থ, তাহাতে লৌকিক প্রবৃত্তিকে যে কোন্ পথে প্রধাবিত করিতেছে, তাহা যদি বঙ্গ বাসী সম্যক রূপে ভাবিতে শিখে, তবে তাহার জিহ্বা শুকাইয়া যাইবে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই জেলায় জেলায় বৈদিক স্কুল ও রাজ ধানীতে বৈদিক কলেজ বাঙ্গলা ভাষায় স্থাপিত হইয়া বৈদিক ও কোরাণী হিন্দু নির্ব্বিশেষে এবং সর্ব্বজাতি নির্ব্বিশেষে বেদালোচনা হইবে। ইহাই সভ্য যুগের পূর্ব্ব লক্ষণ, বারণ করে সাধ্য কার? ফল কথা, নির্ব্বাক প্রচারকের যন্ত্র, কালোচিত, এবং তাঁহার ইতিহাস কুসংস্কার বিনাশী। কিন্তু বঙ্গ বাসী কুসংস্কার হইতে বহির্গত হইতে ইচ্ছা করেন না। তাহার মতে জনমেজয়ের সর্প যজ্ঞে সহস্র সর্প ভিন্ন কোন ঐতিহাসিক তত্ত্ব নাই। সুতরাং বাবু রমেশ দত্ত বঙ্গ বাসীর চক্ষের শূল। তিনি বেদ একচেটিয়া করার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন, তাঁহার হিন্দু ধর্ম্ম সমালোচনায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মূল ভিত্তি বিলোড়িত হইয়াছে। তিনি প্রকৃতই সভ্য যুগের লক্ষণ আশ্রয় করিয়া নির্ব্বাক প্রচার ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছেন। নরকে আশ্রয় করিয়া যে দেবতা সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন, সেই লৌকিক দেবতার অর্চ্চনায় তিনি আসক্ত। তাঁহার সত্য ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কুসংস্কারের কথা টিকিবে না। এই কুসংস্কার সম্বন্ধে বঙ্গ বাসীর পৃষ্ঠপোষক হোপ (Hope) যাহা বলেন, শুনুন ;—

"But so far as our experience goes we must confess to the impression that if the teachings of our contemporary (Bangabasi) in regard to Hinduism have any effect on the people it addresses, that effect cannot but be towards hardening the prejudices of a far from liberal minded mass and in widening those differences which are the peculiar disadvantage of such a system as caste. The danger of the Bangabasi's religious teachings proceeds, we believe, from the fact that it presses upon the attention of its readers *forms* and *observances* of Hinduism more than its *Spirit*. Whether it means or no, to its average reader Hinduism appears to consist more in observing a set of rules about eating and social intercourse, in performing Sandhya and keeping the tonsure than in leading a life of simplicity and usefulness of unselfish service to fellowmen and sincere devotion to God. We are pretty regular reader of the Bangabasi and appreciator of its practical sense in the discussion of public topics, but we must confess that if there be no other essence of Hinduism than what can be got from its pages and what can be so readily utilized for the purposes of malice and selfishness in the manner alluded to, then surely Hinduism is doomed to death and will deserve its fate. For in that case it is a religion of the most heartless formalities without a spark of humanity or divinity to soften its cold blooded tyranny. Hinduism that appears in the columns of our contemporary need not teach men to be pure in life, noble in pursuits, unselfish in desires and loving in their relations to others. It is not calculated to make men look down upon hypocrisy with scorn, shun vice no matter how sanctimoniously dressed and em-

brace honorable poverty rather than attain to wealth and social eminence by means whose propriety is questionable. On the contrary it would seem to put up with many a slip of duty, much depravity of character and perversity of heart if only external forms of piety are observed" &c. Hope, dated the 14th April 1889.

আমরা যদিও হোপ সম্পাদক অমৃত বাবুর ন্যায় বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপের বিরোধী না হই, তথাচ সহৃদয়তা শূন্য হিন্দু ধর্ম্মের সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে আমাদের মতদ্বৈধ নাই। বঙ্গ-বাসীর হিন্দুধর্ম্ম সহৃদয়তা শূন্য, সুতরাং প্রকৃত হিন্দু ধর্ম্মের বিপরীত ভাব। ইহাই সাধারণকে জ্ঞাত করার জন্য আমাদের এত যত্ন। লক্ষাধিক লোকে যদি অখাদ্য খায়, তাহা দেখিব কি প্রকারে? ক্রমশঃ

শ্রীমধুসূদন সরকার।

সাহিত্য-বাজার। (৪)

সংবাদপত্র।

আমরা গতবারে যে সকল কথা অভিব্যক্ত করিয়াছি, তাহাতেই একরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, বর্ত্তমান সময়ে সাময়িক ও সংবাদপত্রের অবস্থা মোটের উপর আশাপ্রদ নয়। এ সম্বন্ধে গ্রাহকগণেরও দোষ আছে, সম্পাদকগণেরও দোষ আছে। একদিকে সহানুভূতি ও সাহায্যের অভাবে পত্রিকাগুলি অসময়ে প্রাণত্যাগ করিতেছে, অন্য দিকে সম্পাদকগণের দোষে সহানুভূতি ও সাহায্যের দ্বার ক্রমেই রুদ্ধ হইতেছে। উপহারের বুজরুকি ও ভেল্কি দেখাইয়া এবং গ্রাহকগণকে ঠকাইয়া কতিপয় অর্থলোভী সম্পাদক ও পুস্তক প্রণেতা সাধারণকে সাহিত্যের বাজারের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া দিতেছেন। এ দেশের এ কলঙ্ক না ঘুচিলে, সংবাদ বা সাময়িক পত্রের আর মঙ্গল নাই।

অল্প মূল্যের পত্রিকায় অন্য দেশের অশেষ মঙ্গল হইয়াছে, কিন্তু আমাদের দেশে মঙ্গলাপেক্ষা দারুণ অমঙ্গল উৎপন্ন করিয়াছে। মহাত্মা কেশব চন্দ্র সেন "সুলভ সমাচার" প্রথম প্রবর্ত্তিত করিয়া এই পথ মুক্ত করেন। এক সময়ে সুলভ সমাচারের অবস্থা ভাল ছিল, তাহা দ্বারা এদেশের কতক মঙ্গল সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু এখন, সস্তার ভিড়ে পড়িয়া আপনাকে কলেবর ত্যাগ করিতে হইল! সস্তার তিন অবস্থা। এক দিকে, নিজের চলে না। অন্য দিকে, ভাল জিনিসের বাজার মাটী হয়, অর্থাৎ আদর কমিয়া যায়, অপর দিকে দেশের লোক ভাল জিনিসের পরিবর্ত্তে মন্দের আদর করিতে শিখে, অর্থাৎ রুচি-বিকৃতি জন্মে।

আমাদের দেশের একটা প্রধান দোষ এই—একপথে একবার যে যায়, শতজন তার অনুসরণ করে। সুলভ সমাচারের সময়ে একবার বঙ্গে অল্প মূল্যের কাগজের ঢেউ উঠিয়াছিল। কিন্তু অল্পেই সে ঢেউ প্রশমিত হইয়াছিল বলিয়া দেশের বড় একটা অনিষ্ট করিতে পারে নাই। এই সময়ে যে সকল কাগজ প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে সাপ্তাহিক সমাচার একটু বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, অন্যান্যগুলি জলবুদ্বুদের মত কাল-সাগরে অল্প দিনের মধ্যেই মিলাইয়া যায়। সেই সময়ে বাজারটা কতক মাটী হইয়াছিল; সুলভ পত্রের সেই ঢেউ

বঙ্গের অন্তঃসলিলা হৃদয়-স্রোতস্বতীতে অল্পে অল্পে বহিতেছিল, ১২৮৯ ও ১২৯০ সালে আবার প্রবল তরঙ্গ উত্থিত করিল। বঙ্গবাসী সঞ্জীবনী, সময়, ভারতবাসী, পতাকা প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ১।।০ ও ২৲ টাকা মূল্যের পত্রিকা এই সময়ে বহু প্রকাশিত হয়। এই সকল পত্রিকা এদেশে সংবাদপত্র-বাজারে যুগান্তর উপস্থিত করে। লোকের উৎসাহে, ভিড়ে, কিছুদিন এবাজারে চলাফেরা করা দায় হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এ অবস্থা দীর্ঘকাল রহিল না। দেখিতে দেখিতে অনেক পত্রিকাই উঠিয়া গেল। ভারতবাসী গেল, পতাকা সুরভির সহিত মিলিল, কতকগুলি মৃতপ্রায় হইয়া রহিল, কতকগুলি উঠিয়া গেল। এখনও সস্তার দিকে অনেকের ঝোঁক আছে, সেই জন্য দেখিতে পাই, মধ্যে মধ্যে এক একখান সুলভপত্র বাহির হয়, এবং দুই দশ দিন পরই অন্তর্হিত হইয়া যায়। সুলভপত্রে এদেশের কি অমঙ্গল সাধন করিয়াছে, এখন তাহাই সংক্ষেপে বলিতেছি।

প্রথমতঃ এদেশের প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা গুলির পরিণাম ডুবাইয়া দিয়াছে। সোম প্রকাশের পর, নববিভাকর ও সাধারণী দুই খানি প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা ছিল, সস্তার ধাক্কায় পৃথকভাবে মাথা তুলিতে সমর্থ না হইয়া দুই একত্রে মিলিল, তারপর ১২৯৬ সালের তিরোধানের সহিত একেবারে বিলোপ হইয়াছে। সুরভি ও পতাকা-আর দুইখানি প্রথম শ্রেণীর কাগজ—দেখিতে না দেখিতে—উভয় একত্রে সম্মিলিত হইল,—এখন কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া গোন্দলপাড়া যাইয়া রূপ, ভাষা পরিত্যাগ করিয়া জীর্ণ দেহ ধারণ করিতেছে! বলা অধিকন্তু যে, ইনি এখন মৃত্যু শয্যায়। সোমপ্রকাশ গ্রহ বৈগুণ্যে এখনও আছেন—কিন্তু যেরূপ ভাবে আছেন, এরূপ ভাবে না থাকিলেই ভাল হয়। অধিক দিন যে থাকিতে পারিবেন, এমনও বোধ হয় না। এখন প্রথম শ্রেণীর পত্রের মধ্যে একমাত্র সহচর আছেন। সহচরের অবস্থা, লেখা, সংবাদ সংগ্রহ—এ সকলই আশাপ্রদ, কিন্তু যে সস্তার বাজার, যে উপহারের বুজরুকি এখনও চলিয়াছে, কখন কি হয়, বলা যায় না। তবে প্রবর্ত্তকগণ অধ্যবসায়ী, সহিষ্ণু, বিচক্ষণ ও ধীর; বোধ হয়, তাঁহারা অল্পে ছাড়িবেন না। দেখা যা'ক। ভারতমিহির মফঃস্বল হইতে বাহির হইলেও, একখানি প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। সস্তার লীলা খেলিতে মৈমনসিংহ হইতে কলিকাতা আসিয়া গঙ্গা লাভ করিয়াছেন। প্রথম শ্রেণীর বাঙ্গলা সংবাদপত্র সকলের অবস্থা যে, এই সকল সুলভ পত্রিকা দ্বারা নিতান্ত হীন হইয়া গিয়াছে, এ বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। দেশের লোকের মন এত দূর সস্তার দিকে ঝুঁকিয়াছে যে, আর দশ বিশ বৎসরের মধ্যে উৎকৃষ্ট প্রথম শ্রেণীর পত্র এদেশে জন্ম গ্রহণ করিবে বলিয়া আশা করিতে পারিতেছি না। লোক কেবল সস্তা চায়, ভাল মন্দ বিচার শক্তি লোপ পায় পায় হইয়াছে। সুরভি, পতাকা, সোমপ্রকাশ, সাধারণী, নববিভাকর, ভারতমিহির যে দেশে আদর, সাহায্য ও সহানুভূতি অভাবে মারা গেল, বা মারা যাইতে বসিল, সে দেশের শোচনীয় অবস্থার কথা ভাবিতে বসিলে চক্ষের জল ধরে না।

যে সকল সস্তা পত্রিকার জন্য দেশের এই

রূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, সে সকলের অবস্থা কেমন? যে অসংখ্য সুলভ পত্রিকা মরিয়াছে, তাহাদের কথা তুলিলাম না। ভারতবাসী-কেও বাদ দিলাম। বঙ্গবাসী, সঞ্জীবনী, সময়—ইহাদের অবস্থা কি ভাল? সময় সম্প্রতি বৃহৎ আকার ধারণ করিয়াছেন, সুলক্ষণ কি কুলক্ষণ, জানি না। ঢাকার সারস্বত পত্রও মৃত্যুর পূর্ব্বে এইরূপ বর্দ্ধিত কলেবর লাভ করিয়াছিলেন! এই জন্য ভয় হয়। যাহা হউক, "সময়" এ সময়ের খুব উপযোগী পত্রিকা, সন্দেহ নাই। "সময়" নিরপেক্ষ সংস্কারক—খুব উন্নতিরও না, খুব অবনতিরও না, ; অত্যুদার নৈতিকও না, অনুদার নৈতিকও না। বঙ্গবাসী ও সঞ্জীবনীর মধ্যে এরূপ একখানি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর, নিরপেক্ষ, বিবেচক পত্রের নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু যেরূপ সস্তা দরে বিক্রয় হয়, হিসাব ধরিলে কাগজের মূল্যও উঠে কিনা, সন্দেহ। বড় ঘরে জন্ম, দীর্ঘ কাল থাকিলেও থাকিতে পারেন। এখন বঙ্গবাসী ও সঞ্জীবনীর কথা। বঙ্গবাসীর দিগ্বিজয়ী নাম, দিগ্বিজয়ী রুদ্ধ হস্ত সংখ্যা, কাণ্ড কারখানা সব অলৌকিক রকমের। এতবড় কারখানা বাঙ্গলা সংবাদপত্রের ভাগ্যে আর দেখা যায় নাই। এ সকল ভাবিলে, চমৎকৃত হইতে হয়। প্রবর্ত্তক-দিগকে বার বার ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে, প্রসিদ্ধি লাভের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবাসী এত মত পরিবর্ত্তন করিতে-ছেন যে, বঙ্গ-বাসীকে সময়-সেবক বলিতে সঙ্কোচ হয় না। সমাজের উপর আধিপত্য আছে বলিয়া বঙ্গবাসী বলেন, কিন্তু দেশ বলে, নাই। দেশের উপর সময়-সেবকের আধিপত্য থাকিতে পারে কি না, সে বিষয়েও গভীর সন্দেহ বিদ্যমান। তবে একথা অম্লান চিত্তে বলা যাইতে পারে যে, সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে সুলভ জ্ঞান বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়া বঙ্গ-বাসী এদেশের অনেকের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। আর এক বিষয়ে বঙ্গ-বাসীর অসাধারণ শক্তি। বাঙ্গালা ভাষাকে সরল, সুললিত, মধুর করিয়া বঙ্গ-বাসী সাহিত্যের অনেক উন্নতি করিয়াছেন। এই গুণ থাকা সত্বেও, বঙ্গ-বাসী এদেশে স্থায়ী হইবে কি না, সন্দেহ। রাজনীতি সম্বন্ধে বঙ্গবাসীর কোন কোন মত সারগর্ভ ও বিচক্ষণ হইলেও, বঙ্গবাসী সকল উন্ন-তির প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া, আপন অস্তি-ত্বের অনাবশ্যকতাই প্রতিপাদন করি-তেছেন। এ দেশের পূর্ব্বের প্রথাই সকল ভাল, একথা যদি সত্য হয়, তবে সংবাদপত্র এদেশে চালান যায় না। কেননা, পূর্ব্বে এদেশে সংবাদপত্র ছিল না। বঙ্গ-বাসী প্রকা-রান্তরে আপন অস্তিত্বের প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া আপনাকে ক্রমে ক্রমে এত দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতেছেন যে, সময়ের গর্ভে ইহার পরি-ণাম যে কি, বুঝিতে বা বলিতে ভয় হয়। বঙ্গ-বাসী আজ কাল উপহার দিতে-ছেন, ইহাতে ভিতরের অবস্থার অবনতির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। বঙ্গ-বাসী ঋণজালে জড়িত বলিয়া শুনিয়াছি, সত্য হইলে ইহাপেক্ষা আর শোচনীয় অবস্থা কি হইতে পারে! এ দেশে বঙ্গ-বাসীর কাল ফুরাইয়াছে, ইহাতে ইহাই বুঝা যায়। কিন্তু জোর করিয়া বঙ্গ-বাসী যত দিন থাকিবেন, তত দিন মারেই বা কে? বঙ্গ-বাসী বলেন, তিনি হিন্দু সমাজের মুখপাত্র, কিন্তু সাহিত্য জগতে হিন্দু সমাজের যে সকল লব্ধপ্রতিষ্ঠ কৃতী ব্যক্তি আছেন,

আমরা যত দূর জানি, বঙ্কিম চন্দ্র হইতে আবম্ভ করিয়া অক্ষয় চন্দ্র পর্য্যন্ত কেহই ইঁহাকে সম্মানের চক্ষে দেখেন না। এরূপ অবস্থায়ও বঙ্গ-বাসী আপনাকে বড় বলিয়া অন্যকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন ও তীব্র কটাক্ষ করেন। এত অহঙ্কার, এত আস্পর্দ্ধা, এত লজ্জাহীনতা কি দীর্ঘকাল মনুষ্যের সহ্য হইবে?

বঙ্গ বাসী যেমন হিন্দু সমাজের মুখপাত্র, সঞ্জীবনী সেই রূপ ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের মুখ-পাত্র বলিয়া, ব্যবহার দ্বারা, ঘোষণা করিয়া থাকেন। বঙ্গ-বাসীকে যেমন হিন্দু সমাজ মানে না, সঞ্জীবনীকে এদেশের ব্রাহ্মসাধারণ সেইরূপ মানে না। বঙ্গ-বাসীর দল বিগড়ানের ফলেই সঞ্জীবনী ও পতকার জন্ম। সঞ্জীবনী উন্নতি ও সংস্কার পিপাসু, সন্দেহ নাই; কিন্তু বড় সাহেব বিরোধী, বড় হিন্দু বিদ্বেষী। সঞ্জীবনী ও বঙ্গবাসী এক সময়ে কবির আসরে নামিয়া দেশ মাতাইয়াছিলেন, কিছু দিন হইতে সে ভাব আর নাই। এই যুগে, সংবাদপত্রে ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়গত কুৎসা-প্রচার এই উভয় পত্রিকা হইতে এদেশে আবির্ভূত হইয়াছে। বঙ্গ-বাসীর লেখা সতেজ, সরল, সুললিত, সঞ্জীবনীর লেখা রূঢ়, জটিল, কর্কশ। বঙ্গ-বাসী বাবু-নিন্দা ও ব্রাহ্ম কুৎসা লইয়া ব্যতিব্যস্ত, সঞ্জীবনী সাহেব ও হিন্দু নিন্দা লইয়া ব্যতিব্যস্ত। নিজ জাতির নিন্দা বরং ভাল, তাহাতে স্বজাতির উপকার হয়। সাহেব নিন্দার ফল মোটেই ভাল নয়। ভারতের উন্নতির জন্য বাবু ও সাহেব, ব্রাহ্ম ও হিন্দু, সকলের গাঢ় মিলন যে নিতান্ত প্রয়োজন, উভয়ই বুঝেন না। হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলেই বঙ্গ-বাসী চটেন, ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলেই সঞ্জীবনী বিবক্ত হন। সঞ্জীবনী ব্রাহ্মবিরোধী পত্রকে "নগণ্য" শব্দে অভিহিত করিয়া আপন সম্মান ঘোষণায় ব্যাপৃত, বঙ্গ-বাসী হিন্দু ভাব বিরোধীদিগকে "বাবু" বলিয়া আপনাকে তদতিরিক্ত ভাবিয়া মোহিত! আপন দোষ, জগতের লোক বড় একটা দেখিতে পায় না। সুতরাং ইঁহাদেরও সেই রূপই ঘটিতেছে। কেহ ইঁহাদিগের দোষ প্রদর্শন করিলে, চটিয়া উভয়ই লাল হন।

বঙ্গবাসী সাধারণের মধ্যে জ্ঞান প্রচাব করিয়া এদেশের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন, সঞ্জীবনী কুলির অত্যাচাব নিবারণে বদ্ধ-পরিকর হইয়া এদেশের সকলের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। সঞ্জীবনীর ভাষা যদি মধুর হইত, যদি কর্কশ না হইত; ভাব যদি ব্যঙ্গোক্তি পূর্ণ না হইত; অহঙ্কারেব ছটা যদি লেখায় না ফুটিত, এবং মত যদি একটু সংযত হইত, তবে সঞ্জীবনী বঙ্গবাসীকে পশ্চাতে ফেলিয়া প্রথম স্থান অধিকাব করিতে পারিতেন। সাম্য, স্বাধীনতাব মধ্যে যে উগ্রমূর্ত্তি লুক্কায়িত, তার মধ্যে মৈত্রী ভাবের সমাবেশ থাকিলে সঞ্জীবনী দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারিতেন। বেত্র হস্তে লইয়া অন্যকে শাসন করিতে ধাববান হইবার পূর্ব্বে নিজের দিকে একবার তাকাইয়া দেখা উচিত। বঙ্গ-বাসীর "বাবু নিন্দা" যে কারণে নিন্দিত, সঞ্জীবনীর "সাহেব নিন্দা" ততোধিক কারণেই উপেক্ষার জিনিস। সম্পাদকের প্রধান গুণ হওয়া উচিত, নিরপেক্ষতা; অতি দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, নিরপেক্ষতা এতদ্-

ভয়ের মধ্যেই অবিদ্যমান। এদেশে যদি সঞ্জীবনী ও বঙ্গ-বাসী স্থায়ী না হয়, তবে এই কারণেই হইবে।

দৈনিক সম্বন্ধে কোন কথা লিখিলাম না, কেননা, দৈনিক বঙ্গবাসীর ছায়া, অথবা বঙ্গবাসী দৈনিকের ছাযা লইয়া লিখিত।

প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রের কথা বলা হইল, অবশিষ্টের স্বাধীন মতামত বড় একটা দেখা যায় না। উপরোক্ত প্রধান পত্রিকা সকলে যে সকল কথার আলোচনা হয়, কলিকাতার অন্যান্য পত্রিকা তাহারই ছায়া অবলম্বনে লিখিত। স্বাধীন মত অতি অল্প পত্রিকার মধ্যেই দেখা যায়। একজন যে দিকে ধায়,—অন্য শত শত তার পশ্চাৎবর্ত্তী হয়। ইহাই সকলের বিশেষত্ব। কিন্তু অন্যকে নিন্দা করিবার সময় সকলেই স্বাধীন, সকলেই বড় লোক হন। যার চৌদ্দ পুরুষের মধ্যে এক জনকেও সাহিত্য জগতে বিচরণ করিতে দেখা যায় না, সম্পাদক হইয়া তিনিও অন্যকে গালি দিবার সময় বড় হইয়া বসেন। এই দুর্দ্দশা দেখিয়া দেখিয়া আমরা অবাক হইয়া গিয়াছি। কর্ত্তব্য-বোধহীনতা, দায়িত্ব-বোধ-হীনতাই অন্যান্য পত্রিকার প্রধান গুণ! কেহ দুমাস, কেহ এক বৎসর, কেহ দুই বৎসর, কেহ বা তিন বৎসর এইরূপ বাহাদুরী করেন, তারপর জলের বিম্ব জলে মিশায়, আর কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হয় না।

মফঃস্বলের পত্রিকার মধ্যে এখন এডুকেশন গেজেটই প্রধান। আচার প্রবন্ধ, পারিবারিক প্রবন্ধ প্রভৃতি যে সকল প্রবন্ধের সূচনা ইহাতে হইয়া থাকে, সে সকল অতি উচ্চদরের। বহরমপুরের প্রতিকারের মত ভাল। উলুবেড়ের গ্রামবাসী উদার। ঢাকা গেজেট ঢাকার মধ্যে সারগর্ভ প্রধান পত্রিকা, কিন্তু কাগজাদি কদর্য্য। মৈমনসিংহের চারুবার্ত্তা, কাকীনিয়ার রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ, রাজসাহীর হিন্দুরঞ্জিকা প্রভৃতি ব্যক্তি বিশেষের কাগজ, মুখ চাহিয়া সম্পাদকগণকে চলিতে হয়, সুতরাং ভাল হওয়ার সম্ভাবনা নাই। চারুবার্ত্তার বেশ ভাল, হিন্দুরঞ্জিকা ও দিক প্রকাশ কদর্য্য। ঢাকার আত্মাভিমানী শক্তি, যশহরের সম্মিলনী, বরিশালের সহযোগী, কুষ্টিয়ার হিতকরী, টাঙ্গাইলের আহম্মদী, কলিকাতার সুধাকর, উলুবেড়িয়ার দর্পণ, গরিবপুরের সমাজ ও সাহিত্য, এগুলি নূতন পত্রিকা,—আজও আছেন, কিন্তু কে কত দিন থাকিবেন, জানি না। ইহাদের মধ্যে প্রথম তিন খানির বেশভূষা ভাল, ছাপা পরিষ্কার, কিন্তু কৃতী লোক ইহাদের মধ্যে আছেন বলিয়া বোধ হয় না। অন্যান্য অধিকাংশ পত্রিকাই বিদ্বেষ ভাবে পরিপূর্ণ, অধিকাংশেরই পরনিন্দা কণ্ঠভূষণ। হাম বড় ভাব ষোল আনা সকলের মধ্যে বর্ত্তমান। এইরূপ পত্রিকা সকল দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে বলিয়া মোটেই আশা নাই। স্থায়ী না হইলেও দেশের ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। তবে গরিবপুরের "সমাজ ও সাহিত্য"কে নির্ভীক ও উন্নতি-পিপাসু বলিয়া আশা হইতেছে, স্থায়ী হইলে দেশের অনেক অভাব দূর হইবে। মুসলমান ভ্রাতাগণ সাহিত্যের উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, ইহা বড়ই আনন্দের কথা। এতদ্ভিন্ন আর যে সকল পত্রিকা আছে, সে সকল সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বক্তব্য নাই। সাময়িক পত্র সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করিব।

—

আমাদের ভদ্রাসন।

যে গৃহে নিরন্তর বাস করা যায়, অর্থাৎ যাহা আমাদের প্রাণপ্রিয় সংসারের লীলা-ক্ষেত্র হৃদয়বাস্তুভিটা, তাহার চৌহদ্দি, ইতিহাস, দলিল দস্তাবেজ প্রভৃতি আদ্যোপান্ত বিবরণ না জানেন,এমন লোক অতি বিরল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সমগ্র মানব পরিবারের সাধারণ গৃহ পৃথিবী সম্বন্ধে আমরা অতি অল্পই জানি ও জানিতে চেষ্টা করি। যথার্থ দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে আত্মার অবলম্বন জড়দেহের আশ্রয়স্থান পৃথিবী অখণ্ডিত ভাবে একদেশগত"বাস্তভিটা"অপেক্ষা অনেক গুণে প্রকৃত গৃহপদ বাচ্য। ভদ্রাসন ছাড়িয়া আজ দিল্লী, কাল বোম্বাই, পরশ্ব লণ্ডন, তরশ্ব ইয়র্ক, তৎপর দিবস নৈবাডেলফিউগো দ্বীপের হরণ অন্তরীপে থাকিতে পারি, কিন্তু পৃথিবী-বাড়ী ত্যাগ করিয়া তিলার্দ্ধ তিষ্ঠিবার যো কোথায় ? "সুতরাং আমাদের বাড়ী" বলিতে গেলে শ্যামপুকুরের গলিস্থিত খোলার ঘর, বাঙ্গালার গ্রাম, নগর, ভারতের প্রদেশ বা ইযোরোপের রাজ্য না বুঝাইয়া, সুদরাজ পাকা মোকাম জীবন স্বত্ব পৃথিবী বুঝান উচিত। পরম পিতা হইতে প্রাপ্ত এজমালী সম্পত্তি এই বাড়ীর কোন খবর না রাখা বড় দোষের কথা; তাই এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা দ্বারা কতক চিত্তবিস্তার বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। চিরকাল সংকীর্ণ পৈতৃক ভিটার কথা ভাবিয়া হৃদয় অতি ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ হইয়াছে এবং দিন দিন অধিকতর সঙ্কুচিত হইতেছে; ক্ষণকালের জন্য আপনাকে অন্ততঃ পৃথিবী টুকুতে ছড়াইয়া ফেলিতে পারিলে অনেক আরাম পাওয়া যাইবে।

অন্যান্য গ্রহাদির সহিত তুলনায় আমাদের আবাস ভূমি এই পৃথিবী অতিশয় ক্ষুদ্র, এমন কি, যদি অন্য গ্রহ হইতে এক জন জ্যোতির্বিদ অনন্তকাশের পরিদর্শনে প্রবৃত্ত হন, ক্ষুদ্রতা বশতঃ আমাদের বড় আদরের সামগ্রী মেদিনীমণ্ডল তাহার দৃষ্টিগোচর না হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। আমাদের সৌর-জগতের বিরাট আয়তনের নিকট পৃথিবী সিন্ধুতে বিন্দুমাত্র। আবার জ্যোতির্ব্বিদ্যা-বিশারদ মহাত্মা হর্শেল কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত ছায়াপথান্তর্গত এককোটী আশীলক্ষ নক্ষত্রের মধ্যে পড়িলে সামান্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ আমাদের হর্ত্তা কর্ত্তা সূর্য্যদেবকে খুঁজিয়া পাওয়া ভার,—এখানে বিরাট মূর্ত্তিতে দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ, কিন্তু সে দেশে উহা অপেক্ষা দুই চারি হাজার গুণ বড় ও ততোধিক উজ্জ্বল বিস্তর অরুণ ঘুরিতেছে। পুনরপি ঐ মুল্লুক ঘেরিয়া বিস্তৃত ছায়াপথ, যাহা আপাততঃ বোধ হয় সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছে, অনন্ত দেশের কাছে একখানি ক্ষুদ্র মেঘ বই আর কিছুই নয়। দশ দিকে অসংখ্য অগণ্য গ্রহ তারা নক্ষত্র সমাকীর্ণ আকাশের পর আকাশ, তার পর আকাশ,—অগম্য অপার, অসীম, অনন্ত বিশ্ব-কারখানা! কোন দিকে কুল কিনারা নাই, সর্ব্বত্রই কেন্দ্র. পরিধি কোথাও নির্দ্দেশ করা অসম্ভব; এই অকুল দেশ সমুদ্রে ছায়াপথ একটী অতি ক্ষুদ্র বালির চড়া মাত্র। তুলনায়

কল্পনা পরাস্ত হয়, মন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ফিরিয়া আইসে। আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল, তাহাও অনন্তকাল দৌড়িয়া কোন এক দিকের সীমায় পৌঁছিতে পারে না, আমাদের ক্ষুদ্র মনের অপরাধ কি ?

এখন দেখা যাউক, এই অসীম বিশ্ব ভুবনের মধ্যে পৃথিবীর কোন খোঁজ পাওয়া যায় কি না। আমাদের ক্ষুদ্র সসীমতার পক্ষে পৃথিবী যথেষ্ট বিশাল, কারণ আজও আমরা ইহার উপবিভাগ মাদের বিষয়েও পরিস্ফুট জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হই নাই। পরিদৃশ্যমান নাক্ষত্রিক জগতের নিকট ইহ হিমালযের পাদদেশস্থ বালুকাকণাও ন হইতে পারে, দূরবীক্ষণ দ্বারা ছায়াপথ পর্য্যবেক্ষণকারী জ্যোতির্ব্বেত্তা ইহাকে সামান্য তুচ্ছ গ্রহাধম বলিয়া অবজ্ঞা করিতে পারেন, তবুও ইহা আমাদের পক্ষে বিশেষ গবেষণার বিষয়। যদিও আয়তনে ক্ষুদ্রাৎ ক্ষুদ্রতর, তথাচ ইহার ভিতরে ও বাহিরে নিয়ত যেরূপ অসংখ্য প্রকারের কাণ্ড কারখানা হইতেছে, মানব মস্তিষ্কের সাধ্য নাই যে, তাহার অতি সামান্য অংশও কোন কালে আয়ত্তাধীন করিতে পারে। সমগ্র পৃথিবীর জ্ঞানের কথা দূরে থাকুক, পার্থিব-বিজ্ঞান যে হাজার হাজার বিভাগোপ-বিভাগে বিভক্ত, পণ্ডিতের পক্ষে তাহার প্রত্যেকটী অফুরণ অনুসন্ধানের ভূমি।

আমাদের দৃষ্টি পথের সীমান্তর্গত বিশ্বাংশটুকুর যেরূপ অত্যদ্ভুত সুচারু ব্যবস্থা, তাহাতে ইহাকে বাস্তবিক একটী ক্ষুদ্র বিশ্ব বলিলে দোষ হয় না। এক প্রকারে দেখিতে গেলে, শুদ্ধ এই পৃথিবীকে বিশ্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বলা যাইতে পারে। সমগ্র সৃষ্টি বিশ্বনিয়ন্তার যে অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মে চলিতেছে, এই নানকায় মেদিনীমণ্ডল ও তাহার চতুর্দ্দিকস্থ দৃশ্যমান জগতও সমান ভাবে সেই নিয়মের দ্বারা পরিচালিত। পৃথিবীর ভ্রমণপথ, ঘূর্ণ্যমান লাটিমের মত দুই প্রকার গতি, মাধ্যাকর্ষণশক্তির নানাবিধ ক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ে ইহা আমাদের নিকট অন্যান্য গ্রহাদির স্বরূপ ও ব্যবস্থা প্রকাশ করে, সুতরাং ইহাকে জানিলে অনেককে জানা যায়। এই জন্য পৈতৃক বাস্তু বসুন্ধরার আকৃতি প্রকৃতির বিষয় পর্য্যালোচনা করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

পৃথিবীর আকার ঠিক গোল নহে,—* দুই কেন্দ্র গড়াই হিসাবে আন্দাজ ১৩ মাইল চাপা, এবং পেট মোটা, অর্থাৎ কেন্দ্র হইতে বিষুব রেখার দিকে ক্রমেই অধিকতর স্ফীত ভাব, সুতরাং উত্তর দক্ষিণে রেখা চালাইয়া বৃত্ত আঁকিতে গেলে উহা গোল না হইয়া ডিম্বাকার হইবে। উভয় কেন্দ্র যে ঠিক সমান পরিমাণে চাপা তাহা নিশ্চয় বলা যায় না, এবং যে দিকে কাট, দুই গোলার্দ্ধ যে আকৃতিতে এক প্রকার, সে বিষয়েও বিলক্ষণ সন্দেহ, ইহা প্রমাণ

* এই সম্বন্ধে একটী হাসির কথা মনে পড়িল, ২৩ বৎসর হইল কোন ব্রাহ্মণ মুহুরি আমাদের নিকট নালিশ করিয়াছিলেন, "মহাশয়, বালকদের কথা শুনিয়াছেন? বলে কি না, পৃথিবী গোল, আবার কমলালেবুর মত দুই দিকে চাপা।" এ প্রদেশেও অনেক নিরক্ষর শ্রমজীবী এরূপ বিষয়ে অজ্ঞ থাকিতে পারে; কিন্তু খাতা সম্মুখে, কলম হাতে এরূপ প্রলাপ বকিলে নিশ্চয় পাগলাগারদে লইয়া যায়। মুহুরি ঠাকুর ভাস্করাচার্য্যের দেশের উপযুক্ত অধিবাসী; হয়ত বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদের সহিত সম্পর্কেরও দাবী রাখেন।

হইয়াছে যে, কেন্দ্র হইতে সমদূরবর্ত্তী দুই স্থানের বক্রতার ঐক্য নাই। রুশিয়ার অন্তর্গত পুলকোবা (Pulkowa) মানমন্দিরের (Astronomical Observatory) অধ্যক্ষ (Director) ষ্টুব সাহেব (Fredrich Georg Wilhelm Struve) খ্রীষ্টাব্দ ১৮১৬ হইতে ১৮৫২ ব্যাপী বরফ সমুদ্র (Frozen Ocean) হইতে দানুব নদী (Danube) পর্য্যন্ত যে ত্রিকোণমেতিক জরিপ (Trigonometrical Survey) করেন, তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছে যে, ঐ অংশের ভূপৃষ্ঠ কোন প্রকার নিয়মাধীন ভাবে স্ফীত নয়। ইউরোপ খণ্ডের মধ্যে ইংলণ্ড ও ইটালী তাহাদের চতুর্দ্দিকস্থ ভূমি হইতে বিশেষ রূপে নিম্ন।

জ্যোতির্ব্বিদগণ আলোকগতির হিসাবে নাক্ষত্রিক জগতের দূরত্বাদি নিরূপণ করিয়া থাকেন; আর আমরা ক্ষুদ্র পৃথিবীর ক্ষুদ্র জীবগণ আঙুল, বিগত, হাত, বাঁউ, ইঞ্চ, ফুট, মিটর প্রভৃতি দ্বারা আমাদের ঘরকন্নার মাপ জোক করিয়া থাকি এবং দূরতা পরিমাণের জন্য ক্রোশ, যোজন, পারাসাং (প্রাচীন পারস্য), ষ্টাডিয়ম (গ্রীক), মাইল, লিগ, রি (জাপানীয়), কীবাত (মিসরি), ইত্যাদি ব্যবহার করি। জগা সন্ন, আলোকের দৌড় ধরিলে আমাদের চলে কৈ, সে হিসাবে ছুটিলে এক সেকেণ্ডে ৭ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা যায়। আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদগণের হিসাবানুযায়ী উল্‌ফর্স (Wolfers) সাহেবের গণনা দ্বারা ভূপৃষ্ঠের মাপ ১৯৭৹১২৪০০০ বর্গ মাইল নিরূপিত হইয়াছে। জর্ম্মন জ্যোতির্ব্বিদ এঙ্ক (Johann Franz Encke) ভিতর বাহির সমস্তের (Planeary mass) মাপ করিয়া বলিয়াছেন, উহা ২৫৬০০০০০০০০০ ঘন মাইল। বহুদিন হইল ধরণীর ওজন ১৬০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০ মোন নির্ণীত হয়, কিন্তু আজ কাল তৌল করিলে কিছু বেশী হইবার কথা, কারণ প্রতিদিন স্থূলতা বৃদ্ধিরই সম্ভাবনা; তেমন পাল্লা পাইলে আমরাই না হয় একবার দেখি। আমাদের দ্বারা ওজন যদি অসম্ভব বোধ হয়, শুবেয়ার সাহেবের (Von Schubert) সঙ্গে উত্তর বা দক্ষিণ দিকে বাহির হইয়া সোজা এক বৎসর কাল দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত হাঁটিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসা অসঙ্গত হয় কি?

বাসগৃহের অন্যান্য সম্বাদ ক্রমশ প্রকাশ্য।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

চৈতন্যচরিত ও চৈতন্য ধর্ম্ম। (৩৬শ)

নীলাচল পথে।

শ্রীচৈতন্য পথিমধ্যে আসিয়াই সঙ্গীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কাহার সঙ্গে কি আছে বল, বন্ধুগণ কাহাকে কি পথের সম্বল দিয়াছেন?" সকলেই উত্তর করিলেন, কাহারও সঙ্গে কিছু নাই। আপনার আদেশ ভিন্ন কাহারও সাধ্য নাই, কোন দ্রব্য আনিতে। উত্তর, "বেশ করিয়াছ; বৈরাগীর সঙ্গে কি কিছু রাখিতে আছে? আহারের ভাবনা কি? ভগবান্ দিলে বিজন বনেও আপনা হইতে আসিয়া উপনীত হয়; নির্ব্বান্ধব স্থানেও সুখস্বচ্ছন্দে কাটিয়া যায়। আর যদি তাঁহার ইচ্ছা না হয়; তবে নানা রত্নে ভাণ্ডার পূর্ণ থাকি-

লেও এক মুষ্টি মিলে না, রাজপুত্র হইলেও তাঁহার উপবাসে দিন যায়। মনে কর অন্ন ব্যঞ্জন সকলই প্রস্তুত, এমন সময় স্ত্রীপুত্রদিগের সঙ্গে কলহ লাগিল। রাগ করিয়া গৃহস্থের সমস্ত দিন উপবাসে কাটিয়া গেল, অথবা ভোজনে বসিয়া হঠাৎ জ্বর আসিল। আর মুখের ভাতে ছাই পড়িল। তাই বলিতেছি, ভগবান না দিলে কেহ খাইতে পায় না, আর তিনি দিলে কেহই বঞ্চিত করিতে পারে না। দেখিতেছ না সমস্ত সংসারে শ্রীকৃষ্ণ অন্নছত্র দিয়াছেন। কে কোথা হইতে আনিতেছে, কে কাহাকে দিতেছে, মনুষ্যের তো কথাই নাই, কীটপতঙ্গ পর্য্যন্ত অবাধে কতই খাইতেছে কতই পাইতেছে। কেবলই দীয়তাং ভোজ্যতাং বই আর নাই। এমন অন্নছত্র থাকিতে খাওয়া পরার চিন্তা কি? যাঁহারা খাওয়া পরার সকল চিন্তা চিন্তামণিকে অর্পণ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই সুখী। বন্ধুগণ, আমরাও যেন সেই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হইয়া বৈরাগ্য শিক্ষা করিতে পারি।" সমস্ত পথে এই রূপ তত্ত্ব কথা কহিতে কহিতে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের যাত্রীদল সন্ধ্যার সময় আঠিসারা নামক গ্রামে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। সেই গ্রামে অনন্ত পণ্ডিত নামে একজন বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। যাত্রীদল তাঁহার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করত সমস্ত রজনী হরিসঙ্কীর্ত্তন ও কৃষ্ণ কথা প্রসঙ্গে রাত্রি যাপন করিলেন এবং প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া ভাগীরথির কূলে কূলে গমন করত যথাকালে ছত্রভোগ নামক গ্রামে আসিয়া উপনীত হইলেন। চৈতন্যদেব যখন ছত্রভোগ দেখিয়া ছিলেন, তখন সেখানে গঙ্গা শতমুখী হইয়া সাগর সঙ্গমে গমন করিতেছেন। অম্বুলিঙ্গ নামে এক জলময় শিবলিঙ্গ ছিল, তাহার নামে অম্বুলিঙ্গ ঘাট সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। অম্বুলিঙ্গ শিবসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য এইরূপ প্রবাদ শুনিতে পাইয়াছিলেন।

ভগীরথ সগরবংশ উদ্ধারের জন্য অবনীতে গঙ্গা আনয়ন করিলে, শিব গঙ্গার বিরহে আকুল হইয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন ও ছত্রভোগে আসিয়া জলময়ী গঙ্গা দর্শনে অনুরাগে বিহ্বল হওত আপনিও জলময় হইয়া গঙ্গাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। পাঠক মহাশয়, এই আখ্যায়িকাটী পৌরাণিক হইলেও, ইহার ভাবের মূলে একবার প্রবেশ করুন। জলময়ী গঙ্গা তরঙ্গমালা বিস্তার করিয়া শতমুখী হইয়া সাগরসঙ্গমে চলিয়াছে; জলোচ্ছ্বাসে দিঙ্মণ্ডল উচ্ছ্বসিত হইতেছে, ইহা দেখিলে কোন্ ভাবুকের হৃদয়োচ্ছ্বাস না জন্মে, নয়ন জলে সর্ব্বাঙ্গ না জলময় হয়? এই ভাব মূলে রাখিয়াই মহাযোগী শিবের জলময়ত্ব। সে যাহা হউক, শ্রীচৈতন্য অম্বুলিঙ্গ ঘাটে উপনীত হইয়া গঙ্গার শোভা দর্শন করিয়া অনুরাগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন ও নৃত্য কীর্ত্তন হুঙ্কার করিতে করিতে সবান্ধবে জলাবগাহন করিলেন। একদিকে গঙ্গার শতমুখী ধারা, অপরদিকে গৌরের নয়ন দিয়া শতমুখী ধারা, উভয় ধারা মিশ্রণে প্রেমানন্দের মহা তুফান উঠিয়া গেল। হরিনাম কীর্ত্তনে, আলাপনে, ধ্যানে, মহাভাবে গৌরের জলাভিষেক স্বর্গীয় শ্রী ধারণ করিল। জুডিয়ার বিজন বনে পবিত্র জর্দ্দন ধারায় একদিন দেবনন্দনও এমনি করিয়া স্নান করিয়াছিলেন। ভক্তের স্নানেও ভাবের জমাট। কে বুঝে, এ ভক্তি লীলা!

জেলা চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত ডায়মণ্ড হারবার সবডিবিসনে মথুরাপুর নামে থানা আছে। ঐ থানার মধ্যে জয়নগর গ্রামের ৩ ক্রোশ দূরে খাড়ী নামে একখানি ক্ষুদ্রগ্রাম আছে। ঐ খাড়ী গ্রামই প্রাচীন ছত্রভোগ। এক্ষণে তথায় গঙ্গা শুকাইয়া গিয়াছে, কিন্তু অম্বুলিঙ্গ শিবমন্দির ও চক্রতীর্থ পুষ্করিণী আছে। প্রাচীন অম্বুলিঙ্গ ঘাট যে সেই খানে অবস্থিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বোক্ত শিব গঙ্গার পৌরাণিক আখ্যাযিকানুসারে অতি প্রাচীন কাল হইতে এখানে চৈত্রকৃষ্ণা দ্বাদশীতে এক মেলা হইয়া থাকে। এই স্থান একটী তীর্থ মধ্যে পরিগণিত। কালের কি বিচিত্র গতি! যেখানে গঙ্গাসাগরসঙ্গম ছিল, ৪০০ বৎসর পরে সেস্থান শুষ্ক। সে যাহা হউক, গৌর চন্দ্র স্নানান্তে আর্দ্র বসনে তীরে উঠিয়াও কৃষ্ণপ্রেমে কাঁদিতে লাগিলেন। তাহার তাৎকালিকের তেজঃপুঞ্জ ভাব ও ভক্তির উচ্ছাস দেখিয়া আগন্তুক নরনারী চারিদিকে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিল, দেখিতে দেখিতে লোকারণ্য হইয়া পড়িল। এমন সময় দোলায় চড়িয়া এক সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং যান হইতে অবতরণ করিয়া লোকের ভিঁড় ঠেলিয়া গৌরের নিকটবর্ত্তী হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সন্ন্যাসীর প্রেমোচ্ছ্বাস দেখিয়া ধনীর প্রাণ গলিয়া গেল। ক্ষণকাল পরে গৌর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে?' আগন্তুক উত্তর করিলেন 'আমি আপনার দাস।' তখন পার্শ্বস্থ লোকে বলিয়া দিল 'তিনি দক্ষিণ রাজ্যের অধিকারী, নাম রামচন্দ্র খান।' গৌর বলিলেন "আপনি এদেশের রাজা বেশ হয়েছে, আমরা কিরূপে নীলাচলে গমন করি, বলুন দেখি?" রামচন্দ্র খান বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন, 'আপনার আজ্ঞা আমার পালনীয়, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু বর্ত্তমান সময় বড় বিষম, উৎকল ও বঙ্গরাজ্যে যুদ্ধ বাধিযাছে। সে দেশে এ দেশে যাইবার আসিবার কেহ পথ পাইতেছে না। রাজাজ্ঞায় পথিমধ্যে স্থানে স্থানে ত্রিশূল পোঁতা হইয়াছে, আগন্তুক দেখিলে প্রাণ বধ করিতেছে। তাইতো ভাবিতেছি, কোন্ দিক দিয়া আপনাদের গোপনে পাঠাইয়া দি। আবার আমিই এদেশের শান্তি রক্ষক, কোন স্থানে কিছু গোলযোগ বাধিলে যবন রাজ আমাকে রাখিবেন না। ধন, প্রাণ, ইজ্জত সব যাইবে। তাহাতে মনে বড় ভয়ও হয়। সে যাহা হউক, কপালে যাহা থাকে হইবে, আমি আজ রাত্রিতে নিশ্চয়ই আপনাদের পাঠাইয়া দিব, কোন চিন্তা করিবেন না। এক্ষণে আর্দ্র বস্ত্র ত্যাগ করিযা আতিথ্য গ্রহণ করুন।" এই বলিয়া এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে লইয়া গিয়া রামচন্দ্র খান অতিথিদিগের সেবার আযোজন করিয়া দিলেন। গৌরচন্দ্র নীলাচলচন্দ্র দেখিবার জন্য মহা উৎকণ্ঠিত, ভাল করিযা ভোজন করিতে পারিলেন না। ভোজনান্তে সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। মৃদঙ্গ করতাল যোগে মুকুন্দ দত্ত যখন সুস্বরে হরিগুণানুকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, তখন এক মহাভাবের তরঙ্গ উঠিয়া গেল। গৌরচন্দ্র নৃত্য জুড়িয়া দিলেন। ছত্রভোগবাসী দেখিয়া কৃতার্থ হইল। রাত্রি তৃতীয় প্রহরে সংকীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে রামচন্দ্র খান বলিলেন "ঘাটে নৌকা প্রস্তুত, গমন করিলেই হয়।" তখন শ্রীচৈতন্য হরি-

নাম স্মরিয়া সশিষ্যে তরণী আরোহণ করিয়া উড়িষ্যা রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নৌকায় উঠিয়া সেই গভীর নিশীথে মুকুন্দ দত্ত প্রভৃতি হরিগুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। নির্বোধ নাবিকগণ তাহা শুনিয়া ভয়বিহ্বল চিত্তে বলিতে লাগিল "হায়! হায়! আজ বুঝি প্রাণ বাঁচিবে না। জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ, নৌকা ডুবিলে কিছুতেই রক্ষা নাই। বিশেষত এদেশে জল দস্যুর ভয়ে নৌকা বাহিচ করা মহা বিপজ্জনক। যে পর্য্যন্ত উড়িষ্যার দেশে না যাই, গোঁসাই মহাশয়েরা সে পর্য্যন্ত [illegible]" তাহা শুনিয়া গায়কগণ [illegible] হইলেন। তখন গৌরচন্দ্র হুঙ্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "কি? বৈষ্ণবের আবার ভয়? কাহাকে ভয় করিব? তোমরা কি দেখিতেছো না সম্মুখে সুদর্শন চক্র আমাদের রক্ষার জন্য নিয়ত ঘুরিতেছে। কাহার সাধ্য আমাদের অনিষ্ট করে? ভাই সব, বিশ্বাস চক্ষু উন্মীলন কর; ভয় ভাবনা ছাড়, নাম সঙ্কীর্ত্তন ছাড়িও না।" তখন ভক্তগণ আশ্বস্ত হইলেন। নৈশ গগণে আবার সংকীর্ত্তনের মধুর নিনাদ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সুদর্শন লাভ না হইলে সুদর্শনের লীলা দর্শন করা অসম্ভব। সঙ্গীগণ তাই নাবিকের ভয়সূচক বাক্যে ভীত হইয়াছিলেন।

সমস্ত পথ সঙ্কীর্ত্তনানন্দে অতিবাহিত করিয়া ভক্তদল অবশেষে উৎকল রাজ্যের প্রয়াগ ঘাট নামক স্থানে আসিয়া নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন। গৌরচন্দ্র উড্র দেশকে নমস্কার করিয়া সেই স্থানে গঙ্গাঘাট নামক ঘাটে স্নান করিলেন, এবং যুধিষ্ঠির-স্থাপিত মহাদেব দর্শন করিয়া তট পন্থায় গমন করিতে লাগিলেন। প্রয়াগ ঘাট কোন স্থানে অবস্থিত জানি না, অনুমান করি, হিজলীকাঁথি প্রদেশের স্থান বিশেষ হইবে। মধ্যাহ্ন উপস্থিত হইলে শ্রীচৈতন্য সঙ্গীদিগকে বলিলেন, তোমরা এই স্থানে বিশ্রাম কর, আমি ভিক্ষায় চলিলাম। এই বলিয়া নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে যাইয়া গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার্থী হইলেন। তাহার অপরূপ রূপ মাধুরী দেখিয়া সকলেই সন্তোষের সহিত তণ্ডুল ও অন্যান্য উত্তম খাদ্য প্রদান করিল। সঙ্গীদিগের আহারের উপযুক্ত পরিমাণ সংগ্রহ হইলেই গৌরচন্দ্র প্রতিনিবৃত্ত হইয়া বন্ধুদিগের নিকটে আসিলেন। তাহার সঙ্গীগণ ভিক্ষাদ্রব্য দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন এবং কৌতুক করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'হাঁ, বোধ হচ্ছে পুষিতে পারিবে।' জগদানন্দ এক বৃক্ষমূলে পাক করিলে গৌরচন্দ্র সবান্ধবে মহানন্দে ভোজন করিলেন, ও হরিনামানন্দে সেই বৃক্ষমূলে যাপন করিয়া পরদিন প্রত্যূষে চলিতে আরম্ভ করিলেন। পথের মধ্যে এক দান ঘাট; দান না পাইলে দানী নদী পার করে না। সন্ন্যাসী দেখিয়া দানী বলিল, "আপনার সঙ্গে কয় জন লোক?" গৌরচন্দ্র তখন মহাভাবে নিমগ্ন। সেই ভাবে উত্তর করিলেন, "জগতে আমার কেহ নাই, আমিও কাহারও নই। আমি একই, দুই নই, কিন্তু সকলই আমার।" বলিতে বলিতে গৌরের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। দানী বুঝিতে না পারিয়া বলিল "গোসাই! আপনি নৌকায় উঠুন, এ সকল লোকের কড়ি না পাইলে পার করিব না। গৌরচন্দ্র

নিমগ্নচিত্তে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া নৌকায় উঠিয়া পর পারে যাইয়া মাথা হেট করিয়া বসিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। দানী এই স্বর্গীয় ছবি দেখিয়া প্রথম পারে প্রত্যাগমন করিয়া নিত্যানন্দাদিকে ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কে? কাহার লোক? আর ঐ সন্ন্যাসী ঠাকুরই বা কে? আমাকে ভাঙ্গিয়া বলুন।" নিত্যানন্দ উত্তর করিলেন, "উনি জগদ্বিখ্যাত শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ঠাকুর; আমরা উহাঁর কিঙ্কর।"

দানী। তবে উনি আপনাদের অস্বীকার করিলেন কেন?

নিতাই। তাঁর লীলা কে বুঝিবে? তখন দানী তাঁহাদিগকে পার করিয়া দিয়া ব্যাকুল প্রাণে গৌরের চরণে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল ও অপরাধ ক্ষমা চাহিল। শ্রীচৈতন্য দানীকে কৃপা করিয়া চলিতে লাগিলেন এবং কতক দূরে স্নুবর্ণ রেখা নদী পার হইয়া নদীজলে অবগাহন করিলেন ও অতিব্যস্ত সমস্ত হইয়া অগ্রবর্ত্তী হইয়া চলিলেন। নিত্যানন্দ ও জগদানন্দ পাছে পড়িয়া রহিলেন। কতক দূরে যাইয়া গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দের জন্য এক বৃক্ষমূলে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এ দিকে জগদানন্দ নিত্যানন্দকে এক স্থানে বসিতে বলিয়া ভিক্ষান্বেষণে গ্রামে চলিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের দণ্ড গাছটী জগদানন্দ বহন করিয়া আসিতেছিলেন। ভিক্ষায় যাইবার সময় জগদানন্দ তাহা নিত্যানন্দের কাছে রাখিয়া গেলেন। নিতাই দণ্ড পাইয়া বসিয়া চিন্তায় মগ্ন হইয়া পড়িলেন এবং দণ্ডকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, ওহে দণ্ড, আমি যাহাকে সদা হৃদয়ে বহিয়া বেড়াইতেছি, তিনি যে তোমাকে বহিবেন, এ তো ভাল নয়। এই বলিয়া বিরক্তি সহকারে নিতাই দণ্ডখানি তিন খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া হাসিতে লাগিলেন। জগদানন্দ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ভগ্ন দণ্ড দখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এ কি এ" প্রভুর দণ্ড কে ভাঙ্গিল? নিতাই উত্তর করিলেন, "তাঁহার দণ্ড তিনিই ভাঙ্গিয়াছেন, আর কাহার সাধ্য তাহা ভাঙ্গিতে?" জগদানন্দ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ভাঙ্গা দণ্ড তিন খানি কুড়াইয়া লইয়া কিছু বিষণ্ণ অন্তরে যেখানে গৌর তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, সেইখানে তাঁহার অগ্রে খণ্ডগুলিকে ফেলাইয়া দিলেন। গৌর বলিলেন, আমার দণ্ড ভাঙ্গিল কে? তোমরা পথে কি কাহারও সঙ্গে কলহ করিয়াছ? জগদানন্দ উত্তর করিল, নিত্যানন্দ বিহ্বল চিত্তে এই কুকার্য্য করিয়াছেন। গৌর একটু ক্রুদ্ধ ভাবে নিতাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি জন্য তুমি আমার দণ্ড ভাঙ্গিলে? নিতাই বলিলেন, হাঁ, এক খান বাঁশ ভাঙ্গিয়াছি; যদি ক্ষমা করিতে না পার, যে সাস্তি উচিত মনে কর দাও। গৌর বলিলেন, 'যাহাতে সর্ব্বদেব অধিষ্ঠিত, তাহা তোমার মতে বাঁশ নাম হলো; আচ্ছা হলো হলো আমার এক মাত্র সঙ্গী দণ্ড খানি ছিল, তাহা যখন ভাঙ্গিয়া গেল, তখন আমার আর কেহ সঙ্গী নাই। হয় তোমরা আগে যাও, না হয় আমাকে যাইতে দাও।" মুকুন্দ গতিক বুঝিয়া বলিলেন, আচ্ছা, তুমিই তবে আগে যাও, আমরা পিছে যাচ্ছি। ভাল, তাহাই হউক, বলিয়া গৌরচন্দ্র আগে আগে ছুটিয়া চলিলেন। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন, দণ্ডভঙ্গ লীলার গূঢ় তাৎপর্য্য কেহই বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু আগা গোড়া

বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই মনে হয় যে লৌকিক সন্ন্যাসের আড়ম্বরে ধর্ম্ম হয় না, তাহাই প্রতিপাদন করা গৌর ও নিতাই যের মনের উদ্দেশ্য ছিল। নিত্যানন্দের উপর যে গৌরের কোপ, সে কৃত্রিম ক্রোধ মাত্র।

চৈতন্যচন্দ্র একাকী পদ ব্রজে যখন জলেশ্বর নামক গ্রামে উপনীত হইলেন, তখন দেব স্থানে জলেশ্বর মহাদেবের মহা ধুম ধামে পূজা হইতেছে। বহুবিধ বাদ্য কোলাহল শুনিয়া তিনি মন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন এবং পূজার ব্যাপার দেখিয়া ও বাদ্য নিনাদ শুনিয়া পূর্ব্ব সঞ্চিত ক্রোধ ভুলিয়া গেলেন এবং প্রেমাবেগ উচ্ছ্বসিত হওয়ায় বাদ্যের তালে তালে নাচিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সঙ্গীগণ জলেশ্বরে আসিয়া দেখিলেন যে, গৌরাঙ্গ মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় তখন মহা নৃত্যে বিভোর। মুকুন্দ কীর্ত্তন গাইতে আরম্ভ করিলেন। তাহা শুনিয়া গৌরের নৃত্য দ্বিগুণ মাত্রায় চড়িয়া উঠিল। অনেকক্ষণ পরে ভাবাবেগ শমিত হইলে, গৌরচন্দ্র সঙ্গীদিগকে প্রিয় সম্বোধন করিয়া তাঁহাদের উপর ক্রোধ করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন। নিতাইকে বলিলেন, কোথায় তুমি আমাকে ধৈর্য্য শিক্ষা দিবে ও আমার সন্ন্যাস ধর্ম্ম যাহাতে বজায় থাকে, তাহা করিবে, না আরও আমাকে পাগল করিয়া তোলো; নিতাই, ভাই, আর যদি তেমন কর, তবে আমার মাথা খাও। সে রাত্রি জলেশ্বরে অবস্থিতি করিয়া যাত্রীদল প্রাতে পথ গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। বর্ত্তমানে জলেশ্বর গ্রাম অতিবাহিত করিয়া স্বুবর্ণ রেখা পার হইতে হয়; কিন্তু চারিশত বৎসর পূর্ব্বে ঐ গ্রাম স্বুবর্ণরেখার অপর পারে থাকা, এই বর্ণনা দ্বারা জানা যাইতেছে।

পথি মধ্যে বাঁশদহ গ্রামে এক মদ্যপায়ী শাক্তকে কৃপা করিয়া গৌরচন্দ্র রেমুণা নগরে আসিলা। ক্ষীরচোরা গোপীনাথ বিগ্রহ দর্শন করিলেন। বালেশ্বরের ৫ মাইল পশ্চিমে রেমুণা অবস্থিত। এখানে গোপীনাথ বিগ্রহের মহিমায় ফাল্গুন মাসে এক মেলা বসিয়া থাকে। পূর্ব্বে মাধবেন্দ্র পুরী গোবর্দ্ধনে গোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাঁহার আদেশে নীলাচলে মলয়জ চন্দন আনিতে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে রেমুণায় আসিয়া গোপীনাথের অমৃত কেলি নামক ক্ষীর প্রসাদ দেখিয়া, পুরীর তাহা নিজে আস্বাদ করিয়া গোপালকে ভোগ দিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু পুরীর অযাচিত বৃত্তি, কেহ চেষ্টা করিয়া খাইতে দিলে ভোজন করেন, নতুবা উপবাসী থাকেন। ক্ষীর প্রসাদ খাইবার বাসনা জাগ্রত হওয়ায় পুরী মনে মনে লজ্জিত হইলেন এবং বিষ্ণু স্মরণ করিয়া অন্যত্র যাইয়া রজনী যাপন করিলেন। এ দিকে গোপীনাথ পূজারীকে স্বপ্নযোগে বলিলেন যে, ১২ খানি ক্ষীরের মধ্যে তিনি এক খানি পুরীকে খাওয়াইবেন বলিয়া ধড়ার অঞ্চলে লুকাইয়া রাখিয়াছেন, তাহা লইয়া গিয়া পুরীকে দেওয়া হউক। পূজারী সেই নিশীথ সময়ে বাজার যাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন "কাহার নাম মাধবেন্দ্রপুরী:— তোমার জন্য গোপীনাথ ক্ষীর চুরি করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন, আসিয়া ভোজন কর।" সেই হইতে গোপীনাথের নাম ক্ষীরচোরা গোপীনাথ হইল। মাধবপুরীর এই প্রেম-কাহিনী পূর্ব্বে গৌরচন্দ্র শ্রীঅদ্বৈত দেব

ঈশ্বরপুরীর নিকট শুনিয়াছিলেন। সঙ্গীগণকে তাহাই বিস্তৃত আকারে বলিয়া প্রেমে গদগদ হইলেন এবং পূজারী প্রদত্ত ক্ষীর প্রসাদ ভোজন করিয়া উষাকালে গন্তব্য পথে যাত্রা করিলেন। যথাসময়ে যাত্রীদল যাজপুরে বিরজাক্ষেত্রে আসিয়া উপনীত হইল। এখানে বৈতরণী নদী প্রবাহিত এবং অসংখ্য দেবালয় অবস্থিত। কিছু-দূরে নাভিগয়া ও বিরজা-মন্দির। একে যাজপুরের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর, তাহাতে আবার অসংখ্য দেবালয়ে দেবা-র্চ্চনার সময় যুগপৎ শঙ্খ ঘন্টা কঁসর শব্দে দিঙ্মণ্ডল আন্দোলিত হইলে আপনা হই-তেই প্রাণে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়। গৌরচন্দ্র সঙ্গীদিগকে লইয়া প্রথমে দশা-শ্বমেধ ঘাটে স্নানাবগাহন করিয়া আদি বরাহ মন্দিরে যাইয়া নৃত্যকীর্ত্তন করিলেন। যাজপুরের দৃশ্যে গৌরচন্দ্র বড়ই আনন্দা-নুভব করিতে লাগিলেন এবং নির্জ্জন বিহারের জন্য ব্যাকুল হইয়া সঙ্গীদিগকে ছাড়িয়া অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। সঙ্গীগণ সোদ্বেগে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া যখন তাঁহাকে পাইলেন না, তখন বিষণ্ণ চিত্তে এক বৃক্ষতলে রজনী যাপন করিলেন। এদিকে শ্রীচৈতন্য যাজপুরের দ্রষ্টব্য সকল স্থান দেখিয়া এক নির্জ্জন স্থানে যাইয়া ধ্যান সমাধিতে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে বন্ধুদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন সকলে আনন্দে হরি ধ্বনি করিয়া রাজপথে বাহির হইলেন এবং যথাসময়ে কটকনগরে পুণ্য-সলিলা মহানদীতে স্নান করিয়া সাক্ষী গোপাল মন্দিরে আগমন করিলেন। এই-খানে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ মুখে সাক্ষী গোপালের বৃত্তান্ত শুনিয়া প্রেমে গদ্গদ হইয়াছিলেন।

নিত্যানন্দ পূর্ব্বে তীর্থ ভ্রমণে আসিয়া এই বৃত্তান্ত লোক মুখে শুনিয়া গিয়া-ছিলেন। আজ সুযোগ পাইয়া তাহাই শ্রীচৈতন্যের নিকট বিবৃত করিলেন। এখান হইতে যাত্রীদল ভুবনেশ্বর তীর্থে গমন করিলেন। ভুবনেশ্বর শিবধাম ও মহাতীর্থ; পুরীর ১০।১২ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। ভুবনেশ্বরের মন্দির এক আশ্চর্য্য শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় স্থল। কোটী ক্ষুদ্রায়তন শিবমন্দির দ্বারা ইহা সুবেষ্টিত। কথিত

* বিদ্যানগরের দুইটী ব্রাহ্মণ তীর্থ ভ্রমণে গমন করিয়া কোন সময়ে বৃন্দাবনে উপনীত হইয়া ছিলেন। ইঁহাদের একজন বয়োবৃদ্ধ ও সংকুলীন, অপর জন যুবক এবং অত্যন্ত-দীন। যুবকের সেবায় তুষ্ট হইয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ গোবিন্দ দেবালয়ে গোপাল বিগ্রহের সম্মুখে তাঁহাকে স্বীয় কন্যা দান করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু দেশে প্রত্যাগত হইলে স্বজন দিগের প্রেরণায় ব্রাহ্মণ প্রতিজ্ঞা পালনে অসম্মত হইলেন এবং কবে কি বলিয়াছেন, স্মরণ নাই বলিয়া যুবকের কথা উড়াইয়া দিলেন। তাহাতে সেই যুবা বৃন্দাবনে যাইয়া গোপাল বিগ্রহকে প্রসন্ন করিয়া সঙ্গে আনিয়া সর্ব্বজন সমক্ষে সাক্ষী দেওয়াইলে বৃদ্ধ বিপ্র তাঁহাকে কন্যা দান করিলেন। তদবধি দেবতার নাম সাক্ষী গোপাল হইল ও বিদ্যানগরে তাহার সেবা প্রতিষ্ঠিত হইল। পরবর্ত্তী সময়ে উৎকল রাজ পুরুষোত্তম দেব ঐ দেশ জয় করিয়া গোপালকে কটকে আনিয়া মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন এবং রাজ সেবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তাঁহার মহিষীকে গোপাল স্বপ্নে বহুমূল্য মুক্তা নোলক চাহিয়া লইয়া নাসিকাতে পরিয়া ছিলেন। এক্ষণে সাক্ষী গোপাল মন্দির কটক হইতে প্রায় দিন যাঁদের পথ ব্যবধানে, পুরী যাইবার পথে অবস্থিত।

আছে, কেশরী বংশের সুবিখ্যাত রাজা যযাতি কেশরী ৫০০ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দির নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন, আর ৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার প্রপৌত্র রাজা ললাটেন্দু কেশরীর সময়েই ইহা সম্পূর্ণ হয়। ক্রমাগত ১৫৭ বৎসর ধরিয়া এই বিশাল দেবমন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য চলিয়াছিল। ভুবনেশ্বরে বিন্দু সরোবর নামে পূতসলিলা প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা আছে। কথিত আছে, ভগবান্ মহেশ্বর সর্ব্বতীর্থের জল বিন্দু বিন্দু আনিয়া এই সরোবর সৃজন করিয়াছিলেন। ভুবনেশ্বর গুপ্ত বারাণসী। স্কন্দ পুরাণে ভুবনেশ্বরের উৎপত্তি বিষয়ে লিখিত আছে যে, কাশী-রাজ নামে বারাণসীর রাজা কোন সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে জয় করিবার ইচ্ছায় কঠোর তপস্যায় মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া তল্লব্ধ বরে শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে সমরযাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু সমরে আপনি নিহত হইলেন ও তাঁহার রাজধানী বারাণসীও ভস্মসাৎ হইয়া গেল। তখন কৃষ্ণের সুদর্শন চক্র মহা বিক্রমে শিবের দিকে ধাবিত হইলে, মহাদেব ভয়ে ভীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন ও অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং স্বীয় বাসস্থান বারাণসী নগরী ভস্মীভূত হওয়ায় বাস করিবার জন্য একটী স্বতন্ত্র স্থান ভিক্ষা করিলেন। কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণ সদয় হইয়া শ্রীক্ষেত্রের উত্তরে একাম্রক নামক বনভূমি তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। এই স্থানই কালে ভুবনেশ্বর বলিয়া বিখ্যাত হইল। এই আখ্যায়িকার মূলে কি সত্য আছে, জানি না, কিন্তু ইহা যে শৈব ধর্ম্মের উপর বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিজয় কালে রচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভুবনেশ্বরের অন্ন প্রসাদ শ্রীক্ষেত্রের মহা প্রসাদের ন্যায় জাতি নির্ব্বিশেষে স্পর্শ ও ভোজন করিতে পারে, কিন্তু অন্যত্র লইয়া যাইতে পারে না।

শ্রীচৈতন্য ভুবনেশ্বর দর্শনে মহাসুখী হইলেন এবং বিন্দু সরোবরে অবগাহন করিয়া শিবভাবে বিভোর হইয়া কতই নৃত্য কীর্ত্তন করিলেন। সঙ্গীগণ সঙ্গে প্রত্যেক শিবমন্দির পরিক্রম করিয়া মহোল্লাসে নাচিতে নাচিতে তিনি কোপিলেশ্বর শিবস্থানে উপনীত হইলেন। ভুবনেশ্বরের পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে কিঞ্চিৎ ন্যূন এক মাইল ব্যবধানে কোপিলেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। এ মন্দির ভুবনেশ্বরের ন্যায় জমকাল না হইলেও একটি বিখ্যাত তীর্থ।

বৈষ্ণবীয় গ্রন্থে কোপিলেশ্বরকে কপোতেশ্বর নামে অভিহিত করা হইয়াছে। কেন এইরূপ নামান্তর কথিত হইল বলিতে, পারা যায় না কিন্তু উভয় নামই যে এক স্থান নির্দ্দেশক, তাহাতে সন্দেহ নাই। কোপিলেশ্বর হইতে গৌরচন্দ্র কমলপুরে আসিয়া ভার্গবী নদীতে স্নান করিলেন। মহানদী হইতে কৈয়াকই নামে যে শাখা প্রবাহিত হইয়াছে, তাহাই আবার কিছু দূরে আসিয়া দয়া ও ভার্গবী নামে দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। চৈতন্যচরিতামৃতের মতে গৌরের কোপিলেশ্বরের শিব দর্শনে অনুপস্থিতি সময়ে কমলপুরে নিত্যানন্দ দণ্ড ভঙ্গ করিয়া ভগ্নখণ্ডত্রয় ভার্গবীর জলে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। কমলপুর হইতে জগন্নাথের দেউলধ্বজা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্য ধ্বজা দর্শনে প্রেমে অস্থির ও বিহ্বল হইয়া পশ্চাদুদ্ধৃত অর্দ্ধ শ্লোক আবৃত্তি করিতে করিতে পাগলের ন্যায় চলিতে লাগিলেন :—

প্রাসাদাগ্রেনিবসতি পুরঃস্মেরবক্ত্রারবিন্দো।
মামালোক্য সম্মিতবদনোবালগোপালমূর্ত্তিঃ।

অর্থ—"প্রাসাদের অগ্রমূলে ভগবান বালগোপাল মূর্ত্তিতে আমাকে দেখিয়া কতই হাসিতেছেন।"

গৌরের হৃদয় ভাবময়। মন্দির ধ্বজা দেখিয়া কত ভাবতরঙ্গই তাঁহার প্রাণে উঠিতে লাগিল, কে বলিবে। এইরূপে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া হাসিতে, কাঁদিতে, আছাড় খাইতে খাইতে তিনি চারিদণ্ডের পথ তিন প্রহরে অতিবাহিত করিয়া আঠার নালায় আসিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন। চরিতামৃতের মতে, এই স্থানে আসিয়া নিত্যানন্দের নিকট দণ্ড চাহিলেন। তাহা তিনি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন শুনিয়া, পূর্ব্বের বর্ণনানুসারে নিত্যানন্দাদির সহিত কলহ করিয়া তিনি তাহাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া একাকী জগন্নাথ দর্শনে অগ্রগামী হইয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্য ভাগবতকার বলেন যে, আঠার নালায় আসিয়া শ্রীচৈতন্য বন্ধুদিগকে বলিলেন "প্রিয় সুহৃদ্‌গণ! তোমরা আমাকে নীলাচলে আনিয়া জগন্ননাথ দর্শন করাইয়া প্রকৃত বন্ধুর কাজ করিলে, এক্ষণে নিবেদন যে, আমি একাকী যাইয়া শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিব, হয় তোমরা অগ্রগামী হও, না হয় আমাকে আগে যাইতে দাও," মুকুন্দ বলিলেন, তুমি অগ্রগামী হও, আমরা প্রাতঃকৃত্য সারিয়া পশ্চাৎবর্ত্তী হইব। তাহা শুনিয়া চৈতন্য গোঁসাই মহানন্দে একাকী অগ্রবর্ত্তী হইলেন এবং অচিরে জগন্নাথ মন্দিরে আসিয়া জগমোহনে দাঁড়াইয়া নীলাচলনাথকে দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার প্রাণে কতই প্রেম, কতই ভাব, কতই উচ্ছ্বাস হইতে লাগিল, তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। সেই সময়ে উৎকল রাজসভাপণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যও জগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন। প্রথমে তিনি নবাগত সন্ন্যাসীর দিকে বড় একটা লক্ষ্য করেন নাই। দর্শন করিতে করিতে গৌরের ভাব সিন্ধু উথলিয়া উঠিল, তিনি আত্মসংযম করিতে পারিলেন না। প্রেমাবেগের সঙ্গে সঙ্গে জগন্নাথ বিগ্রহকে কোলে করিবার জন্য তাঁহার মনে দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছার উদ্রেক হইল; আর তিনি মন্দিরের মধ্যে যাইতে উদ্যত হইয়া এক উল্লম্ফ প্রদান করিলেন। পরিহারিগণ ছড়ি হাতে তাঁহাকে মারিবার জন্য চারি দিক হইতে ছুটিয়া আসিল। তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া মন্দির প্রাঙ্গণে পড়িয়া গেলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ইহা দেখিয়া তাঁহার রক্ষার জন্য সমাগত হইয়া হা হা করিয়া পড়িলেন। ভট্টাচার্য্যকে দেখিয়া পরিহারিগণ প্রহারে ক্ষান্ত হইল। সার্ব্বভৌম অপরূপ মূরতি সন্ন্যাসী দেখিয়া, তাঁহার যৌবনের সৌন্দর্য্য ও ভাবের প্রগাঢ়তা দেখিয়া মনে মনে বিচার করিলেন যে, ইনি কোন মহাপুরুষ হইবেন। তখন তিনি নানা প্রকারে আগন্তুকের চৈতন্য সম্পাদনার্থে যত্ন করিলেন এবং কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া ও ভোগের সময় উপস্থিত দেখিয়া, তিনি পরিহারিদিগের দ্বারা মূর্চ্ছিত গৌরচন্দ্রকে হাতাহাতি করিয়া বহাইয়া স্বভবনে আনাইলেন এবং এক নিভৃত কক্ষে শয়ন করাইয়া রাখিলেন। গৌরের মূর্চ্ছার ভাব শঙ্কিত দেখিয়া ভট্টাচার্য্য একটু উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন; কিন্তু যখন নাসিকার নিকট তুলা ধরিয়া দেখিলেন যে, তুলা ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে, তখন ভয়ের কারণ নাই জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

ব্রহ্মজ্ঞান ও পৌত্তলিকতা।

(২)

আমরা বলিয়াছি যে, জ্ঞানের দিক হইতে দেখিলে সাকার ও নিরাকারে বড় একটা বিবাদ বিসম্বাদ থাকে না কেন না, জ্ঞানের একপীঠ যেমন সাকার অন্য পীঠ তেমনি নিরাকার। যে জ্ঞানের এই দুইটী পীঠ নাই, সে জ্ঞান জ্ঞানই নয়। সাকার বর্জ্জিত জ্ঞান, অথবা নিরাকারের সংশ্রব রহিত জ্ঞান সম্ভব হইলেও তাহা অজ্ঞেয়। সাকার ও নিরাকারের মধ্যে এই রকম ভাবে যদি সখ্যতা স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞান ও পৌত্তলিকতার মধ্যে যে বিরোধিতা আছে বলিয়া বোধ হয়, তাহা ঘুচাইবার পক্ষে আমাদিগের কতটুকু সুবিধা হইয়া উঠে, তাহা দেখা যাউক।

দেখিতে গেলে বড একটা সুবিধা বিবেচনা হয় না। আমরা যে জ্ঞানের কথা লইয়া এক্ষণে নাড়াচাড়া করিতেছি তাহার গোটাটাই ত বিষয় ব্যাপারে লিপ্ত। এমন বৈষয়িক পরিবর্ত্তনশীল জ্ঞানের সহিত পারমার্থিক নিত্য জ্ঞানের তুলনা কোথায়? বুঝিলাম যে, আমাদিগের জ্ঞানের এক পীঠ সাকার, অন্যপীঠ নিরাকার, এক পীঠে ভাব, অপর পীঠে অভাব, কিন্তু তাহাতে আর বেশী ফল কি হইল? এই-রকম জ্ঞানকে ব্রহ্মজ্ঞান কে বলিবে? তা' যদি হয়, তাহা হইলে সকল জ্ঞানকেই ত ব্রহ্মজ্ঞান বলিতে হয়। যদি বল বৈষয়িক জ্ঞানের তলাতেই কি অসীম ভাব নাই? আছে, কিন্তু তথাপি এরূপ অসীম ভাব, পারমার্থিক জ্ঞানের বিষয় নহে ও হইতে পারে না। কেন—তাহা বলিতেছি।

অসীম ও সসীম, সাকার ও নিরাকার আদি করিয়া ভাবাভাব ভেদে জ্ঞানের যে দুইটী অংশ পাওয়া যায়, তাহার এক অংশ ছাঁটিয়া ফেলিলে, জ্ঞান স্বয়ং অজ্ঞেয়ত্বে পরিণত হয়, কিছু নাই অথচ জ্ঞান স্বয়ং শূন্যে ভাসিতেছে, এমন নির্ব্বিষয়ী নিরপেক্ষ জ্ঞানই যদি পারমার্থিক জ্ঞানের সার অর্থ হয়, তাহা হইলে পারমার্থিক জ্ঞান থাকা না থাকা এক প্রকার সমান কথা হইয়া দাঁড়ায়। অতএব যাঁহারা এইরূপ কহেন যে, বৈষয়িক জ্ঞানের ভিতর হইতে সাকার মাত্রাবিশিষ্ট যাবদীয় পদার্থ বাদ দিতে দিতে, সাকার সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হইয়া আসিলে, তবে ছাঁকা খাঁটি ব্রহ্মজ্ঞান পাওয়া যায়, তাঁহাদিগের মতে ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা সম্পূর্ণ একটা স্বতন্ত্র ব্যাপার—তাহা আমাদিগের জ্ঞানের সম্পূর্ণ অগম্য। জ্ঞান বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহার ভিতর উপরোক্ত দুইটি ভাব থাকিবেই থাকিবে। অতএব কি বৈষয়িক জ্ঞান, আর কি পারমার্থিক জ্ঞান, কোন জ্ঞানই জ্ঞানের মূল স্বরূপকে এড়াইয়া যাইতে পারে না। তবে উক্ত দ্বিবিধ জ্ঞানের মধ্যে বিভিন্নতা এই যে, বৈষয়িক জ্ঞানে যে অসীম ভাব পাওয়া যায়, তাহা অভাবাত্মক, সে অসীম ছায়ার ন্যায় সসীমের অনুবর্ত্তী; এই জ্ঞানে সসীম ও সাকারই জাগ্রত, অসীম ও নিরাকার ঘোর নিদ্রিত। পারমার্থিক জ্ঞানে ঠিক

তাহার বিপরীত লক্ষণই প্রকাশ পায়। এই খানে সসীম বা সাকার, ছায়ার ন্যায় কলের পুত্তলিকার ন্যায়, অসীম ও নিরাকার ভাবের অনুসরণ করে। বৈষয়িক জ্ঞানের ন্যায় পারমার্থিক জ্ঞানে অসীম ভাব নাস্তির সহিত, অভাব বা অন্ধকারের সহিত তুলনীয় নহে। এখানে অসীম ও নিরাকার ভাবই একমাত্র আলোক স্বরূপ বলিয়া অনুভূত হয়।

একই জ্ঞানে এমন বিপরীত ও বিরোধী লক্ষণাপন্ন প্রকার ভেদ জন্মায় কিসে? আমরা বলি আশ্রয় ভেদে ও লক্ষ্য ভেদে। আশ্রয় ও লক্ষ্য ভেদে বলিবার মানে এই যে, আশ্রয়ীভূত বিষয় গতিশীল হইলেও নিশ্চল বলিয়া বোধ হয়, আর তৎকালে নিশ্চল পদার্থ সমূহে লক্ষ্য স্থির করিলে, তাহারা নিশ্চল হইলেও আমাদিগের নিকট সচল বলিয়া বোধ হয়। যখন আমরা জড় জগতে অবস্থিত হইয়া, অর্থাৎ ঐন্দ্রিয়িক *বিষয়াদিকে আশ্রয় করিয়া, জ্ঞানালোচনা* করিতে যাই, তখন তাহারাই জ্ঞানের আসল বিষয় হইয়া উঠে, সুতরাং তাহার তুলনায়, নিরাকারের ভাব নিতান্তই অস্থির ক্ষণভঙ্গুর দুর্ব্বোধ্য স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হয়,—হইবারই কথা। এমন আশ্রয় যদি বদলাইয়া যায়, জড় জগত হইতে আসন গুটাইয়া লইয়া আপনাতে যদি আসন পাতিয়া বসা যায়, আর সেখান হইতে জড় জগতের দিকে তাকান যায়, তাহা হইলে বোধ হইতে থাকে যে, 'আমিত্ব' যাহা, তাহার আর নড়চড় নাই; ধ্রুব নক্ষত্রের মত চিরস্থির; আর এই যে সসীম ও সাকার জগত—ইহা অনিত্য পরিবর্ত্তনশীল, এই আছে এই নাই, সুতরাং ইহা অভাব অবিদ্যা মায়ার একমাত্র দৃষ্টান্ত স্থল। অতএব আশ্রয় ও লক্ষ্য ভেদে জ্ঞানের উক্ত দ্বিবিধ অংশের সত্যতা সমান ভাবে সকল সময় বোধ হয় না।

পারমার্থিক জ্ঞান সম্বন্ধে আমাদিগের আর একটু বলিবার আছে। বৈষয়িক জ্ঞান যাহা বিষয়ের অন্বেষণে প্রবৃত্ত থাকিয়া বহির্ম্মুখী হইয়া পড়ে পারমার্থিক জ্ঞানে তাহা আর ঘটে না। আমি স্বয়ং ইহার আলোচ্য বিষয় বিধায় সহজেই ইহা অন্তর্মুখী হইয়া উঠে। বৈষয়িক জ্ঞান যেমন একদিকে, বাহ্যজগতের মূল তন্ন তন্ন করিয়া খুজিয়া দেখিতে চায়, পারমার্থিক জ্ঞানও ঠিক সেই প্রকার অপর দিক হইতে, অন্তর্জগতের বা সাদা কথায়—আপনার নিজের গোড়া কোথায়—তাহা আবিষ্কার করিয়া ফেলিতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু বৃথা চেষ্টা; উভয় দিকেই সেই মূল অজ্ঞেয়। সে একটা এমন জায়গা যে সেখানে ডগা গোড়া কিছুই পাওয়া যায় না, সুতরাং সে সম্বন্ধে *কোন কথা বলিবার অধিকার পাওয়াই* আমাদিগের পক্ষে অসম্ভব।

আসল কথা—জগতে ও আমাতে এমনি একটা বাঁধাবাঁধি আছে যে, সে বাঁধন ছিঁড়িলে দুইটাই অকূল অন্ধকারে ডুবিয়া যায়। শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধময় জগতে যদি শব্দস্পর্শাদি বোধসমূহের কোন বোধ না থাকা উচিত তাহা হইলে কে বলিত, এ জগত ব্যক্ত? আর জগত যদি ব্যক্ত না হইত, ত কোথায় থাকিত আমাদিগের জ্ঞান? জগত অব্যক্ত হইলেই জ্ঞান সুষুপ্ত হয়; আর জ্ঞান সুষুপ্ত হইলেই জগতে প্রলয় উপস্থিত হয়। অব্যক্তের মানে ইন্দ্রিয়াতীত অজ্ঞেয়; আর ব্যক্তের মানে ইন্দ্রিয়াধীন—জ্ঞেয়। এখন যদি বিচার করিয়া দেখা যায় যে,জগত ইন্দ্রিয় প্রভব, না ইন্দ্রিয়ই জগত প্রভব, রূপ

কোথায়—আমার চক্ষুব স্নায়ু গোলকের ভিতর, না এই দৃশ্য পদার্থের ভিতর; তাহা হইলে বলিতে হয় যে, যিনি বলেন রূপ আমার চক্ষুর ভিতর; আর যিনি কহেন তাহা নহে, রূপ এই দৃশ্যমান পদার্থের মধ্যে, তাঁহাদেব উভয়েরই উত্তর ঠিক। দ্রষ্টা দর্শন ও দৃশ্যের মধ্যে ও জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয়েব মধ্যে এমন একটা অপরিহার্য্য সম্বন্ধ আছে যে, একটির উদয় হইলে অপরগুলি যুগপৎ আপনা হইতেই আসিয়া উদয় হয়।

অতএব আমি যেমন জগতের ছাঁচে ঢালা 'কিছু,' জগতও তেমনি আমার ছাচে ঢালা 'কিছু'। আমি যেমন জগতের নিকট স্বরূপ লাভ করি, জগতও তেমনি আমার নিকট হইতে তাহার স্বরূপ লাভ করে। ফলতঃ জগত যদি না থাকিত, এ পাঞ্চভৌতিক দেহ যদি না পাইতাম, তাহা হইলে আমার দশা কি হইত? যে দশা হইত, তাহা কি আমার ভাবিয়া ঠিক করিবার কোন উপায় আছে? চারিদিক হইতে পাঞ্চভৌতিক অনুভব প্রবাহে, চিন্তা প্রবাহ উত্থিত হইয়া, আমাকে চেতনা দিয়াছে ও দিতেছে; আমাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে ও রাখিতেছে, এই স্রোত যদি বন্ধ হয়, তাহা হইলে আমার জায়গায় আমার পরিবর্ত্তে, কার্য্যহীন শক্তিবৎ, জন্মান্ধের দর্শন শক্তিবৎ, অজ্ঞান ও অচেতনবৎ যাহা একটি থাকে, তাহাকে অজ্ঞেয় অননুভাব্য 'কিছু' ছাড়া, আমাদিগের আর কিছুই বলিবার অধিকার থাকে না। আর অন্যদিকে আমি নিজে যদি না থাকিতাম, তাহা হইলে এই জগতকে অনুভব করিত কে? শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ—ইহারা কি? আমারই ত ইন্দ্রিয়ের খেলা। স্থান কাল—ইহারাই বা কি? আমারই ত মনের ক্রিয়া। স্থান কাল যদি না থাকিত, রূপ রস গন্ধ আদি যদি না থাকিত, তাহা হইলে এই জগত কোথায় থাকিত? এক অর্থে জগত মানে কি—না ইন্দ্রিয়ের বিকার। এই সকল ইন্দ্রিয় গোড়ায় যদি না থাকে, তাহা হইলে, জগতের উপর যে একটা ঘোর অন্ধকার যবনিকা আসিয়া পড়ে, তাহা সরাইবার আর কোন উপায় থাকে না। অতএব জগতে ও আমাতে যে বাধ্য বাধকতারূপ সম্বন্ধ আছে, তাহা কদাপি বিচ্ছিন্ন হইবার নহে।

অতএব সেই পারমার্থিক জ্ঞানই ঠিক, যাহা সাকার হইতে নিরাকারকে, অথবা নিরাকাব হইতে সাকারকে, টানিয়া বাহির করিবার চেষ্টা না করিয়া সাকারকে বজায় রাখিয়া, জগতকে জীবন্ত রাখিয়া আপনার মূলের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। এই স্থলে একটি মহা আপত্তি উঠিতে পাবে এই যে, আত্মমূলই যদি পারমার্থিক জ্ঞানের আলোচ্য হয়, আর সেই আত্মমূলকেই যদি প্রকৃত অসীমতত্ত্ব বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলেই বা তৎ অজ্ঞেয়ত্ব খণ্ডন হয় কই? সাকার ও নিরাকার যে আকারে খণ্ডতা প্রাপ্ত হইলে জ্ঞানের জ্ঞানত্ব সংসাধিত হয়, মূলে উক্ত দ্বিবিধ ভাবের তদাকারত্ব কদাচ প্রযুজ্য হইতে পারে না; সুতরাং মূল অজ্ঞেয় হইয়া পড়ে। সাকার ভেদে ও সাকারের তারতম্যে, জ্ঞানের বহুবিধ রূপান্তর ঘটিয়া থাকে। স্থূল সাকারবেষ্টিত জ্ঞানে সূক্ষ্ম জ্ঞান উপলব্ধি হয় না; গভীর নিদ্রায় যে স্বপ্ন দেখা যায়, জাগিয়া উঠিলে তাহা মনে থাকে না; গর্ভাবস্থায় যখন ছিলাম, তখন এই জ্ঞান কি আকারে ছিল, সাকার পদার্থে

গঠিত কোন্ কোন্ অলঙ্কার তাহার অঙ্গে শোভা পাইত, সবই ভুলিয়া গিয়াছি, কিছুই মনে নাই। এতটুকু আগেকার জ্ঞান, যদি এখনকার জ্ঞানে উপলব্ধি না হয়, তাহা হইলে মূলে জ্ঞানের যে স্বরূপ ছিল, তাহা অনুভব হইবে কিরূপে? আমাদিগের জ্ঞানের বর্ত্তমান রূপ পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা অঙ্কিত; সুতরাং তাহা সওয়ায় অপর একটি ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের কল্পনাও আমরা এক্ষণে করিতে অক্ষম; কিন্তু এমন যদি জীব কোন জগতে থাকে, যাহার শতাধিক ইন্দ্রিয়, তাহা হইলে সেই জীব সেই শতাধিক ইন্দ্রিয় দ্বারা, শতাধিক দিক হইতে, যে জ্ঞান পায়, আমরা কি তাহার কোন কল্পনা করিতে পারি? এমন যদি হয় যে, আজ আমাদিগের যে জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি বই নয়, জ্ঞানের উৎকর্ষক্রমে অথবা কোন অজ্ঞাত কারণে, যদি ইহার সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, দলে পুষ্ট হয়, তাহা হইলে আমাদিগের কালিকার জ্ঞান আজিকার জ্ঞানের সম্পূর্ণ অগম্য হইয়া পড়ে। অতএব আমার আপনার গোড়া যদি আমার নিকটে অজ্ঞেয়ই রহিয়া গেল, তবে আর হইল কি? সকল দিকেইত সমান অন্ধকার, সমান গোলযোগ। কেবল যুক্তির চরণে রাশি রাশি ফুলচন্দন ডালি দিলে কি হইবে, ওদিকে যে আকাঙ্ক্ষার মুখে স্তূপাকার ছাইভস্ম পড়িতেছে। আকাঙ্ক্ষা যে চায়, আয়ও করি, তাহার কি হয়?

এবম্বিধ আপত্তিতে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, আত্মমূলকে যদি অসীমতত্ত্ব বা ব্রহ্মরূপে নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা হইলে ইহাকে অপর দিকের মত সমান অন্ধকার বলা যাইতে পারে না। আত্মমূলও অজ্ঞেয় বটে, কিন্তু এই অজ্ঞেয়ত্বে কিছু বিশেষত্ব আছে। সে বিশেষত্ব এই—অজ্ঞেয় শব্দের দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে; এক অর্থে অজ্ঞেয় ও অজ্ঞান সমতুল্য, যাহা কোন উপায়ে, কোন আকারে, কোন অবস্থায় কোন কালে জ্ঞানগম্য হয় নাই ও হইতে পারে না ও হইবে না, এক অর্থে অজ্ঞেয় বলিতে তাই বুঝায়, জ্ঞান নহে বলিয়া যাহা অজ্ঞেয় হয়, তাহা আর কদাচ জ্ঞেয় হইতে পারে না। এবম্বিধ অজ্ঞেয় তত্ত্বের আলোচনায় কিছুই ফল নাই, কিন্তু অজ্ঞেয় শব্দের আর এক প্রকার অর্থ আছে, তাহাতে অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত, এক কথা বলিয়া বোধ হয়। এমন কালী আছে, যা দিয়া লিখিলে কাগজের উপর কোন দাগ লক্ষিত হয় না, কাগজ খানি যেমন সাদা তেমনি থাকিয়া যায়, কিন্তু সেই কাগজ খানি অগ্নির উত্তাপে ধরিলে, অথবা তাহার উপর এক পোঁছ অন্য কোন জিনিস মাখাইলে, রাসায়নিক প্রকরণ বিশেষে, তাহাতে সুস্পষ্ট লেখা সমস্ত ফুটিয়া উঠে। কাগজ খানি যতক্ষণ না আগুনে ধরা হইয়াছিল, অথবা তাহাতে অপর কোন জিনিস মাখান না হইয়াছিল, ততক্ষণ কে জানিত যে, এমন সাদা কাগজের অঙ্কে, এতগুলি অক্ষর লুকাইয়া আছে। অতএব গোড়ায় যাহা অজ্ঞেয় থাকে, তাহা কোন না কোন একটি আকার লইয়া পরে ব্যক্ত হইলেও হইতে পারে, ইহাই হইল অজ্ঞেয় শব্দের আর এক প্রকার অর্থ। এবম্বিধ অর্থে অজ্ঞেয়তত্ত্বের আলোচনা নিষ্ফল নহে। কস্মিন্‌কালে কখন, কোন আকারে, তাহার কিনা

সেই আত্মমূলের বা অসীমতত্ত্বের, কোন প্রকার অভিব্যক্তি ঘটিবে না তাহা ত আর নহে, লুপ্ত অদৃশ্য অঙ্কুর ফুটিয়া উঠিতে পারে, অজ্ঞেয় আবার কোন আকারে জ্ঞেয় হইতে পারে, যুক্তি ও আকাঙ্ক্ষার সমন্বয় ঘটিতে পারে। তা' যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে আত্মমূলকে জ্ঞানোন্মুখী অজ্ঞেয় বলিতে হানি কি? ভাল, জ্ঞানে ইহার পরিণতি ও বিকাশ সম্ভবপর কি না তাহ দেখা যাউক।

কার্য্যের কারণরূপে শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা। কার্য্যের প্রকাশ না ঘটিলে শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা অসম্ভব হইয়া উঠে। কার্য্যা ভাবে শক্তি চিরকাল ধরিয়া অজ্ঞেয় মায়ায় পড়িয়া থাকে। বীজ হইতে যদি অঙ্কুর না উঠিত, তাহা হইলে বীজের বৃক্ষোৎপাদিকা শক্তির কথা লইয়া কেহ নাড়া চাড়া করিত না। অতএব জ্ঞেয় শক্তির মানে কিনা কার্য্য, আর অজ্ঞেয় কার্য্যের নাম কি, না শক্তি। বৃক্ষ বীজাকারে পরিণত হইলে পর তাহার নাশ হয়, সেইরূপ কার্য্য কারণে পরিণত হইলেই তাহা লয় হইয়া থাকে। বীজে বৃক্ষ অজ্ঞেয়, অথচ তাহাতে বৃক্ষ আছে স্বীকার করিতে হইবে, কারণ তাহা না হইলে বৃক্ষ হয় কোথা হইতে? ঐ যে বালুকাকণাবৎ অশ্বত্থবীজ, উহাতে গোটা বৃক্ষটি অতি সূক্ষ্ম ভাবে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত আছে কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু উহার ভিতরে সমুদয় বৃক্ষের এমন একটা ঘনীভূত নির্য্যাস আছে, যাহা সময় পাইলে, মাটী জল ছায়া ও আতপ পাইলে, সময়ে ক্রমে ক্রমে একটি নূতন প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হইবে। ঐ ঘনীভূত নির্য্যাস পদার্থে এমন একটি জীবনী শক্তির গূঢ় ভাব অবস্থিতি কল্পনা করিয়া লওয়া হয়, যাহার বিকাশ ও পূর্ণতা প্রাপ্তির ফল কি—না বৃক্ষ। অভিব্যক্তিবাদিরা কহেন, এইরূপে জগত ও তদন্তর্গত সমস্ত পদার্থ অব্যক্ত হইতে ক্রমশঃ ব্যক্ত হইতেছে; শক্তি ক্রমশঃ কার্য্যে পরিণত হইতেছে, গোড়ায় যাহা অদৃশ্য ও লুপ্ত ছিল, ক্রমে পরদায় পরদায় তাহা ফুটিয়া উঠিতেছে। বার বার আলোক ও অন্ধকার, সুষুপ্তি ও জাগরণ সৃষ্টি ও প্রলয়ের ভিতর হইতে, মূল পদার্থের অধিক হইতে অধিকতর শক্তি প্রকাশ হইতে থাকে। যত অধিক আবর্ত্তন তত অধিক শক্তিপ্রকাশ—ইহাই হইল অভিব্যক্তি।

বৃক্ষের মধ্যে যে জীবনী শক্তি আছে তাহাই হইল বৃক্ষের ধর্ম্ম ও স্বভাব। সেই ধর্ম্ম বা স্বভাব হইতে যদি বৃক্ষ এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও বিচ্যুত হয়, তাহা হইলে বৃক্ষের অস্তিত্ব থাকে না ও থাকিতে পারে না। কিন্তু উদ্ভিদ জগতের ধর্ম্ম এক, জীব জগতের ধর্ম্ম আর। আবার উদ্ভিদই বল, আর জীবই বল, এতদুভয় জগতের অন্তর্গত প্রত্যেক উদ্ভিদের, প্রত্যেক জীবের, ধর্ম্ম বা স্বভাব স্বতন্ত্র। যাহা একের পক্ষে অমৃত, অন্যের পক্ষে তাহা বিষ হইলেও হইতে পারে। শীতের ফসল গ্রীষ্মে জন্মায় না। পাহাড় জাত লতাগুল্ম সমতল উর্ব্বরক্ষেত্রে অনেক খুঁজিলেও পাওয়া যায় না। জীব জগতের সম্বন্ধেও তাই। মানুষের সম্বন্ধেও এই নিয়মের ব্যত্যয় নাই। যে আশ্চর্য্য সম্বন্ধে এই বাহির, আর এই অন্তর, উভয়ে সম্বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাহার সঠিক নিরূপণ অতীব সুকঠিন। বাহিরের নানাবিধ ঘটনার নানা রকম সংমিশ্রণে, অন্তরের

কিরূপ ঘাত প্রতিঘাত উঠে, তাহা প্রায় ঠিক গণিয়া বলা যায় না। মানুষের বেলাতেও দেখা যায় যে, দুইজন লোক যদি ঠিক একই রকম ঘটনা চক্রে পতিত হয়, তথাপি তাহাদের পরস্পরের মনের গতি বিধি সমান ধারা হয় না। ফরাসী বিপ্লবে অনেকেই যোগ দান করিয়াছিল, কিন্তু নেপোলিয়ন হইতে পারিয়াছিল কয়জন? অন্তঃকরণ মধ্যে যে বীজ নিহিত থাকে, অনুকূল অবস্থা চক্রে না পড়িলে তাহা হইতে ফলের প্রত্যাশা করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। যে ঘটনা চক্রের ভিতর পড়িয়া নেপোলিয়নের স্বভাবের বিকাশ ঘটিয়াছিল অপর সকলের পক্ষে যে তাহা ঘটিতেই হইবে, এমন ধরা বাঁধা কিছু নাই। অতএব কার্য্যের বৈচিত্র্য দর্শনে শক্তির বৈচিত্র্য, অবশ্য মানিয়া লইতে হয়। এমন হইতে পারে যে, মূলে সকল শক্তিই এক সাধারণ মূল শক্তির প্রকার ভেদ মাত্র। যদি এমন এক সর্ব্বসাধারণ মূল শক্তি থাকে, তবে তাহা আমাদিগের উপলব্ধি করিবার কোন উপায় নাই। আমাদিগের স্বীয় অন্তঃকরণ মধ্যে সেই শক্তির যেরূপ বিকাশ ঘটে, আমরা তদ্দ্বারা জগতের সকল পদার্থকে রঞ্জিত করিয়া লই। কোন একজন বিখ্যাত গ্রন্থকার লিখিয়া গিয়াছেন যে, কোন বন্য মহিষের যদি ঈশ্বর বোধ থাকে, তাহা হইলে সে তাহার আপনার ঈশ্বরকে এক প্রকাণ্ড বন্য মহিষের মত বলিয়া বুঝিয়া লইবে। ব্যক্তিগত বিকাশের সহিত, তৎসমশ্রেণীস্থ অপরাপর লোকের বিকাশের অনেকটা সামঞ্জস্য থাকিলে থাকিতে পারে; কিন্তু তা বলিয়া তাহার সহিত, কীটাণু হইতে যাবতীয় জীবের বিকাশের তুলনা ও সম্মিলন করিতে যাওয়া, অনেকটা দুরাশা বলিয়া বোধ হয়।

বীজ নিহিত স্বভাব বা আদর্শ শক্তির বশবর্ত্তী হইয়া বৃক্ষের যেমন সুন্দর অভিব্যক্তি ঘটে, জীবের সম্বন্ধেও সেই নিয়ম বুঝিতে হইবে। উর্ণনাভকে কেহ শিখাইতে আসে না, অথচ সে আপনা হইতে এমন সুন্দর, এমন আশ্চর্য্য জাল প্রস্তুত করে যে, মানুষের সকল কারুকার্য্য তাহার কাছে হার মানিয়া যায়। এক প্রকার বৃক্ষ আছে, কীট পতঙ্গের শরীরের রসে তাহার শরীর পুষ্ট হয়। কেমন আশ্চর্য্য উপায়ে কীট পতঙ্গ ধরিয়া তাহাদের রস শোষণ করে। বৃক্ষকে কিছু কেহ এ বিষয় শিখাইতে আসে নাই। ঐ সমস্তই সেই আদর্শ শক্তির ক্রিয়া, সকলি সেই অব্যক্ত শক্তির অভিব্যক্তি। আপন আদর্শ বা স্বভাবকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। যন্ত্রের ন্যায়, পুত্তলিকার ন্যায়, ছায়া বাজীর ছায়ার ন্যায় সকলেই এই মূল আদর্শ শক্তির অধীনে থাকিয়া, সংসার রঙ্গ-ক্ষেত্রে অভিনয় করিয়া চলিয়া যায়; অথচ কেহ অধীনতা শৃঙ্খলের দুঃসহ যন্ত্রণা ভার তিলমাত্রও অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। তাহার মানে এই যে, আদর্শ শক্তির অধীন হওয়াও যাহা, স্বাধীন হওয়াও তাই। 'স্ব' বলিতে স্বভাব ও আদর্শই বুঝাইয়া থাকে।

এই খানে পারমার্থিক জ্ঞানের আর একটি সোপানে আমরা উঠিলাম। বৈষয়িক জ্ঞানে সাকার ও নিরাকার বোধ, ভাবাভাব বোধের ন্যায়, বৈপরীত্য হিসাবে প্রকাশ পায়। পরস্পর বড়ই বিরোধী লক্ষণাপন্ন; অথচ একত্রে না থাকিলে জ্ঞানের ঘর ভাঙ্গিয়া যায়; কাজেই কি করে, বকাবকির

দম্পতির মত; একত্রে এক রকম করিয়া, মিলিয়া মিশিয়া, ঘরকন্না করে। পারমার্থিক জ্ঞানে এমন কলহের কোলাহল শুনা যায় না; পরম প্রীতি রূপ ভিত্তির উপর তাহাদিগকে মিলিয়া থাকিতে দেখা যায়। আত্মমূলকে শক্তি রূপে কল্পনা করিতে গিয়া যে নিরাকার বোধের উৎপত্তি হয়, সসীম ও সাকার আসিয়া তাহার উদ্বোধন করে। এখানে অসীম ও সসীমে নিরাকার ও সাকারে, মিশিয়া এমন হয় যে, তাহাতে অসীম যেন ঠিক সসীম হয়, আর সসীম যেন ঠিক অসীম হইয়া যায়। পারমার্থিক জ্ঞান স্বভাবের উপর নির্ভর করিয়া রাগ বা ভাব মার্গে যাইতে চাহে, যুক্তি ও আকাঙ্খার সমাবেশ ও সমন্বয় করিতে চাহে।

আমরা সংসারের সকল ঘটনার ভিতরেই, সসীমে অসীম, অথবা অসীমে সসীম দেখিতে চাই, না বুঝিলেও আপনা হইতে আমরা স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া, সজনে নির্জ্জনে, সম্পদে বিপদে, সকল স্থলে, সকল অবস্থায়, সাকার ও নিরাকারের অভেদাত্মিক যোগ দেখিতে চাই। একটি সামান্য ঘটনা লইয়া এ বিষয়ে ইমারসন যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা যতদূর মনে আছে বলিতেছি, - একটি বালক ও বালিকা আশৈশব একত্রে থাকিয়া খেলা করিতে ভালবাসিত; ক্রমে তাহারা উভয়েই যৌবন সীমায় পদার্পণ করিল; হঠাৎ তাহাদের মনে কি হইল, তাহারা নিজেও তাহা বুঝিতে পারিল না, কিন্তু তাহার ফল হইল এই যে, উভয়েই উভয়ের একটু দূরে থাকিতে চায়; আর সে পূর্ব্বের নিঃসঙ্কোচ ভাব নাই, এখন উভয়েই পরস্পরের সম্মুখীন হইতে সঙ্কোচ বোধ করে, লজ্জা পায়, অথচ একজন আর একজনকে দেখিতে না পাইলে বড়ই ম্রিয়মান হয়। উভয়ের মধ্যে এমন ধারা ভাব কেন? যখন একজন আর একজনকে দেখিতে পাইলে স্বর্গের চাঁদ হাতে পায়, তখন আবার তাহাকে নিকটে পাইলে দূরে পলাইতে যায় কেন? প্রকৃত প্রণয়ের প্রথম সূত্রপাতে কেন এই প্রকার আশ্চর্য্য হৃদয়ের আবেগ উপস্থিত হয়? আর তাহাতে কেনবা এত মাধুর্য্য বোধ হয়? তাহার উত্তর এই যে মানব হৃদয়ে তদবস্থায় সসীম ও অসীম ভাবের যুগপৎ স্ফূর্ত্তির ছায়া আসিয়া পড়ে, আর তাই মানুষ প্রকৃত প্রণয়ে এতাধিক চরিতার্থতা লাভ করে। একদিকে প্রণয়ের পাত্রকে যেমন হৃদয়ে পূরিবার নিমিত্ত হৃদয়ের একটা স্বাভাবিক গতি হয়, অন্য দিকে সেইরূপ তাহাকে দূরে—অতি দূরে —রাখিতে, তাহাকে স্বর্গের দেবতা জ্ঞানে পূজা ও সম্মান করিতেও হৃদয়ের স্বাভাবিক চেষ্টা উপস্থিত হয়। হৃদয়ের এই দ্বিবিধ ভাবের মধ্যে, একটি ভাব যদি কোন গতিকে নষ্ট হয়, তাহা হইলে আর প্রকৃত প্রণয়ের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। যখন ভালবাসার মধ্যে একটা মধুর শ্রদ্ধার ভাব দেখা দেয়, অতিমাত্র নম্রতা ও কোমলতার উদয় হয়, যখন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সেই একই মুখ নূতন নূতন বলিয়া বোধ হয়, যখন হৃদয়ের মধ্যে পাইয়াও হৃদয়ের অতৃপ্তি, অনন্ত থাকিয়া যায় বলিয়া বোধ হয়, তখনই তাহার নাম প্রণয়। এই খানে সসীম ও অসীমের, সাকার ও নিরাকারের অভেদাত্মিক যোগের একটি ছায়া মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, আমরা এ বিষয়ে একটি মাত্র উদাহরণ দিয়া ক্ষান্ত হইলাম। চিন্তাশীল ব্যক্তি জীবনের অনেক

ঘটনার ভিতর, অন্তঃকরণের অনেক চিন্তার ভিতর, ইহার সত্যতা পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারেন।

অতএব পারমার্থিক জ্ঞানের বিধান এই যে, শক্তি যেমন কার্য্যের সহিত অভিন্নভাবে অবস্থিতি করে, এক কথায় কার্য্য যেমন শক্তির রূপান্তর মাত্র, অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ শক্তি প্রত্যক্ষ হইলেই যেমন কার্য্যের প্রকাশ হয়; সেই রূপ সেই মূল আত্ম-শক্তি বা স্বভাব নিরাকার হইয়াও আদর্শ-রূপে সাকারের সহিত অভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়। তাহাতে মীমাংসা এই দাঁড়ায় যে, সাকার যাহা, তাহা নিরাকারের অবস্থা পরিবর্ত্তন মাত্র—সাদা কথায় সাকার বলিতে বুঝি কি—না প্রত্যক্ষ নিরাকার। অতএব সাকার পূজা কর ত, নিরাকারের পূজা করিতেই হইবে; আর নিরাকারের পূজা কর ত সাকার পূজা করিতেই হইবে। সাকার ভাবাবলম্বনে অন্তরে যে আদর্শ গঠিত হয়, তাহাই সেই অব্যক্ত মূল স্বভাবের একমাত্র অভিব্যক্তি, সুতরাং তাহা আমরা কোন ক্রমে কোন উপায়ে এড়াইয়া যাইতে পারি না। কথাটা যথা সাধ্য পরিস্কার করিয়া বলিতেছি।

অন্তর্নিহিত শক্তির প্রকার ভেদ ব্যতি-রেকে, বাহ্য প্রত্যক্ষ সাকার রূপের ভিন্নতা উৎপাদিত হওয়া কদাচ সম্ভবপর নহে। প্রকৃতিগত ভিন্নতা না থাকিলে, দৈহিক মানসিক ভিন্নতা হইবে কোথা হইতে? জড় জগতই বল, আর উদ্ভিদ জগতই বল, আর প্রাণী জগতই বল, সকলেই স্ব স্ব অন্ত-র্নিহিত নিগূঢ় প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশের পথে ধাবমান। মনুষ্যও এই নিয়মের অধীন। প্রকৃতিগত যে পার্থক্য বলে মানুষ—মানুষ হইয়াছে, যতদিন না সেই প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ ঘটে, ততদিন পর্য্যন্ত মানুষের প্রাণ ইহ জগতে শান্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। যিনি আপন প্রকৃতির বা স্বভাবের প্রকৃত পরিচয় পাইয়াছেন, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, অথবা ব্রহ্মজ্ঞান যে কি জিনিষ, তাহা বুঝিয়াছেন।

এই খানে একটুক গোলযোগ উঠিতে পারে, স্বভাবের গোড়াও যেমন অজ্ঞেয়, ডগাও তেমনি অজ্ঞেয়; গোড়ায় কি ছিলাম তা যেমন মনে পড়ে না, সকলের শেষে কি হইব, তাহাও তেমনি মনে আসে না, তা যদি হয়, তাহা হইলে আর স্বভাবের পরিচয় লই কেমন করিয়া? বাস্তবিক কথাও তাই। আমাদিগের জ্ঞানের দুই ধারে যে পরদা খাটান আছে, তাহা সরাইয়া দেখিতে গেলে, জ্ঞান এমন একটা জায়গায় গিয়া পড়ে, যেখানে কোন কূল কিনারা পাওয়া যায় না; কাজেই জ্ঞান সেখানে নিস্তব্ধ মারিয়া যায়। সুতরাং গোড়ার খবর বলবার অধিকার আমাদিগের কি আছে? আমাদিগের যা কিছু নাড়া চাড়া, এই মাঝখানকার কথা লইয়া। এই মাঝ-খানে দাঁড়াইয়া আমরা দেখিতে পাই যে, এক একটি বিশেষ ভাব হৃদয়ের সমুদায় জায়গা অধিকার করিয়া রহিয়াছে, আর তাহারই উত্তেজনা বশে মানুষ মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় ছুটিয়া ইহ জগতে নানা প্রকার আত্ম বিকাশ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। যে বিশেষ ভাব অবলম্বন করিয়া, ভিতরের সেই অজ্ঞেয় স্বভাব জ্ঞেয়াকারে প্রথম প্রস্ফুটিত হয়, তাহাকে রস ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। এই যে রস, ইহাতে স্বভাব ব্যক্ত অথচ অব্যক্ত, জ্ঞেয় অথচ অজ্ঞেয়; ইহাই স্থূল সাকার ভাবাবলম্বনে পরিশেষে আদর্শে পরিণত হয়। ক্রমশঃ—

শ্রীবিপিন বিহারী সেন।

ইন্দ্র-চন্দ্র সংবাদ।

(৯ম)

১লা মে—লণ্ডন সেতু (The London Bridge)। শতাব্দী পূর্ব্বে লণ্ডন রাজধানীতে একটী মাত্র সেতু ছিল, সেটী এই। ১১৭৬ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় হেনরির সময়ে আরব্ধ হইয়া ১২০৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজা জনের আমলে সমাপ্ত হয়। সাধারণ রাজপথের ন্যায় ইহার উপরে একটী গির্জ্জা, দুই ধারে রীতিমত বাস গৃহাদি ও দুই মুখে দুইটী দুইটী প্রকাণ্ড দুর্গ-ফটক নির্ম্মিত হয়। এই ফটকদ্বয়ের উপরে লোক-শিক্ষার্থ রাজদ্রোহী প্রভৃতি গুরুতর অপরাধীগণের ছিন্নমুণ্ড রাখা হইত। পুরাতন স্থান হইতে ৬৬ হাত দূরে, ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে, এই নূতন সেতু অনুষ্ঠিত করা যায়। এখন আর গির্জ্জাগৃহাদি কিছু নাই। ইহা ৯২৮ ফুট দীর্ঘ ও ৫৪ ফুট প্রস্থ; পাঁচটী গ্রানিট পাথরের খিলানের উপর স্থাপিত, নিজ মধ্যবর্ত্তী খিলানের পরিসর (Span) ১৫২ ফুট। নেপোলিয়নের সময়ের স্পেনীয় যুদ্ধে (Peninsular war) হৃত ফরাসি কামানের ধাতুতে দুধারের বাতি স্তম্ভগুলি (Lamp posts) ঢালা হয়। গণনা দ্বারা সংখ্যা করা হইয়াছে, প্রত্যহ গড়ে পঞ্চদশ সহস্র গাড়ী ও একলক্ষ লোক পদব্রজে সেতু পার হয়।

৮ই মে—মনুমেণ্ট (The Monument), ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ২রা হইতে ৭ই মে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত লণ্ডন নগরে একটী ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হয় (The great Fire of London)। এই অনলে ৪৬০টী রাজপথ, ৮৯টী গির্জ্জা ও ১৩২০০ গৃহ, একুনে প্রায় দশ কোটী টাকার সম্পত্তি ধ্বংস হয়। এই স্তম্ভ তাহারই স্মরণার্থ চিহ্ন; এই স্থানের নিকটে পুডিং গলিতে (Pudding Lane) অগ্নি আরম্ভ হয় বলিয়া এখানে নির্ম্মিত। ইহা ২০২ ফুট উচ্চ, কথিত আছে, যে গৃহ হইতে আগুন উঠে, তাহা হইতে ইহার দূরতা ও উচ্চতা ঠিক সমান। ৩৪৫টী ধাপের গোল সোপান দ্বারা উপরে উঠিতে হয়। বহু লোক উপর হইতে পড়িয়া আত্মহত্যা করার দরুণ এখন প্লাটফরমটী (Platform) লৌহপিঞ্জরে আবৃত।

১০ই মে ভিক্টোরিয়া পার্ক (Victoria Park)। ইহা পূর্ব্বাংশস্থ দরিদ্র পল্লির জন্য, প্রায় নয়শত বিঘা জমির উপর, ১৭ লক্ষটাকা ব্যয়ে স্থাপিত। ইহার পূর্ব্বদিক খোলা ময়দান, ক্রীড়াদি ব্যায়াম জন্য নির্দ্দিষ্ট। পশ্চিমাংশে বেড়াইবার স্থান, ফুলের কেয়ারি ও দুইটী জলাশয়। এখানকার ফুলের বাহার কোন কালে ভুলিবার নয়। এক এক স্থান এমন সুন্দর ভাবে সাজান যে, অতি বিচিত্র ফুলতোলা কারপেট তাহার নিকট তুচ্ছ, অগ্রাহ্য। প্রকৃতিকে শিল্পের অধীনে আনিয়া সংসারের শোভা বর্দ্ধন ও সুবিধা করিতে ইহারা যে অতুল ক্ষমতা ধরে, এই সকল তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তৃণ, পত্র, লতা, পুষ্প এক এক স্থানে এরূপ প্রণালীতে সাজাইয়া রাখিয়াছে যে, সুখ শয্যা বলিয়া তাহার উপর গড়াগড়ি দিতে ইচ্ছা হয়। এখানে চক্ষু সার্থক হইল।

১৫ই মে—ওয়েষ্টমিনিষ্টর আবি (Westminister Abbey) "The spaciousness and gloom of this edifice produce a profound and mysterious awe. We step cautiously and softly about as if fearful of disturbing the hallowed silence of the tomb; while every footfall whispers along the walls, and chatters among the sepulchres, making us more sensible of the quiet we have interrupted. It seems as if the awful nature of the place presses down upon the soul, and hushes the beholder into noiseless reverence. We feel that we are surrounded by the congregated bones of the great men of past times, who have filled history with their deeds, and the earth with their renown."—Washington Irving. বাস্তবিক ইহা অপেক্ষা আর উত্তম বর্ণনা হয় না। সুবিস্তৃত আয়তন, চারিদিগের গাম্ভীর্য্য, দর্শকগণের ধীরে ধীরে পাদবিক্ষেপ, সামান্য শব্দের মৃদু প্রতিধ্বনি, এই সকল একত্র হইয়া বিরাট সমাধিমন্দিরের চিরনিদ্রায় নিদ্রিত অধিবাসিগণের পবিত্র অমরাত্মার প্রতি যেন শোকসন্তপ্ত কৃতজ্ঞ হৃদয়ের সরল সম্মান প্রদান করিতেছে। সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মন্ত্রীবর পিট (William Pitt, Lord Chatham died 1778)।

ভারত লাট মহাত্মা ক্যানিং (Charles John Viscount Canning died 1862)।

ব্রাইট-বন্ধু উন্নত মনা বার্ত্তাশাস্ত্রবিদ কবডেন (Richard Cobden, champion of Free trade, died 1865)। নবাবী আমলের ৺ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নৌসেনা নায়ক ওয়াটসন (Admiral Watson died 1757):—টোগা (Toga) গায়ে তালবৃন্ত হস্তে উপবিষ্ট; দক্ষিণে কলিকাতা নগরী জানুপাতিয়া জেতার নিকট দরখাস্ত দিতেছে, বামে শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দী চন্দননগর-রূপী ভারতীয় পুরুষ।

গোলামী বিমোচনের জনৈক প্রধান উদ্যোগী উইলবারফোর্স (William Wilberforce died 1833)।

জগদ্বিখ্যাত নিউটন (Sir Isaac Newton died 1726):—মাধ্যাকর্ষণাবতারের দুই পার্শ্বে দুই দেবযোনি জ্ঞানের জড়ান কাগজ (Scroll) এলাইতেছে, ঊর্দ্ধে প্রকাণ্ড গোলকের উপর জ্যোতির্ব্বিদ্যার মূর্ত্তি, নিম্নে মর্ম্মর ফলকে (Relief) সুধীবরের গবেষণাদি প্রদর্শিত।

বিবর্ত্তনবাদ প্রচার দ্বারা জ্ঞান রাজ্যে যুগ পরিবর্ত্তনকারী মহর্ষি দার্ব্বীন (Charles Darwin died 1882)

প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিশারদ হর্শেল (Sir John Herschel died 1871)

সভ্য জগতের নববিকাশের মূলীভূত কারণ, রেল গাড়ীর সৃষ্টিকর্ত্তা ভুবনবিখ্যাত ষ্টিফেন্‌সন্ (Robert Stephenson, The Engineer died, 1859)

ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতবর লায়েল (Sir Charles Lyell, the geologist died 1855)

সুপ্রসিদ্ধ রাজ মন্ত্রী পিট (William Pitt died 1806) চান্সেলরের (Chancellor of the Exchequer) পোশাকে উচ্চাসনে দণ্ডায়মান সচিববর বক্তৃতা করিতেছেন; নীচে দক্ষিণ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ইতিহাস নিবিষ্টচিত্তে শুনিতেছে, বামদিকে অরাজকতারূপী দুর্বৃত্ত পুরুষ শৃঙ্খলাবদ্ধ।

ভারতবন্ধু অমায়িক লাট লরেন্স (Lord Lawrence died 1879)

সিপাহী বিদ্রোহানল নির্ব্বাপক মহাবীর ঔটরাম (Sir James Outram, General died 1863):—নিম্ন দেশে, মধ্যে হ্যাবলক্‌কে রাখিয়া ঔটরাম ও লর্ড ক্লাইভ হস্ত মিলাইতেছেন; উভয় পার্শ্বে ভারতের নানা জাতীয় লোকের শোকার্ত্ত মূর্ত্তি।

আফ্রিকার সুবিখ্যাত প্রচারক ও পর্য্যটক ধর্ম্মবীর লিভিংষ্টোন (Dr. David Livingstone died 1873):—দুই জন কাফ্রিভৃত্য অতি কষ্টে বিপদসঙ্কুল মধ্যে আফ্রিকার পর্ণকুটীর হইতে প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের পবিত্র দেহ এখানে আনয়ন করে। নিগ্রো-দের কৃতজ্ঞতা-জনিত প্রেম ও আত্মত্যাগী মহাসেবক পরম ভক্তের সম্মানদাতা দয়াল হরির কৃপা ও প্রত্যক্ষ শক্তি দ্বারা সাহায্য ব্যতীত এরূপ দুরূহ ব্যাপার কিছুতেই সাধিত হইবার নয়।

কবিবর গে (John Gay, the poet d. 1732) ইহাঁর নিজের রচিত একটী শ্লোক সমাধি প্রস্তরে অঙ্কিত।

"Life is a jist; and all things show it.
I thought so once, but now I know it."

সুদীর্ঘ জীবী পার (Thomas Parr, a husbandman of Shroffshire died, 1635); ইনি ১২০ বৎসর বয়সে দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ দ্বারা সন্তানাদি রাখিয়া ১৫২ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। শেষ পর্য্যন্ত বেশ সবল ও সুস্থ ছিলেন।

এই প্রকারে চসর, সেক্ষপীর, মিল্‌টন, মেকলে প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গের ও রাজা রাজড়া আমীর ওমরা স্ত্রী পুরুষের সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় তিন শত মর্ম্মর সমাধি ও মূর্ত্তি এবং স্মরণচিহ্ন এই গৃহে স্থাপিত।

একাংশে গির্জ্জা, তথায় যথানিয়মে উপাসনাদি হইয়া থাকে। দেওয়ালে মুসা, দাউদ, পল ও পিটরের খোদিত মূর্ত্তি। এই গির্জ্জায় ইংলণ্ডের রাজা রাজ্ঞীর অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন হয়। ১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দে নরপতি হারল্‌ড (King Harold) হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া পর্য্যন্ত এইস্থানে সবাই অভিষিক্ত হইয়াছেন। অভিষেকের জন্য দুইখানি সিংহাসন আছে, চারিটী সিংহ মূর্ত্তির উপর চারিটী পাদ রক্ষিত। প্রথমখানি ১২৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজা প্রথম এড্‌ওয়ার্ড (Edward I) কর্ত্তৃক স্কটলণ্ড হইতে আনীত হয়; ঐ সঙ্গে পিঁড়ির মত একখণ্ড প্রস্তর আসে, তাহার পূর্ব্ব নাম "যাকুবের বালিশ" (Jacob's Pillow); কিন্তু সেই অবধি বরাবর অভিষেক কালে সিংহাসনের নীচে রাখা হইয়া আসিতেছে বলিয়া ক্রমে "অভিষেক প্রস্তর" (Coronation Stone) নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় মেরি (Mary II) ও তাঁহার স্বামী তৃতীয় উইলিয়ম (William III) একত্রে অভিষিক্ত হন; সেই সময়ে দ্বিতীয় সিংহাসন খানি প্রস্তুত হয়।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুন তারিখে, রাজ্যভার গ্রহণের এক বৎসর পরে, বিশেষ জাঁক জমকের সহিত বর্ত্তমান ব্রিটনেশ্বরীর অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অতি বাহুল্য ব্যাপার, যজ্ঞের অনেক গুলি অঙ্গ, সুতরাং এখানে বর্ণনার স্থানাভাব। কেবল মাত্র অভিষেক কার্য্যের মন্ত্রটী দিলাম। অর্দ্ধসের সোণার বাইট ও এক খানি মোহর অভিষেক দক্ষিণার নিয়ম।

"Be thou anointed with holy oil, as kings, priests, and prophets were anointed. And as Solomon was anointed king by Zodak the priest and Nathan the prophet, so be

you anointed, blessed and consecrated Queen over this people, whom the Lord your God hath given you to rule and govern, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Amen"

মহাবীর নেপোলিয়নের সহকারী ওয়া-টারলু প্রভৃতি বহু সমর-ক্ষেত্রে ইংরাজ বিরুদ্ধে অস্ত্রধারী সেনাপতি স্যুল্ (Marshal Soult) এই সভায় নিমন্ত্রণে আসিয়া উৎসবে সোৎসাহে যোগ দেওয়ায় ব্রিটীশ গৌরবের বিশেষ প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছিল। অভিষেক কাল হইতে এ পর্য্যন্ত সেই প্রতাপ অক্ষুণ্ণ ভাবে উজ্জ্বল থাকিয়া ক্রমেই অধিকতর দীপ্তিমান হইতেছে।

আবার অন্যান্যাংশে রাজপুরোহিতের বাসস্থান (Deanery); অনেক গুলি চক (Cloisters); সভাগৃহ (Chapter house), কলেজ স্কুল প্রভৃতি দশ বারটী অন্তরাবস্থানোপযোগী (Institutions) গৃহাদি আছে। সমস্ত ব্যাপার প্রায় ৫ বিঘা ব্যাপিয়া। গির্জ্জার উচ্চতা ১০২ ফুট, চূড়া ২২৫ ফুট উচ্চ।

৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজা সিবর্ট (King Sebert) কর্ত্তৃক টামসের ধারে চারিদিকে জলা বেষ্টিত এক খণ্ড ভিজা জমির উপর সেন্ট পিটরের উদ্দেশে একটী ছোট গির্জ্জা নির্ম্মিত হয়। জলাভূমি, কালে বসিয়া যাইবার সম্ভাবনা; এই জন্য সেল সন নিজের সমাধি এখানে নিষেধ করিয়াছিলেন। নির্ম্মাতা নরপতি সিবর্ট এই স্থানে সমাহিত। দিনামারগণ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইলে ৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে নৃপতি এডগার (King Edgar) দ্বারা পুনর্নির্ম্মিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন রাজগণের অধীনে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে পাইতে বর্ত্তমান বিরাট মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

রাজ্য মধ্যে এরূপ সমাধি মন্দিরের বিশেষ উপযোগিতা। ওয়েষ্টমিনিষ্টর আবিতে সমাধিস্থ হওয়া একটা উচ্চাশার কথা। মর্ত্ত্য জীবন তিন দিনের, কিন্তু এই নশ্বর দেহ সম্মানের সহিত ঐরূপ স্থানে স্থাপিত হইলে সংসারে অমরত্ব লাভ হয় সন্দেহ নাই। এই মহা গৌরবের জন্য অনেকে দৌড়িতেছেন এবং তদ্দ্বারা সংসারের বিলক্ষণ উন্নতি হইতেছে। মানব জীবনের উচ্চতর আদর্শ পৃথিবীতে প্রচারিত ও নিঃস্বার্থ সেবার জলন্ত জ্যোতিঃ জগতে বিকীর্ণ হইয়া অশেষবিধ কল্যাণ সাধন হইতেছে।

রামায়ণ বিষয়ে কথোপকথন।

রামধন। হরিহর বাবু, আপনাদের কাছে আমাদের আসিতে লজ্জা করে: আপনারা কৃতবিদ্য, জ্ঞানী, আমরা নিরক্ষর মূর্খ।

হরিহর। (সগর্ব্বে) তা কেন, তা কেন; বলি রামধন, বেশ ভাল আছ ত?

রামধন। আমাদের আর ভালমন্দ কি? যে দিন কাল পড়েছে, তাতে ইংরাজি না

আনলে তো দু পয়সা রোজগারের প্রত্যাশা নেই, সর্ব্বদাই অর্থ চিন্তায় বিব্রত।

হরিহর। এক অর্থে অর্থ চিন্তা সকলেরই আছে। তোমরা না হয়, টাকা কড়ি রূপ অর্থের কথা ভাব, আমরাও পদের অর্থ নিয়ে অনেক সময়েই চিন্তাগ্রস্ত। কাল একটা সমস্যার হাতে পড়ে সারারাত্রি ঘুম হয় নি।

রামধন। (হাসিয়া) মহাশয়, সেতো সুখের চিন্তা। পেটে যদি ক্ষুধা না থাকে, তবে অমন চিন্তা কর্ত্তে ভাবনাটা কি?

হরিহর। বল কি, এই যে সমস্যাটার কথা বলছিলাম, অনেক কষ্টে তার মীমাংসা হওয়ায় আজ একটু ভাল আছি।

রামধন। আপনাদের কাছে বসিলে যাহোক কিছু শিক্ষার প্রত্যাশা করা যায়। আপনি যে সমস্যা পূরণ করেছেন, সেটা বলিলে আমরা বুঝিতে পারি কি?

হরিহর। তা অনায়াসে; আমি খুব সহজে বুঝিয়ে দেবো। কথাটার এখন মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। আর গোল নাই। কিন্তু এতাবৎকাল সমস্ত পৃথিবীর লোক, সেই ছোট কথাটার ভ্রান্তিতে পড়িয়াছিল; কি আশ্চর্য্য?

রামধন। বলুন, শোনা যাক; দেখি আমারও যদি ভ্রান্তিটা ঘোচে।

হরিহর। কথাটা এই যে, এ পর্য্যন্ত লোকে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছিল যে, বাল্মীকি নামে একজন কবি রামায়ণ নামে একখানা গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন। কি ভ্রান্তি দেখ দেখি?

রামধন। ইহার ভ্রান্তি কোন্ কথাটায়? বাল্মীকি বলিয়া যে কেহ কবি ছিলেন, সেইটি ভুল; না, তিনিই যে রামায়ণ প্রণয়ণ করিয়াছিলেন, সেইটীই ভুল?

হরিহর। কি বল্‌ব রামধন, উহার আগাগোড়াই ভুল। রাম ভুল, রামায়ণ ভুল, বাল্মীকিও ভুল।

রামধন। কি বলেন মহাশয়, আমি কাল যে এত দুঃখেও পাঁচ সিকা খরচ করিয়া একখানা রামায়ণ কিনিয়াছি।

হরিহর। You have paid for your foolishness, যা হবার তা হোয়েছে। উঃ, কাল যদি আমার চিন্তায় এ প্রহেলিকার রহস্যোদ্ভেদ না হ'ত, তা হলে আরও না জানি কত লোকের কত কাল এই ভ্রমের দণ্ড ভোগ করিতে হইত।

রামধন। আপনি যে এত দিনের এত বড় কথাটাকে ভুল বলিয়া বসিলেন, তা, কি রকম কি বলুন দেখি?

হরিহর। এর আবার রকম সকম কি? যা ভুল, তা ভুল, অর্থাৎ কোন ক্রমেই সত্য নয়। সেটা বুঝলেত? না হয়, আর একটু খুলে বলি। এই মনে কর, চারি দিকে চারিটি অক্ষর A, I, E, O; এখন যদি E সত্য হয়, তবে A ভুল। কারণ উহারা সম্পূর্ণ বিপরীত বা Contradictory। সুতরাং যখন বলা গেল যে একটি সম্পূর্ণ ভুল, তখন আর সেটী আদৌ সত্য হইতে পারে না।

রামধন। (কাতর দৃষ্টিতে) কিছুই বুঝিলাম না।

রামধন। আর, ওইত বিপদ, Logic পড়া না থাকলে বড় গোল! তা, A, I, E, O, র পরিবর্ত্তে ক, খ, গ, ঘ, ভাবিয়া লইলেও চলে।

হরিহর। (সম্পূর্ণ নিরাশভাবে) হুঁ

তা ঐ গোড়ার কথাটা আগে বুঝাইয়া দিন যে রামায়ণটা ভুল; তার পরে না হয় আপনার এ কথাটা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

হরিহর। কি জান, Foundation টা ঠিক করা চাই; তা থাক্‌, তোমাকে না হয় একটু উল্টাপদ্ধতিতেই বুঝান যাক্‌।

রামধন। (সাগ্রহে) সেই বেশ্‌।

হরিহর। প্রথম দেখ রামায়ণটাই ভুল, অর্থাৎ রামায়ণ বলিয়া কোন পুস্তক রচিত হইয়াছিল, ইহার সম্পূর্ণ প্রমাণাভাব।

রামধন। অঁ্যা বলেন কি? তবে আমি যেখানা কাল কিনিলাম, সেখানা কি শনির পাঁচালী?

হরিহর। তা কেন, তোমরা এখন যে বই দেখিতে পাও সে খানা সম্পূর্ণ জাল, Spurious Copy.

রামধন। আসল থাকিলে তো তার নকল হয়? গোড়ায় যাহা নেই, তাহার আবার জাল হইল কি প্রকারে?

হরিহর। What a tedious fool! গোড়ায় যে একখান রামায়ণ ছিল, তাহার যে কোন প্রমাণ নাই, সেটা বোঝ না কেন?

রামধন। মহাশয়, গোড়া বলিতে আপনি কি বুঝিলেন, তা ত বুঝিলাম না। যখন সেই জাল হউক নকল হউক, একখানা হইল, সেই সময়েই ত একখানা হইল বুঝিব?

হরিহর। তোমার এত মোটা বুদ্ধি কেন বল দেখি? যখন গোড়ায় ছিল না, তুমি স্বীকার কচ্চ, তখন যা হল, সেটা জাল। যেটা জাল, সেটা যে আর ঠিক নয়, এটা বুঝতে আর গোল কর কেন?

(গদাধরের প্রবেশ)

ওহে গদাধর বাবু, শোন শোন, রামধনকে এই সোজা কথাটা বুঝাতে পাচ্চিনে যে, যেটা "জাল" সেটা আসল নয়।

গদাধর। (হাসিয়া) এর আবার একটা কথাই কি!

হরিহর। তাইত ভাই দেখ দেখি, What a[illegible] ass!

গদাধর। কিহে রামধন, "জাল" ও "আসল" এর প্রভেদ বুঝ্‌তে পাচ্চ না? "জাল" অর্থ যে ধীবরের মৎস্য ধরিবার যন্ত্র বিশেষ তা নয়। "জাল" অর্থ——

রামধন। (সবিনয়ে) আজ্ঞে এবারে বুঝিছি (স্বগতঃ) কি আপদ! এই এদের বিদ্যা বুদ্ধি! ভগবান করুন মূর্খ হইয়াই থাকি!

হরিহর। (সদর্পে) আচ্ছা ও Proposition এই পর্য্যন্ত। এখন দেখ; সেই জালের মধ্যে আবার কত জাল!

রামধন। (হাল ছাড়িয়া দিয়া) আজ্ঞে বলুন।

হরিহর। প্রথমে তো দেখান গেল যে, রামায়ণ বলিয়া এখন যে গ্রন্থ পাওয়া যায়, সেখানা জাল। তারপর সেই জাল গ্রন্থেরও প্রথম সংস্করণ যাহা পাওয়া গিয়াছিল, তাহার সহিত একালের গুলির মিল নাই।

গদাধর। (না বুঝিয়া) ওহো, তুমি বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের Difference টা establish কচ্চ? কর, আমি যাই।

(প্রস্থান)

হরিহর। (গদাধরের কথা না শুনিয়া) প্রথম সংস্করণের যে বই অর্থাৎ যেখানা ৩০২ সালে আলেকৃজণ্ডর প্রথম প্রাপ্ত হন; আর এসিয়াটিক সোসাইটীতে যেখানা এখনো কীটদষ্ট অবস্থায় পড়িয়া আছে; তাহাতে রাম বলিয়া কাহারও নামই নাই

রামধন। হরিবল হরি! আমার ঠাকুর অনেক সাধে, আমার নাম রাখিয়াছিলেন, "রামধন"। তা মরুকগে; মহাশয়, রাম বলিয়া কেহ ছিল না অথচ বই খানার নাম হইয়াছিল "রামায়ণ"। মাথা ছিল না কিন্তু মাথার ব্যথা ছিল। তাওকি কখন হয়?

হরিহর। হয় নাকি? এর সব Researches অর্থাৎ অনুসন্ধান হয়ে গিয়েছে। তুমি কি Sir. W. Jones, Prinseps প্রভৃতির কথা মানিতে চাও না?

রামধন। আজ্ঞে তাঁহারা কে জানি না; তবে তাঁহারা কি এত বড় কথাটা বলিয়া গিয়াছেন?

হরিহর। (হাসিয়া) Here it is রামধন, here it is! তুমি যদি ইংরাজি জানিতে, তবে বুঝিতে। (এই বলিয়া কতকগুলি এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণাল সহ ছেড়া কাগজ পত্র রামধনের সমক্ষে স্থাপন)।

রামধন। (নিতান্ত পরাভূত চিত্তে) আজ্ঞে সাহেবেরা———

হরিহর। কি বলচ বল না? তুমি সাহেবদের কথা মানিতে চাও না? আচ্ছা R. C. Dutt লিখিয়াছেন যে, রামায়ণটা কল্পিত উপন্যাস, এটা প্রত্যয় হয় কি না?

রামধন। আজ্ঞে ও নামটাও যে ইংরাজি হ'ল।

হরিহর। ভাল আপদেই পড়িচি। তিনি যে বাঙ্গালী, এ বুদ্ধিটুকুও নাই? তা যাক্, তোমার যদি একটু জ্ঞান থাক্‌তো, তবে Solar Myth এর ব্যাপারটা দিয়া বুঝাইয়া দিতাম যে, রামটাম সব কল্পনা।

রামধন। (স্বগতঃ) এ সংসারে এত রঙ্গও আছে, এদের কথা দু চারিটি শুনিতে বড়ই কৌতুহল হইতেছে বটে। (প্রকাশ্যে) সে আবার কি?

হরিহর। বলছি দাড়াও; সূর্য্য সম্বন্ধীয় বা সূর্য্য বিষয়ক ইহার কি একটা এক কথার পদ আছে; স্মরণ করিয়া লই।

রামধন। সৌর?

হরিহর। হাঁ হাঁ—Solar Myth কে সৌর পুরাণ বলা যাইতে পারে।

রামধন। ইংরাজিতেও পুরাণ আছে নাকি?

হরিহর। তা নাই; তবে ঐ পুরাণটার নূতন আবিষ্কার হইয়াছে।

রামধন। যদি ছিল না, তবে আবিষ্কার হইল কি প্রকারে? তবে নূতন করিয়া বিলাতে সকলে পুরাণ মানিতে বসিয়াছেন বলুন।

হরিহর। তুমি অত আগ বাড়াইয়া কথা কও কেন? সৌর পুরাণ কিছু ছিল, তা নয়; এখন কেহ নূতন পুরাণ মানিতেছে তাও নয়, তবে ঐ পুরাণের কথা দ্বারা অনেক প্রাচীন কুসংস্কার ধরা পড়িতেছে।

রামধন। সৌর পুরাণ ছিলও না, নূতন সৃষ্টিও হয় নাই; অথচ সেই সৌর পুরাণ, কুসংস্কার তিরোহিত করিতেছে? আপনি বলিয়া যান, আমি শুনি।

হরিহর। নাহে রামধন ওটা কি বল্‌ব ছাই, একটা Theory অর্থাৎ মত—তা যাক্; আমি তোমাকে মোদ্দাটা বলিতেছি। Max Muller বা মোক্ষমুলর বুঝাইয়াছেন যে, সকল দেশেই সূর্য্য লইয়া গোড়ায় দেবতা গড়িয়াছে। ধাতুর অর্থে সেগুলি ধরা পড়ে যথা "দিবস ও উষস্" একই ধাতু মূলক। সুতরাং অহন শব্দের "অহ" ধাতুর অর্থ উষ শব্দ মূলক। সেই অহ আবার দেখ গ্রীক্

Daphne অর্থাৎ Dawn অর্থাৎ উষা শব্দের ঠিক অনুরূপ। আবার—

রামধন। মহাশয় কিঞ্চিৎ স্থির হউন। আপনার সেই ইংরাজি পণ্ডিতটীর সংস্কৃত জ্ঞানে কিঞ্চিৎ গোল আছে দেখিতেছি। অরুন শব্দ ও উষা শব্দ এক ধাতু মূলক কখনই নহে। ইংরাজীর কথা লইয়া আপনারা যথেচ্ছা ব্যবহার করুন; কিন্তু সংস্কৃত ভাষাটা আমরা যতদূর জানি,তাহাতে ওটা সিদ্ধ হইতেছে না।

হরিহর। (কিঞ্চিৎ গোলে পড়িয়া) তা নাই বা হোক্; কিন্তু সূর্য্য দেখিয়া যে সর্ব্ব ধর্ম্মের উৎপত্তি, ইহার আর ভুল নাই। তাহা তুমি বুঝিতে পার?

রামধন। সে বিদ্যা আমার নাই— আপনি বলিতে থাকুন।

হরিহর। সূর্য্য পূর্ব্বে উদিত হইয়া পশ্চিমে অস্ত যান; অন্ধকার তাঁহার আলোক হরণ করে; এই সকল দেখিয়া সূর্য্যবংশ, সূর্য্যবংশের রাজা, রাক্ষস কর্তৃক তাহার সুন্দরী পত্নীর হরণ, ইত্যাদি কথার সৃষ্টি হইয়াছে। হোমরের ইলিয়দেরও এইরূপ উৎপত্তি।

রামধন। (স্বগতঃ) লোকটা ক্ষেপিয়া না যায়। (প্রকাশ্যে) এ কথার প্রমাণ কি?

হরিহর। কেন ঐত বলিতেছিলাম যে, সমগ্র দেবতাদিগের নাম সূর্য্য শব্দ মূলক।

রামধন। তাত, বলিতে পারেন না; সূর্য্য হিন্দুদিগের দেবতা বটে; কিন্তু অন্য দেবতার গায়ে "সূর্য্য" নামের সম্বন্ধও নাই। এ আপনার ইংরাজী নয়, সংস্কৃত। এখানে আপনার কথা মানিতে প্রস্তুত হইব না।

হরিহর। যিনি বেদের বঙ্গানুবাদ করিতে পারেন,তাঁহার কথা মানিবে কি না?

রামধন। কোন সংস্কৃতজ্ঞ এরূপ বলিতে পারেন না।

হরিহর। (একটু চটিয়া) রামধন, তুমি অর্ব্বাচীন, তুমি মূর্খ, তুমি মোক্ষমূলর মান না, R. C. Dutt মান না?

রামধন। আজ্ঞে এঁরাত হালের মানুষ, আপনি যে প্রাচীন বাল্মীকিকে মানেন না? সংস্কৃত অনভিজ্ঞের সংস্কৃত ধাতুর ব্যাখ্যা না মানা সহজ, না এত কালের রামায়ণ-খানা না মানা সহজ?

হরিহর। (অত্যন্ত চটিয়া) রামধন, তুমি দূর হও; সত্যের অবমাননাকারীর মুখ দেখিলেও পাপ আছে।

রামধন। আজ্ঞে ঠিক বোলেছেন; সে কথা মনে পড়িলে আরও দু দণ্ড পূর্ব্বেই বিদায় হইতাম। (প্রস্থান)

নেপথ্যস্থিত শ্রোতা।

আদিশূর ও বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ।

(সপ্তম খণ্ড ৭৫ পৃষ্ঠার পর।)

১০। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, পঞ্চ কায়স্থ কান্যকুব্জ হইতে বাঙ্গালায় আগমন করেন। সুতরাং দেখা উচিত, তৎকালে কান্যকুব্জ দেশে কায়স্থগণ কিরূপ সম্মান লাভ করিতেছিলেন। রাটোঢ় বংশীয় কান্যকুব্জের শেষ হিন্দু নরপতিকুলের অনেকগুলি তাম্রশাসন আমরা পাঠ করিয়াছি, তন্মধ্যে যে সকল শাসন-পত্রে কায়স্থ কর্ম্মচারীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সকল গুলিতেই সেই সকল কর্ম্মচারীর নামের সহিত "কায়স্থ ঠক্কুর," "করণ ঠক্কুর," "লেখক ঠক্কুর"

প্রভৃতি বিশেষণ সংযুক্ত রহিয়াছে। এমত স্থলে ইহা কিরূপ সম্ভবপর হইতে পারে যে সেই "ঠাকুর" কুলের পঞ্চ ব্যক্তি অনার্য্য-ভূমি বাঙ্গালায় আসিয়াই "দাস" উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও যাঁহারা পঞ্চ কায়স্থকে দাস-বংশজ বলেন, বিধাতা তাঁহাদিগকে বিবেক শক্তি প্রদান করেন নাই বলিয়া আমরা তাঁহাদিগকে কৃপার পাত্র বিবেচনা করি।

"বঙ্গে বৈশ্যনির্ণয়" নামক একখানা পুস্তক সম্প্রতি আমাদের নেত্রগোচর হই-য়াছে। এই গ্রন্থ-প্রণেতা বোধ হয় কোন ইতর জাতির পুরোহিত কিম্বা গুরুবংশীয় হইবেন। বঙ্গদেশীয় কৃষক অর্থাৎ সদগোপ-দিগের উপকারার্থ এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, এবং কৃষক-কুলতিলক অশেষগুণালঙ্কৃত ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার মহাশয়কে এই গ্রন্থ উপহার অর্পণ করা হইয়াছে। এই গ্রন্থের আদ্যোপান্ত বাঙ্গলার কায়স্থ দিগের প্রতি "গোলাম" শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, এবং গ্রন্থকার মহাশয় আদি-শূরের সভায় পঞ্চ কায়স্থের পরিচয় বৃত্তান্তটি অলঙ্কারপূর্ণ মিথ্যা বাক্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ঘটকগণ যে মিথ্যা বাদী, ইহা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু তাঁহাদের বর্ণনার কোন অংশ সত্য এবং কোন অংশ কাল্পনিক, তাহা নির্ণয় করা ইতর জাতির পুরোহিতের স্থূলবুদ্ধির কার্য্য নহে।

আমাদের প্রবন্ধ সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই বাবু গোপীচন্দ্র সেন মহাশয় তাহার প্রতিবাদ করিয়া "কায়স্থবিচার" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিয়া প্রতীত হইতেছে যে, গোপী বাবু আমাদের অভিপ্রায় ও লেখার স্থূল মর্ম্ম কিছুমাত্র অনুভব করিতে পারেন নাই। উদাহরণ স্বরূপ কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

'কৈলাস বাবু পুরাণ শাস্ত্র হইতে কায়স্থ জাতির যে সকল উৎপত্তি বিবরণ আমাদি-গকে দেখাইয়াছেন তাহা পরস্পর এত অনৈক্য যে, সে সমুদয় কোন মতেই বিশ্বাস করিতে পারা যায় না।" (৭মখণ্ড ১৫৭পৃঃ)

আমরা গোপী বাবুর বুদ্ধির অভাবদর্শনে নিতান্ত দুঃখিত হইলাম। কারণ আমরা ইচ্ছা-পূর্ব্বক পরস্পর অনৈক্য প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছি, "এবম্প্রকার বচন সমূহ আলো-চনা করিয়া বোধ হইতেছে যে, যখন যে গ্রন্থকার কায়স্থের প্রতি সদয় হইয়াছেন, তখনই তিনি তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া প্রমাণ করিতে যত্ন করিয়াছেন, আবার যখন কোন প্রভু উশনার ন্যায় বিদ্বেষ দ্বারা পরিচালিত হইয়াছেন, তখনই তিনি তাঁহাদিগকে নরকে নিক্ষেপ করিতে ক্রটি করেন নাই। এমতাবস্থায় তাহা-দিগের বাক্যের প্রতি কতদূর নির্ভর করা যাইতে পারে, পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন।" (ষষ্ঠখণ্ড, ৪৩২ পৃষ্ঠা।)

এবার বোধ হয় গোপী বাবু স্বয়ংই বুঝিতে পারিবেন যে, তিনি আমাদের অভিপ্রায় না বুঝিতে পারিয়াই আমাদের বিরুদ্ধে লেখনী সঞ্চালন করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সহিত বাক বিতণ্ডা করা আমাদের পোষায় না। লেখনী ধারণ করিবার পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভের প্রয়োজন। মাতৃক্রোড়ে বসিয়া দুই চারি খানা পুস্তকের পাতা উলটাইলেই অভিজ্ঞতা লাভ হয় না।

ব্যবস্থাদর্পণ প্রণেতা ৺শ্যামাচরণ

সরকার মহাশয় ইহা অবশেষে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, "বঙ্গীয় কায়স্থগণ যে বিশুদ্ধ আর্য্য বংশজ, তৎপক্ষে কোন সন্দেহ হইতে পারে না, কিন্তু তাঁহারা বহু কাল হইতে উপবীত ও গায়িত্রী পরিত্যাগপূর্ব্বক শূদ্র ভাবাপন্ন হইয়াছেন।"

পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় তাঁহার কোষগ্রন্থে লিখিয়াছেন যে,—এবং চিত্রগুপ্ত বংশ্যানাং চন্দ্রসেন বংশ্যানাঞ্চ ক্ষত্রিয়বৎ উপনয়ন বেদাধিকারস্থিতেকালবশাৎ তদ্বংশজাতানামুপনয়নাদি লোপাৎব্রাত্য ক্ষত্রিয়ত্বং ব্রাত্যানাঞ্চকৃত পায়শ্চিত্তানামুপনয়নাদি রাহিত্যাৎ শূদ্রধর্ম্মত্বং।"

মনু বলিয়াছেনঃ—নিচ্ছিবি, করণপ্রভৃতি জাতি ব্রাত্য ক্ষত্রিয় (১০ম অধ্যায়, ২২শ্লোক।) পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতগণ নির্ণয় করিয়াছেন যে, এই নিচ্ছিবিবংশে অন্তিম জিন মহাবীর স্বামী জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ভগবান শাক্যসিংহের অভ্যুদয় কালে প্রবল পরাক্রমশালী নিচ্ছিবি ক্ষত্রিয়গণ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগের অসীম প্রভুত্বের শীর্ষে কুঠারাঘাত করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। সুতরাং এহেন নিচ্ছিবি ক্ষত্রিয়দিগের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণদিগের লেখনী শাণিত কুঠারের ন্যায় প্রয়োগ না হইবে কেন? সেই নিচ্ছিবি ক্ষত্রিয়দিগের সহিত করণদিগকে ব্রাত্যক্ষত্রিয় শ্রেণীতে নিবিষ্ট করা হইয়াছে। সুতরাং করণকায়স্থদিগের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। আমরা এরূপ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছি যে, মহারাজ অশোকের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব হইতে দীর্ঘ কাল বাঙ্গালায় জৈনধর্ম্ম প্রবল ছিল। তৎপর সেনবংশীয় রাজাদিগের অত্যাচারে বাঙ্গালায় জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম্মের অবনতি সংসাধিত হইয়াছিল। সেই সকল ধর্ম্মাবলম্বী বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ ধর্ম্মের জন্য জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিংহল প্রভৃতি দেশে চির কালের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহা আমাদের অনুমান মাত্র নহে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। *

* সিংহলাধিপতি পরাক্রম বাহুর শাসনকালে (১১৫৩—৮৬ খ্রীষ্টাব্দ) গৌড়দেশের অন্তর্গত রাঢ়মণ্ডলান্তঃপাতী "বারেন্দ্র" জনপদ নিবাসী কাত্যায়ন গোত্রজ রামচন্দ্র "কবি ভারতী" নামক জনৈক ব্রাহ্মণ এই ধর্ম্মের জন্য—রাজার অত্যাচারে—সমাজের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া সিংহল দ্বীপে গমন করেন। মহারাজ পরাক্রমবাহু তাঁহাকে সাদরে ও সসম্মানে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বিদেশে বসিয়া ভক্তিশতক নামক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে ধর্ম্ম-বিগলিত হৃদয়ে দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—"রাজা আমাকে দণ্ড দিন, পণ্ডিত মণ্ডলী আমাকে উপহাস করুন, আত্মীয় কুটুম্বগণ আমাকে পরিত্যাগ করুন, হে পিতঃ জিন, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া এক মুহূর্ত্তও জীবন ধারণ করিতে পারি না।"

রামচন্দ্র কবি ভারতী প্রণীত ভক্তিশতক ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সিংহলে মুদ্রিত হইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এক খানি ভক্তিশতক গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া, কিঞ্চিদাধিক সার্দ্ধ সপ্ত শতাব্দী পূর্ব্বে যিনি ধর্ম্মের জন্য জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, তাঁহার বিবরণ (P. A.S. B. Feb. 90) প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত তাহার সারাংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। কিন্তু আমরা এস্থলে বিনীত ভাবে শাস্ত্রী মহাশয়ের একটী ভ্রম প্রদর্শন না করিয়া থাকিতে পারিলাম না, ভরসা করি, তিনি এজন্য আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

শাস্ত্রী মহাশয় রামচন্দ্র কবি ভারতীর সময়াবধারণ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন "This settles the question of the age of Ramachandra,

যাঁহারা সেই সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের পদানত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই নিরুদ্বেগে দেশে বাস করিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং বোধ হইতেছে যে, বঙ্গীয় কায়স্থগণ পূর্ব্বে জৈন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। এই জন্যই তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা এরূপ অপমানিত হইয়াছেন। আমাদের এই মন্তব্যের প্রতি যদি কেহ আপত্তি করেন, তবে তাঁহাকে আমাদের জিজ্ঞাসা যে, বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ লোক যে জৈন ছিলেন, তাঁহাদের বংশাবলী এক্ষণে কি হইল? মাড়োয়াড়ী জৈনগণ অল্পদিন হইল আমাদের দেশে আসিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত প্রাচীন ইতিহাসের কোন সম্পর্ক নাই।

পূর্ব্বে কেবল বঙ্গীয় বৈদ্যগণ কায়স্থদিগের প্রতিপক্ষ ছিলেন। অধুনা ক্রমে ক্রমে সদ্‌গোপ, সুবর্ণবণিক, জুগী, চণ্ডাল প্রভৃতি জাতিগণও আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন মানসে গ্রন্থ প্রচার করিতে পরস্পরত অগ্রসর হইয়াছে। সদ্‌গোপগণ প্রাচীন গোপজাতির একটি শাখা মাত্র। সুবর্ণবণিকগণ অস্পৃশ্য জাতি ধনবলে উন্নতি লাভ করিয়া এক্ষণ বৈশ্যবর্ণে অনুপ্রবিষ্ট হইবার জন্য লালায়িত হইয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে যদি বঙ্গে কোন জাতির বৈশ্য বংশীয় বলিয়া পরিচিত হইবার বিন্দু মাত্রও অধিকার থাকে, তবে কেবল গন্ধবণিকদিগেরই তাহা থাকিতে পারে। জুগী ও চণ্ডাল উভয়ই অনার্য্য হিন্দু। যাঁহারা যোগী ও জুগীকে এক জাতি বিবেচনা করেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। চণ্ডালেরা অনার্য্য সবর জাতির একটি শাখা মাত্র। বঙ্গীয় চর্ম্মকার জাতিরাও আপনাদিগকে ঋষি বংশজ বলিয়া পরিচয় দিতেছে। কালে আরও কত দেখিব, "রাজ্য পেলে সেখে, যার যা খুসি লেখে"। †

পাঠক, বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থদিগের কুলজী গ্রন্থগুলি পরিত্যাগ করিয়া একবার হিমালয় হইতে কুমারিকা, ও পূর্ব্ব সাগরের নীল জল-বিধৌত পবিত্র পুরুষোত্তমক্ষেত্র হইতে পশ্চিম সাগরের তরঙ্গ কলাপ-চুম্বিত গুর্জ্জরের শেষ সীমা পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়া দেখ কোনস্থানেই বঙ্গ-

---

because Parakram Bahu reigned about the middle of the eleventh century (A D) and his was a long reign' মহারাজ পরাক্রম বাহু (প্রথম) একজন বিশেষ পরাক্রমশালী নরপতি ছিলেন। প্রামাণ্য ইতিহাস সমূহে ও ক্ষোদিত লিপিতে তাঁহার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তিনি সাগর শাখা অতিক্রম করিয়া দক্ষিণাপথে বিজয়ী বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছিলেন। পরাক্রম বাহু ১১৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করত যশের মালা শিরে ধারণ পূর্ব্বক ৩৩ বৎসর রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। (Turnour's Mahawansa, Vol I, P, LXVI.) Prinseps Useful Tablese P, 139)

শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে রামচন্দ্র বল্লাল সেনের সমসাময়িক, কিন্তু আমাদের মতে ইনি শেষ হিন্দু গৌড়েশ্বর (দ্বিতীয়) লক্ষ্মণ সেন দেবের সমসাময়িক, সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যে সময়ে স্বদেশীয় নরপতি কর্তৃক অসাধারণ সম্মানলাভ করত হলায়ুধ বঙ্গদেশে বসিয়া ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব রচনা করিতেছিলেন, সেই সময় রামচন্দ্র স্বদেশীয় নরপতি দ্বারা নির্ব্বাসিত হইয়া সিংহলেশ্বর অপ্রতিমল্ল নিঃশঙ্কমল্ল কলিঙ্গলঙ্কেশ্বর পরাক্রম বাহু চক্রবর্ত্তী'র সভায় সম্মানিত আসনে আসীন থাকিয়া ভক্তিশতক রচনা করিয়াছিলেন।

† আমরা ইতর জাতি সমূহের উন্নতির বিপক্ষ নহি। কিন্তু তাহারা যে পন্থা অবলম্বন করিয়া উন্নতি শিখরের সানুদেশে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক, আমরা তাহাকে ঘৃণা করি। কতকগুলি মিথ্যাবচন প্রমাণ সৃষ্টি না করিয়া কর্ম্মদ্বারা উন্নতি লাভের চেষ্টা করাই তাহাদের কর্ত্তব্য।

দেশের ন্যায় কায়স্থগণ এরূপ অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয় নাই। ভারতের যে কোন প্রদেশে গমন করিবে, সেই স্থানেই দেখিতে পাইবে যে, হিন্দুদিগের শ্রেণী বিভাগ কালে কায়স্থদিগকে তৃতীয়স্থান প্রদত্ত হইয়াথাকে কেবল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় (রাজ পুত্র) জাতি কায়স্থদিগের উর্দ্ধে স্থান প্রাপ্ত হন। সর্ব্বত্রই বৈশ্যগণ কায়স্থদিগের নিম্নে আসন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতের অন্য কোন প্রদেশে কায়স্থের প্রতি কেহ "শূদ্র" কিম্বা "দাস" শব্দ প্রয়োগ করিতে সক্ষম হয় নাই। বেইন সাহেব বোম্বে প্রেসিডেন্সি-নিবাসী হিন্দুদিগের জাতীয় ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করত লিখিয়াছেন, "হিন্দু-সমাজের তৃতীয় শ্রেণী অর্থাৎ কায়স্থদিগের শিরায় শিরায় যে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় শোণিত প্রবাহিত হইতেছে, ইহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি।" এইরূপে ভারতের যে কোন প্রদেশের কায়স্থদিগের বৃত্তান্ত আমরা অনুসন্ধান করিয়াছি, আমরা কোন স্থানেই তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব ব্যতীত নিকৃষ্টত্বের প্রমাণ প্রাপ্ত হই নাই।

খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কায়স্থ ও বৈদ্য জাতিকে বর্ণশঙ্কর স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন, "The *improved* position of the mixed races appears from the importance, which is attached to the Kayasthas and Vaidyas. The former as writers and the latter as physicians are undoubtedly reckoned as gentlemen. They occupy in Bengal a rank second only to Brahmins. The priests look up to them as the Rishis of yore looked up to the Kshetriyas."

ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, বাঙ্গালার ব্রাহ্মণের নিম্নেই কায়স্থ ও বৈদ্য। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি বঙ্গীয় কায়স্থ ও বৈদ্য উভয়ই এক মূল হইতে উৎপন্ন। আমাদের এই সিদ্ধান্ত গোঁড়া কায়স্থ ও গোঁড়া বৈদ্যগণের অপ্রীতিকর হইয়া থাকিলেও অনেকেই ইহা সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

বৈদ্যদিগের প্রতি আমাদের সানুনয় নিবেদন যে, তাঁহারা যতকাল কায়স্থদিগকে শূদ্রবংশজ বলিয়া আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন মানসে লেখনী সঞ্চালন করিবেন, ততকাল এই জাতীয় হিংসা ও কলহ চলিতে থাকিবে। এ বারণের চিতা নির্ব্বাণ হইবে না। তাই সবিনয়ে বলিতেছি, এস কলহ পরিত্যাগ করিয়া পরস্পর ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করি। একবার স্মরণ করিয়া দেখ, আমরা সাতশত বৎসর যাবত কত অস্পৃশ্য জাতির পাদুকা মস্তকে বহন করিতেছি, ইহা কি আমাদের ভ্রাতৃ-বিরোধের সময়। এস, পরস্পরের সাহায্যে আমরা উন্নতির পথে অগ্রসর হই। যাহাতে পুনর্ব্বার জগতে আমরা আত্ম প্রাধান্য সংস্থাপন করিতে পারি, সেই চেষ্টা করাই আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। নচেৎ আত্ম কলহ করিয়া অধঃপাতে গেলে কি হইবে? হা বিধাত! এরূপ অসংখ্য বর্ণ ও সম্প্রদায়-প্লাবিত দেশে কি একতা সংস্থাপিত হইবে!

আমাদের পূর্ব্ব প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর কায়স্থ জাতির ইতিবৃত্ত মূলক দুই খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এস্থানে তাহার পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক হইতেছে।

১। ঢাকুর অর্থাৎ কায়স্থ জাতি ও বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজের ইতিবৃত্ত। সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত রায় গোবিন্দমোহন বিদ্যাবিনোদ বারিধি মহাশয় দ্বারা এই গ্রন্থ সঙ্কলিত। রায় মহাশয় বিশেষ পাণ্ডিত্য সহকারে গ্রন্থের প্রথমাংশে কায়স্থ জাতির উৎপত্তি বর্ণনা করিয়া কায়স্থদিগকে ক্ষত্রিয় বংশজ অবধারণ করিয়াছেন, গ্রন্থের শেষাংশে বারেন্দ্র কায়স্থদিগের ইতিবৃত্ত বর্ণন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, বারেন্দ্র কায়স্থদিগের "ঢাকুর" নামে প্রাচীন কুলজী গ্রন্থ আছে। রায় মহাশয় সেই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া উল্লিখিত গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন বলিয়াই ইহাকে ঢাকুর আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

২। ধ্রুবানন্দ মিশ্র প্রণীত কায়স্থকারিকা। চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রাজা প্রেমনারায়ণের সভাপণ্ডিত শাণ্ডিল্য গোত্রজ বন্দ্যবংশীয় ঘটক ধ্রুবানন্দ সংস্কৃত ভাষায় এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, এই গ্রন্থের বয়ক্রম প্রায় ২০০ বৎসর হইবে। এই গ্রন্থে কায়স্থ জাতির উৎপত্তি, পঞ্চকায়স্থের বাঙ্গলায় আগমন ও বঙ্গজ কায়স্থদিগের বংশাবলী ও বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীযুক্ত বাবু শশীভূষণ নন্দী মহাশয় বাঙ্গালা অনুবাদের সহিত মূলগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার মূল্য ।।০আনা মাত্র। বঙ্গীয় কায়স্থগণের সকলেরই এই উপাদেয় গ্রন্থ পাঠ করা উচিত। রায় মহাশয় ও নন্দী মহাশয় উভয়ই আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহাদের প্রকাশিত গ্রন্থদ্বয় দ্বারা বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের যথোচিত উপকার সংসাধিত হইবে।

আমরা শ্রুত হইলাম, ময়মনসিংহের অন্তর্গত সন্তোষের খ্যাতনামা ভূমাধিকারিণী শ্রীমতী জাহ্নবী চৌধুরাণী দ্বারা একখণ্ড "কায়স্থ বংশাবলী প্রকাশিত" হইয়াছে। এই গ্রন্থ আমরা দর্শন করি নাই, সুতরাং তৎ সম্বন্ধে কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারিলাম না, এজন্য আমরা দুঃখিত আছি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৈলাস চন্দ্র সিংহ।

বেলা গেল সন্ধ্যা হ'ল।

বেলা গেল, সন্ধ্যা হ'ল সূর্য্য বস্‌লো পাটে;
সোণার বরণ রোদের কিরণ নাইক পথে ঘাটে।
মাটী ছেড়ে গাছ পাহাড়ে উঠ্‌লো গিয়ে তারা,
বরের মতন, দেখ্‌তে কেমন, মাথায় টোপর পরা।
ধীরে ধীরে ঘরে ফিরে যাচ্ছে গরুর পাল,
পাঁচন হাতে, সাথে সাথে, তাড়িয়ে ধায় রাখাল।
উড়িয়ে ধুলা বাছুর গুলা কর্চ্ছে কত খেলা;
সবার চিত্ত হরষিত বাড়ী যাবার বেলা।
পাতের তাড়ি লয়ে বাড়ী যাচ্ছে প'ড়োদল,
যেতে যেতে, পথে পথে, পড়্‌ছে গণ্ডা পণ।
রক্ত উঠে খেটে খুটে উদয় অস্ত ধ'রে,
লাঙ্গল কাঁধে, কাস্তে হাতে চাষা যায় ঘরে।
বাজার ক'রে এলেম ফিরে মেছুনী কাবারী,
হাট বাজারে বিক্রী ক'রে মৎস্য তরকারী।
বঙ্গদেশে বলদ্ সনে কিনে বেচে এলো,
'বাবা' ব'লে ছেলে পিলে কোলে উঠ্‌তে গেল।
ঢিপি থেকে মোরগ ডাকে মুসলমান বাড়ী;
কাছা খোলা মিঞা মোল্লা ধুচ্ছে গোঁফ দাড়ী।
দর্গা তলে সবাই মিলে পড়্‌তেছে নামাজ;
বাড়ীর ভিতর গন্ধে বিভোর রাঁধ্‌ছে ব্যঞ্জন পিয়াজ

সারি সারি বউ ঝিয়ারি জল আনতে যায়,
নোলক নাকে, কলসী কাঁকে আলতা পরা পায়,
বাজ্‌ছে কেমন, ঠন্‌ ঠন্‌, তাবীজ লঙ্গফুল!
রসিক পবন উড়িয়ে বসন কচ্ছে লজ্জাকুল।
পুকুর ঘাটে ঘুটে পুটে করে বউ গুলি,
মনের ব্যথা, কত কথা কর্চ্ছে বলাবলি।
বনে বাদাড়ে, ঘোঁজ পাঁদাড়ে ছিল অন্ধকার,
দিল দেখা, কালি মাখা, ভূতের আকার।
পায়রা ঘরে, চড়ুই বাইরে, কার্ণিশেতে কাক
সন্ধ্যা দেখে থেকে থেকে ডাক্‌ছে আপন ডাক।
অন্য পাখী আঁধার দেখি উড়ে উড়ে যায়,
দলে দলে, সবাই মিলে, গাছ, পালা, বাসায়।
কোটর থেকে পেঁচা ডাকে এক একটি বার,
ভাব্‌ছে মনে এতক্ষণে উড়ে হবে বা'র।
নদীর ধারে বিষাদ ভরে ভাব্‌ছে চকা চকী—
কেমন করে রাত্রি ধ'রে রইবে একাকী।
একটি তারা, দুটি তারা, তারা ঝিক্ মিক্ করে,
বধূ যেমন খোলে বদন ঘোম্‌টা তুলে ধ'রে।
বাসর ঘরে বরকে ঘেরে নারী যেমন ধারা,
চাঁদের পাশে তেমনি এসে বস্‌লো সব তারা।
ঝিঁ ঝিঁ রবে ঝিঁ ঝিঁ সবে ডাক্‌ছে গর্ত্ত থেকে;
বেতের বনে শিয়ালগণে উঠ্‌ছে ডেকে ডেকে।
ছোট মেয়ে শুচী হয়ে কর্চ্ছে সেঁজুতি,
ঝিউড়ী যারা, জ্বালছে তারা, সাঁজের দীপবাতি।
তুলসী তলে প্রদীপ জ্বেলে কর্চ্ছে নমস্কার,
জ্বেলে ধূনা আনাগনা কর্চ্ছে ঘর দ্বার।
বউ রাঁধছে, ছেলে কাঁদছে, গিন্নি জপে যায়,
দাওয়ায় বসে, কেশে কেশে, কর্ত্তা তামাক খায়।
ঠাকুর ঘরে মধুর স্বরে বাজ্‌ছে ঘণ্টা শাঁক,
ঘড়া কাঁশর, বাজ্‌ছে ঝাঝর, সানাই ঢোল ঢাক।
জ্বেলে আলো জনাক গুলো এদিক ওদিক ধায়,
খোঁজে যাকে, পায় না তাকে, ফের খুঁজ্‌তে যায়।
বৃক্ষ তলে কাষ্ঠ জ্বেলে সন্ন্যাসী গোঁসাই,
গাচ্ছে ভজন, কর্চ্ছে পূজন অঙ্গে মেখে ছাই।
শ্মশান ধারে শ্যাল কুকুরে কচ্ছে গণ্ডগোল,
রক্ত শুকায় পীলা চমকায় শুনলে বিষম বোল!
ভাঙ্গা দোকানে পথিকগণে বাসা ল'তে যায়,
কেউ গান গায়, কেউ বা ঘুমায়, কেউ বা
সাধে খায়।
নৌকাগুলি বাদাম তুলি যাচ্ছে পাল ভরে,
উড়্‌ছে যেন শকুন শেন ডানা বা'র ক'রে।
এমন সময় ধীরি ধীরি বয় দক্ষিণে বাতাস
সন্ধ্যাসনে শীতল প্রাণে সবারই উল্লাস।
ফুল বাগানে, নবীন প্রাণে, ফুট্‌লো কত ফুল,
দেখ্‌তে যেমন, গন্ধে তেমন কর্চ্ছে প্রাণাকুল।
পথে ঘাটে, মাঠে হাটে, নাইক জন মানব,
ক্রমে হ'ল কোলাহল সকলই নীরব।
সন্ধ্যা হ'ল, সবাই গেল নিজ নিজ ঘরে;
ভাব্‌ছি ব'সে, যাব কিসে ভব-নদী পারে।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়।

জর্জ মুলারের নবজীবন।

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে মুলারের বিংশ বৎসর বয়স পূর্ণ হইল। এই বয়সে নভেম্বর মাসে এক দিন তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত বেটা নামক [illegible] ছাত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল। বেটা [illegible] গম্ভীর ও শান্ত ছিলেন। পাঠশালায় শিক্ষার সময়ে তাঁহার দিব্য পাপ-বোধ এবং ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিবার প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া নূতন নূতন সংসর্গে মিলিত হইয়া তাঁহার উপাসনায় ঔদাসিন্য ও অনাস্থা জন্মিয়াছিল।

আমাদের মুলার এই যুবকের পূর্ব্বকার সততা, চিন্তাশীলতা এবং ঈশ্বর-ভক্তি স্মরণ করিয়া, তাঁহার সঙ্গে থাকিলে তাঁহার নিজের উপকার হইতে পারে, এই আশা করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। কিন্তু অতি অল্পকাল মধ্যে মুলার বেটার মত পরিবর্ত্তনের কথা বুঝিলেন। এরূপ মত পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও কিন্তু বেটার এখনও ভাল বিষয়ের দিকে কিঞ্চিৎ আকর্ষণ এবং সৎ ভাবে জীবন অতিবাহিত করিবার অভিলাষ ছিল। মুলারের দশাও বেটার ন্যায় হইল। সেই হেতু মুলারের সহিত বেটার অন্তরের মিল হইল। বেটা কয়েকটী বন্ধুর সহিত, একজন খ্রীষ্ট ভক্তের বাটীতে, উপাসনায় ও বাইবেল পাঠে যোগ দিবার নিমিত্ত প্রতি শনিবার সন্ধ্যার সময় একত্রিত হইতেন। এই কথা জ্ঞাত হইয়া জজ তথায় যাইতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তিনি বেটার প্রমুখাৎ শুনিলেন যে, এই সভায় ধর্ম্মপুস্তক, একটী সঙ্গীত ও একটী মুদ্রিত ধর্ম্মোপদেশ পাঠ করা হয়। এই কথা শুনিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, তিনি যাহার জন্য এ পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন, তাহা পাইলেম। শনিবার রাত্রে বেটার সহিত তিনি ঐ সভায় গমন করিলেন। যাঁহার বাটীতে এই সভা হইত, তিনি এক জন ব্যবসায়ী ও ধার্ম্মিক লোক। তাঁহার নাম ওয়েগনার।

এইসভা হইতেই মুলারের জীবনের নবযুগের অভ্যুদয় আরম্ভ হইল। এখানে কেবল উপাসনা, স্তুতি এবং উপদেশ পাঠ হইত। কিন্তু ইহার দ্বারাই তিনি তাঁহার অসৎ চরিত্র বুঝিতে পারিলেম এবং মুক্তিরজন্য অনাদ্যন্ত পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিতে শিক্ষা করিলেন। সেদিন একটী যুবা ধর্ম্ম পুস্তকের একটী অধ্যায় এবং উপদেশ পাঠ করিয়াছিল। উক্ত উপদেশ মুলারের মনে এরূপ বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, তিনি তথায় তিন চারি শনিবার উপর্য্যুপরি ওয়েগনারের সহিত ধর্ম্মপুস্তক সম্বন্ধে কথোপকথন করিয়াছিলেন। এসম্বন্ধে মুলার নিজের ভাষায় এইরূপ বলেন,—"এখন আমার জীবন সম্পূর্ণ নূতন; কারণ আমি একেবারে সমস্ত পাপ দূর করিতে না পারিলেও অসৎ সঙ্গ পরিত্যাগ ও ক্রীড়া ভবনে গমন একেবারে বর্জ্জন করিয়াছি। পূর্ব্বের ন্যায় স্বাভাবিক অসত্য কথন অনেক পরিমাণে ত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু ইহার পরও দুই একবার মিথ্যা কথা বলিয়াছি। এই সময়ে আমি ফরাসী ভাষা হইতে এক খানি উপন্যাস জর্ম্মনভাষায় অনুবাদ করিতে ব্যাপৃত ছিলাম। এই পুস্তক মুদ্রিত করিয়া পারিস নগরে যাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। অবশেষে, পুস্তকখানির আদ্যন্ত ভ্রমে পরিপূর্ণ হইয়াছে দেখিয়া বিক্রয়ের আশা পরিত্যাগ করিলাম।" মুলারের চরিত্রের এই পরিবর্ত্তনে তাঁহার সমপাঠীগণ তাঁহাকে বিদ্রূপ করিত; কিন্তু তিনি সে সকলের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। তিনি ঈশ্বরকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিতেন, কারণ তিনি তাঁহাকে অসৎপথ হইতে সৎপথে আসিবার মতি প্রদান করিয়াছেন। ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি থাকায় তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও উৎসাহশীল হইয়াছিলেন। তিনি পরমেশ্বরের জন্য অম্লানচিত্তে সমুদয় কষ্ট সহ্য করিতেন এবং তাঁহার জন্য অতি কঠিন কার্য্য সম্পন্ন করিতেও প্রস্তুত ছিলেন।

এইরূপে মুলার যখন মুক্তিরপথ দেখিলেন,

তখন তিনি অপরকেও মুক্তির উপায় দেখাইয়া দিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি অলস খ্রীষ্টিয়ান ছিলেন না। কেমন করিয়া অন্যকে উপদেশ দিবেন ও অন্যের উপকার করিবেন, তিনি সর্ব্বদাই তদ্বিষয়ে বিশেষ মনযোগী ছিলেন। তিনি ধর্ম্মপ্রচারকের কার্য্যে প্রবেশ করিবেন, সঙ্কল্প করিলেন। এই সময়ে ডাক্তার থোলক নামক এক সরল ও সৎ খ্রীষ্টিয়ান হল বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম্মাধ্যাপক হইয়া আসিলেন। এই ঘটনায় মুলারের মনে অভূতপূর্ব্ব আশার সঞ্চার হইল।

এই সময়ে মুলার তাঁহার পিতা এবং ভ্রাতাকে আপন মত পরিবর্ত্তনের বিষয় উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পত্রের প্রত্যুত্তরে সন্তোষের পরিবর্ত্তে অত্যন্ত বিরক্তি উপহার পাইলেন। প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত হইবার প্রস্তাবে উৎসাহ ও অনুমতি পাওয়া দূরে থাকুক, বরং তিনি বিশেষ বাধাই প্রাপ্ত হইলেন। মুলার বলেন,—"আমার পিতা আমার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিলেন এবং যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতে লাগিলেন, কারণ তিনি আমাকে যজন ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিয়া আমার সহিত বৃদ্ধাবস্থায় সুখে কালাতিপাত করিবেন, এই আশায় আমার শিক্ষার নিমিত্ত প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই আশা আজ বিফল হইতে চলিল দেখিয়া তিনি অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া লিখিলেন, "আমি তোমাকে আর পুত্র বলিয়া স্বীকার করিব না"। আমি প্রভুর ইচ্ছার উপর নির্ভর করিলাম, বিচলিত হইলাম না। আমার মত পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা হইল, অনেক বাধা বিপত্তি উপস্থিত হইল। কিন্তু ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে এই কঠিনতর পরীক্ষা হইতেও আমি উত্তীর্ণ হইলাম। পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট বিদায় লইবার সময় ভ্রাতাকে কহিলাম যে, জগদীশ্বরের অনুগ্রহে আমার উদ্ধার হইয়াছে, আমি অবশ্যই তাঁহার পরিচর্য্যায় জীবনাতিবাহিত করিব। আমাকে ইহার পরও দুই বৎসরকাল বিশ্ব-বিদ্যালয়ে থাকিতে হইয়াছিল। এই সময়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অর্থের অধিকতর প্রয়োজন হইলেও, আমি পিতার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে পারিলাম না ভাবিয়া, তাঁহার নিকট আর কিছু মাত্র অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিব না, প্রতিজ্ঞা করিলাম। আমার এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইয়াছিল।"

এই সময় আমেরিকা হইতে কয়েক জন লোক হল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে আসিলেন। অধ্যাপক থোলক মুলারকে উপযুক্ত ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগকে জর্ম্মান ভাষা শিক্ষা দিতে নিযুক্ত করিলেন। ইহাঁরা, মুলারকে যথোচিত অর্থ সাহায্য করিলেন। এইরূপে মুলারের আবশ্যকীয় অর্থ সংগ্রহ হইল।

ইহার পরও কেহ কেহ তাঁহাকে প্রচারকপদ গ্রহণের অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছিল; কিন্তু তিনি তাহা পারেন নাই। এ সম্বন্ধে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার আদেশের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এই রূপে, তাঁহার, ভগবানের উপর সরল বিশ্বাস ও বালকের ন্যায় নির্ভর করিবার প্রবৃত্তি জন্মিল।

তিনি অন্যের উপকার করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। রোগীর সেবা

করা,এই সময়ে তাহার জীবনের প্রধান কাজ হইল। ক্রমে তিনি সমবেত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করিলেন। একবিংশ বর্ষে পদার্পণ করিবার অনতিপূর্ব্বে তিনি প্রথম বক্তৃতা করেন। দ্বিতীয়বার, বক্তৃতা লিখিয়া তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া দুই জন শ্রোতার সম্মুখে বলেন। তৃতীয় বার এরূপ বক্তৃতা কণ্ঠস্থ না করিয়া ধর্ম্মপুস্তকের কোন এক অধ্যায় ব্যাখ্যা করেন। ইহাতে তিনি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইলেন। ক্রমে তিনি ভিন্ন ভিন্ন লোকের সম্মুখে উল্লিখিত উপায়ে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, যেগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া বলিতেন, লোকে সে গুলির বিশেষ প্রসংশা করিত বটে, কিন্তু যেগুলি মন হইতে উপস্থিত বলিতেন, তাহাতে লোকের অধিক উপকার হইত। সুতরাং তিনি শেষোক্ত উপায় অবলম্বন করিলেন।

এই সময়ে মুলার হলের অবৈতনিক বিদ্যালয়ে ছিলেন। এখানে সভাসমিতিতে যোগ দান, ও বাইবেল পাঠ করিয়া সাধারণ সমক্ষে ধর্ম্মোপদেশ দিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেন। এই সকল কার্য্যে তাঁহার অনেক সময় অতিবাহিত হইত। সময়ে সময়ে তিনি ১৫ মাইল দূরে প্রসিদ্ধ ধর্ম্মযাজকগণের উপদেশ শ্রবণ করিতে যাইতেন।

এই রূপে এক বৎসর চলিয়া গেল। মহাপ্রদেশের প্রচার সমাজের (Continental Missionary Society) অধীনে বুখারেষ্ট নগরে একটী কার্য্যে যাইবার জন্য পিতার অনুমতি চাহিয়া পাঠাইলেন। মুলারের জন্মভূমি হইতে বুখারেষ্ট নগর সহস্র মাইল দূরে অবস্থিত থাকিলেও, তিনি পিতার অনুমতি পাইলেন। কিন্তু কোন বিশেষ কারণ নিবন্ধন তাঁহার তথায় যাওয়া হইল না। এই সুযোগ অপস্থিত হইলে, অধ্যাপক থোলাক, ইহুদি সমাজের ধর্ম্ম প্রচারকের ভারগ্রহণে মুলার সম্মত কি না,জানিতে চাহিলেন। মুলার ইহুদিজাতিকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন,এবং তাঁহাদের ভাষার অতিশয় আদর করিতেন, সুতরাং তাঁহার সম্মতি জানাইলেন। সম্মতি পাইয়া অধ্যাপক মহাশয় লণ্ডন সোসাইটীতে পত্র লিখিলেন। তাঁহারা, ছয় মাস কাল কার্য্য শিক্ষার পর একটী কার্য্য দিতে সম্মত হইলেন। মুলার ইহাতে সম্মত হইলেন। বিলাত যাত্রা করিবার আয়োজন হইল। কিন্তু এক ব্যাঘাত উপস্থিত হইল। প্রুসিয়ার প্রত্যেক সুস্থকায় পুরুষকেই তিন বৎসর কাল সৈনিকের কার্য্য করিতে হয়। যাঁহারা নিয়মিত রূপ গ্রীক্ ল্যাটীন ইত্যাদি ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন, কিম্বা যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে কেবল এক বৎসর সেনা দলে থাকিতে হইত। যখন জর্জের বিংশ বৎসর বয়ঃক্রম, তখন তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া সৈনিক কার্য্যের উপযুক্ত বলিয়া স্থির করা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি আরও তিন বৎসর অপেক্ষা করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। তাঁহার বয়স যখন ত্রয়োবিংশ বৎসর, তখন সৈনিক কার্য্য না করিয়া দেশ হইতে যাইবার অনুমতি পাইলেন না। রাজা স্বয়ং ইচ্ছা করিলে ছাড়িয়া দিতে পারিতেন। যাঁহারা প্রচারকার্য্য করেন,তাঁহাদিগকে অনেকবার যাইতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। সুতরাং তিনি মনে করিলেন তিনিও অনুমতি পাইবেন। এই রূপ সিদ্ধান্তের পর রাজাকে এবিষয় জানাইল

হইল কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন যে, "এবিষয় মন্ত্রী মণ্ডলীর আয়ত্তাধীন।"

মুলার বড়ই বিপদে পড়িলেন। তিনি দেশ ছাড়িয়া যাইতে সাহস করিলেন না, অথচ প্রচার কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে হৃদয়ের একান্ত বাসনা। ভাবিয়া ভাবিয়া পীড়া জন্মিল। আরোগ্য লাভের পর পূর্ব্বোক্ত উপকারী অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট হইতে এক খানি পত্র পাইলেন। অধ্যাপক মহাশয় তাঁহাকে শিক্ষকের কাজ দিবেন বলিয়া বার্লিনে যাইতে লিখিয়াছিলেন। তিনি পত্রে আরও লিখিয়াছিলেন যে, রাজধানীতে বিচারালয়ের নিকট থাকিলে সৈনিকপুরুষের কর্ম্ম হইতে নিস্কৃতি পাইবার সম্ভাবনা।

১৮২৯ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে জর্জ চতুর্ব্বিংশবর্ষে পদার্পন করিলেন। তিনি দেখিলেন, সৈনিকদলে প্রবেশ ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই। তাঁহাকে অতিশয় দুর্ব্বল দেখিয়া জনৈক কর্ম্মচারী তাঁহাকে এই অবস্থায় শিবিরে প্রবেশ করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিতে উপদেশ দিলেন। আবেদনানুসারে মুলার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পরীক্ষিত হইলেন। এই পরীক্ষায় তিনি সৈনিক পদের অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইলেন। ডাক্তারের নিকট এক খানি প্রশংসা পত্র গ্রহণ করিয়া মুলার প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের সমীপে উপস্থিত হইলেন। তিনি জর্জকে পুনঃ পরীক্ষার জন্য আর এক জন ডাক্তার নিযুক্ত করিলেন। ইনিও পূর্ব্ব ব্যক্তির ন্যায় মত প্রকাশ করিলেন, সুতরাং মুলার বিনা কষ্টে নিস্কৃতি লাভ করিলেন। সেনাপতি মহাশয় নিজ হস্তে মুলারের মুক্তি পত্র লিখিয়া দিয়া কহিলেন, "ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তুমি ইহুদি সমাজের বিশেষ উপকার সাধন করিতে সমর্থ হইবে।" লণ্ডন যাত্রা করিবার পূর্ব্বে যে কয় দিবস তিনি বার্লিনে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, সে সময় তিনি দীন দরিদ্রের বাটীতে ও কারাগৃহে গমন করত তাহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন এবং সুযোগ পাইলেই পরোপকারে ব্রতী হইতেন।

তিনি পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মার্চ্চ মাসে বিলাত যাত্রা করিলেন। বিলাতে গিয়া পরিশ্রম সহকারে ক্যাল্ডি, হিব্রু এবং ইহুদিদিগের ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। যাহাতে এই সমস্ত ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করিতে পারেন, তিনি তজ্জন্য বিধাতার নিকট সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতেন। কিছুকাল অধ্যয়ন এবং ইহুদিদিগের জন্য পরিশ্রম করিয়া তিনি আরো মহৎ কার্য্যের জন্য এই সোসাইটীর সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া ডিভনসায়রে গমন করত তথাকার লোকদিগের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি টেমথের এক মন্দিরের পুরোহিত হইলেন।

কিয়দ্দিবস এথানে থাকার পর তিনি প্রচার করিলেন যে, তিনি এই ধর্ম্মশালার পৌরহিত্য কার্য্যের নিমিত্ত কোনও নির্দ্ধারিত বেতন লইবেন না; কিন্তু প্রত্যেক শ্রোতা তাঁহার ভরণপোষণের জন্য যাহা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দান করিবে, তাহাই আনন্দের সহিত গ্রহণ করিবেন। এই সময়ে তিনি বিবাহ করিলেন। এখন তাঁহার বাৎসরিক আয় *৫৫ পাউণ্ড মাত্র। *

* ৫৫ পাউণ্ড বাৎসরিক আয় আমাদের দেশের পক্ষে প্রচুর হইলেও বিলাতের পক্ষে অতি অল্প।

এই আয়েই স্বামী স্ত্রী উভয়ের ভরণ পোষণ অতি কষ্টে চলিতে লাগিল। অতঃপর পিউ-রেন্ট (Pew rent) কম কর রহিত করিলেন। ইহাতে তাঁহার বাৎসরিক বেতনের ৩০পাউণ্ড হ্রাস হইল। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাস হইতে খ্রীষ্টভক্তগণ তাঁহার পোষণার্থে যাহা প্রদান করিতেন, তিনি তাহাই গ্রহণ করিতেন।

এই অবস্থায় তাঁহাকে সময়ে সময়ে অত্যন্ত কষ্টে পতিত হইতে হইয়াছিল। এক এক সময়ে মুলার ও তদীয় সহধর্ম্মিণী এরূপ অবস্থায় পতিত হইতেন যে, একটি মাত্র পেনী, অথবা একবারের খাদ্য মাত্র অবশিষ্ট থাকিত। কিন্তু তাঁহাদের প্রার্থনার বলে অতি অল্পকাল মধ্যেই খাদ্য সামগ্রী আসিয়া উপস্থিত হইত। একবার একখণ্ড পনির ব্যতীত গৃহে আহারীয় সামগ্রী আর কিছুই ছিলনা, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, মন্দিরের "শ্রদ্ধয়াদেযম্"নামক বাক্স হইতে এক পাউণ্ড আট শিলিং সাড়ে দশপেন্স বাহির হইল, তাহাতেই তাঁহার কয়েকদিন চলিয়া গেল। এই সমস্ত কষ্টের কথা সম্বন্ধে মুলার স্বয়ং এইরূপ বলিয়াছেন,—"আমরা কখন কখন এরূপ বিপদে পতিত হইয়াছিলাম যে, এক পেনিও হস্তে ছিলনা, কিন্তু ধন্য ভগবানের মহিমা। আমাদের একটী দিনও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব হয় নাই।" কোন কোন দিন তিনি প্রার্থনা করিতেছেন, এমন সময় অর্থ, আহারীয় দ্রব্য কিম্বা পরিধেয় বস্ত্র আসিয়া উপস্থিত হইত। তিনি ঋণ অপেক্ষা অনাহারে জীবন ধারণ করাও শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিতেন। সেই হেতু তিনি কখনও অর্থ কর্জ্জ করেন নাই। যখন তাঁহাদের খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করিবার অর্থ থাকিত না, তখনি তাঁহারা ভগবানের উপর নির্ভর করিতেন—তিনিই তাঁহাদের অভাব মোচন করিতেন।

এইরূপ প্রার্থনায় জীবন আরম্ভ করিয়া তিনি প্রতি বৎসর ১০০ একশত মুদ্রা দানাদি সৎকর্ম্মে ব্যয় করিতেন। এই সকল অনুষ্ঠানের ফল স্বরূপ প্রথম বর্ষে ১৩১ পাউণ্ড, দ্বিতীয় বর্ষে ১৫১ পাউণ্ড, তৃতীয় বর্ষে ১৯৮ ও চতুর্থ বর্ষে ১৬১ পাউণ্ড ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জগদীশ্বর কেবল যে তাঁহার অভাব মোচন করিয়াছিলেন, এরূপ নহে, তিনি তাঁহার সেবকের বিশেষ সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি পূর্ব্বের মত নির্দ্ধারিত বেতনের উপর নির্ভর না করিয়া উপরোক্ত উপায়ে বেশ স্বচ্ছন্দে ও নির্ব্বিঘ্নে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

টেমথে প্রায় সার্দ্ধদ্বিবৎসর কাল অতি-বাহিত করিয়া, ঈশ্বরের আদেশ পাইয়া ব্রিষ্টলে গমন করিলেন। তথায় শ্রীযুক্ত হেন্‌রি, ক্রেকের সহযোগে ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিলেন। ডিবনসায়ারে অবস্থিতির সময় তাঁহার সহিত আলাপ হয়। ইঁহারা দুই জনে গিডন (Gideon) এবং বেথসডা (Bhethesda) ধর্ম্ম মন্দিরে আসন গ্রহণ করিলেন। ক্রেকের সহিত পরামর্শ করিয়া পিউরেন্ট নামক কর উঠাইয়া দিলেন।

তাঁহাদের এখানে অবস্থানের কিঞ্চিৎ পরেই ব্রিষ্টলে বিসূচিকার ভয়ানক প্রকোপ আরম্ভ হইল। এইরূপ সময়ে জর্জ মুলার নিশ্চিন্ত থাকিবার লোক নহেন। তিনি যাহাতে চতুপার্শ্বস্থ জনগণের উপকার করিতে পারেন, তাহার উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

শত শত অসহায় বালক বালিকা যত্নাভাবে ভ্রমণ করিতেছে দেখিয়া, হলের একটি অনাথাশ্রমের কথা তাঁহার মনে উদয় হইল। তিনি ইহাদের নিমিত্ত সেইরূপ একটি আশ্রম করিবার জন্য উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি জানিতেন, সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের নিকট অভাব জানাইলে তন্মুহূর্ত্তেই ভক্তবৎসল ভক্তের অভাব মোচন করিবেন। যাহাকে নিজের ভরণ পোষণের নিমিত্ত ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপর প্রতিক্ষণ নির্ভর করিতে হয়, তাঁহার পক্ষে অসংখ্য বালকবালিকাকে প্রতিপালন ও বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। তিনি ভাবিলেন, অসহায় বালকবালিকাদিগের প্রতিপালন ভার ভগবানের উপর ন্যস্ত করিয়া পৃথিবীর নিকট এই অখণ্ডনীয় প্রমাণ দেখাইবেন যে, পরমেশ্বর তাঁহার সন্তানগণের প্রতিপালন জন্য এবং যাহারা ত .র উপর নির্ভর করে, তাহাদিগকে পুরস্কার দান করিবার জন্য অনুক্ষণ ব্যস্ত। জর্জ মুলারের অনাথাশ্রম ঈশ্বর বিশ্বাসের জলন্ত দৃষ্টান্ত স্থল।

শ্রীরাখাল চন্দ্র মিত্র।

বিষাদ।*

যে মন্ত্রে বিল্বমঙ্গলের প্রাণ প্রতিষ্ঠা, বিষাদ সেই মন্ত্রে সঞ্জীবিত। অথবা সেই মন্ত্রেরই নাম বিষাদ। নয়নজলের অধিত্যকা অতিক্রম না করিলে দেখা যায় না—"মোহন ধাম ভবজলধির পারে পরম সুন্দর।"

বিষাদ বৈষ্ণব গ্রন্থ—গিরিশচন্দ্র বৈষ্ণব কবি, আধুনিক একটু ফের ফার ভাল বাসেন। সোজা কথার ঝড়ে এক দাপটে প্রাণটা দখল করিতে রাজী নন। অথবা ফের ফার না করিলে নাটক হয় না, মৃণালে কণ্টক না দিলে পদ্মের সৌরভ বাড়ে না।

শাক্যসিংহ বিষাদে জীবনের পরিণতি নির্দ্দেশ করেন। যাহা কিছু দুঃখময়, সুখ নাই,—সুখের চেষ্টায় অসুখের বৃদ্ধি। সুখ নাই, দুঃখই সার, সুখের চেষ্টাই বিড়ম্বনা। এই বৌদ্ধধর্ম্ম। বাসনা হইতে উৎপত্তি, উৎপত্তি হইতে জরা মৃত্যু দুঃখ। বাসনার নিবৃত্তি করিলে দুঃখের নির্ব্বাণ হয়—এইপন্থা। শাক্য বুঝিয়াছিলেন, বুদ্ধি মার্গে অনেকে তাহার যুক্তির অনুসরণ করিতে পারিবে না। এজন্য যাহা তিনি বলিয়াছিলেন, তাহা অল্প, যাহা বলেন নাই, তাহা অনেক।

বিষাদ বিরহ। চৈতন্য, বিষাদ হইতে প্রেমের সমাবেশ সম্ভাবনা করিতেন। শাক্য প্রেম আমলে আনিতেন না, চৈতন্যের প্রেম সর্ব্বস্ব। অহেতুকী প্রেম যাহার নাই, তাহাকে হয় জ্ঞান মার্গে বৈরাগ্য দিয়া প্রেমে পৌছিতে হইবে, নতুবা সুখ বিলাসে আনন্দ নাই, পরীক্ষা করিয়া পরিহার পূর্ব্বক বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়ের উৎকর্ষ সাধন করিয়া, ভোগ বিলাসের পরিণাম পর্য্যাপ্ত করিয়া, রাগ মার্গে বৈরাগ্য অবলম্বন বৈষ্ণব ধর্ম্মের সম্মত মার্গ।

অলর্ক রাজপুত্র ভোগ বিলাসী। মাধবের ইচ্ছা লালসার পরিতৃপ্তি করিয়া

---

* শ্রীগিরিশ চন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

রাগ মার্গে তাঁহার বৈরাগ্য সম্পাদন করিবেন। বৈষ্ণবের দর্শনের পন্থানুসরণে দার্শনিক কাব্য বিষাদের জন্ম।

বিল্বমঙ্গল যে পথে হরি লাভ করেন অলর্ক সেই পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, অলর্কের হরিলাভ হয় নাই, তিনি নারী প্রেম সিদ্ধ করিয়াছিলেন। মাধব বলিতেছেন,—

বিপদে কাণ্ডারী জেন শ্রীমধুসূদন।
তাপ দূর হবে সার কর শ্রীচরণ।

অলর্কের তখন তাপে শান্তি! বিষাদে আনন্দ। প্রভু উপদেশ, মাতৃ অনুরোধ, সকলি বিফল হইল। জননীর আদরের দান মধুসূদনের শ্রীচরণ সলিলসাৎ হইল। যে নারী প্রেমে হরিকে জলাঞ্জলী দেয়, তাহার মোক্ষলাভ হইয়াছে।

মাধবের শিক্ষা সফল হইল। মাধব শিখাইয়াছিলেন, ভাল বাসিলে নর নারী জ্ঞান থাকে না। মাধব শিখান নাই যে, ভাল বাসার দেবতা নারীর নিকট পরাস্ত।

"সখি নাহি জানিনু সোহি পুরুখ কি নারী—
রূপ লাগয়ে হৃদয় হামারি।
না বুঝিনু কাহে পরাণ চাহে,
তাহে নিরখিব সাধ, সখি॥
পিয়ারা বিন প্রাণ কাঁদে, সখি,
পিয়াসী সখি মেরি আঁখিরে!
কাঁহা মিলব বনে বনে ঢুঁরব—
মনচোরা বনচারী!"

মাধব শিখাইয়াছিলেন, প্রেমিকের দুঃখ সুখ সকল অবস্থাতেই আমোদ। অলর্ক শিখিয়াছিলেন যে, দুঃখে এত আনন্দ যে তাহার পৃষ্ঠা পরিবর্ত্তন করিয়া অপর পৃষ্ঠায় কি আছে, দেখিবার অবসর নাই।

হেরি চম্পক কলি পড়ে ঢলি ঢলি
আমা বিনে সে কি জানে?
চাঁদ নিরখি ভাসে দুটি আঁখি
ফিরে ফিরে চায় চাঁদের পানে।

কনক চম্পক-দাম গৌরী সরস্বতীর চাঁদ মুখ ইহকাল পরকাল ঢাকিয়া ফেলিল, অলর্ক আর কাহার মুখ দেখিতে পাইলেন না।

অন্ধ বিল্বমঙ্গল পরের নিকট চক্ষু ধার করিয়াছিলেন। অলর্ক সাধনায় সিদ্ধ করেন—আম্রপল্লবে একটী পাখীর চোখ—অসীম সংসারে কেবল এক খানি মুখ।

গিরিশ চন্দ্রের কল্পনা দিগন্ত-প্রসারিণী। এমন সাধু চরিত্র আঁকিবার ক্ষমতা যাঁহার আছে, তিনিও সাধু। সোমনাথের মত আমরাও পাঠককে বলিতে পারি "তুমিও সন্ন্যাসীর হৃদয় জান না। উঠ, তুমি কি জান, কি নিমিত্ত সন্ন্যাসী হয়? তুমি কি জান, সংসার শূন্য দেখে তার পর এ পথ অবলম্বন করে? তুমি কি জান মর্ম্ম বেদনা মর্ম্মে লুকাইতে হয়? তুমি কি জান জীবন্মৃত হইতে হয়? সন্ন্যাসীর অবস্থা জান না।"

শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র রায় চৌধুরী।

মহাদেব বা মহেশের পাশ্চাত্য অবতার।

পৃথিবীতে প্রাচীন কালের যে সমস্ত গ্রন্থ বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে ঋগ্বেদ সর্ব্ব প্রাচীন। একথা সর্ব্ববাদিসম্মত। একজন বেদজ্ঞ পণ্ডিতের মতে ঋগ্বেদানুসারে অতি আদিম কালে দ্বিবিধ মানবের উল্লেখ পাওয়া যায়। (১) পশু-পালন-নিরত ও মৃগয়াশীল মানব বা ব্যাধ (২) কৃষক।

কৃষি পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে উভয় সম্প্রদায়ই মৃগয়ালব্ধ এবং পালিত জীবের মাংসাহারে জীবিত থাকিত, কিন্তু কৃষির উন্নতির সঙ্গে তাঁহাদের আহারীয় কিছু বিভিন্ন হইতে লাগিল এবং কালক্রমে মতভেদ উপস্থিত হইলে সম্প্রদায়দ্বয় পৃথক হইল।

এই বিবরণ যেমন বেদে, তেমন বাইবেলে পাওয়া যায়। আদমের ঈভ নাম্নী স্ত্রীর গর্ভে আবেল ও কেন নামে দুই পুত্র জন্মে। আবেল পশু পালনে ও কেন কৃষিতে নিযুক্ত হইয়াছিল* এবং দুই ভায়ে বিবাদ হইলে যুদ্ধে আবেল হত হইয়াছিল। কোরাণে অনেক দূর পর্য্যন্ত মহেশ (Moses) দেববিৎ (David) ঈশ (Jesus) এই পেগম্বর বা প্রচারক ত্রয়ের কথা বিশ্বাস্য বলিয়া কথিত আছে এবং উঁহাদের ধর্ম্ম পুস্তক ত্রয় বিশ্বাস্য † এমন উল্লেখও আছে। সুতরাং বৈদিক, বিব্লিক ও কোরাণিক উপাসকত্রয়ের নিকটে (১) ব্যাধ (২) কৃষক এই দুই আদিম বিভাগ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ নাই।

কৃষকগণ ইদন (নন্দন) কাননের পূর্ব্বদিকে নদ (Nod) তীরে বাস করিত (বাইবেল)। কেহ উক্ত নদকে (Oxus), কেহবা সিন্ধুনদ বলেন। পার্ব্বত্য শীত-প্রধান দেশে যে কৃষক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি বা প্রাধান্য প্রথমে সূচিত হয়; ইহার বিস্তর প্রমাণ আছে। ব্যাধগণ যেমন পর্ব্বতে তেমন সমভূমিতে, যেমন মরুভূমিতে তেমন সমুদ্রতীরে, সর্ব্বত্র বাস করিত। ফলে কৃষকগণ নব সম্প্রদায়, ব্যাধগণ মৌলিক সম্প্রদায়। কৃষক অল্প, ব্যাধ বহুল।

এই কৃষক ও ব্যাধ, বিবিধ হিন্দুধর্ম্ম গ্রন্থে দেব ও দানব, মানব ও রাক্ষস, নর ও বানর এবং ব্রাহ্মণ ও শূদ্র নামে পরিচিত। ইহারাই বাইবেলে খ্রীষ্টীয় ও য়িহুদীয় এবং কোরাণে মস্লেম ও কাফের।

যখন মানব জাতি উক্ত দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয় নাই, তখন হইতে তাহারা প্রকৃতির উপাসক ছিল। যদি জ্ঞান ও নয়নের সম্মুখে কোন বিশ্বাস্য পূজার্হ পদার্থ রাখিতে হয়, তবে প্রকৃতি ভিন্ন আর কি আছে?

প্রাকৃত পূজ্য পদার্থের মধ্যে চন্দ্রই প্রথমে প্রাধান্য লাভ করে। জ্যোতিষশাস্ত্রের

---

* "And Abel was a keeper of sheep but Cain was a tiller of the ground."
Genesis, chapter IV.

† "The Pentateuch, the Psalms, the Gospel successively delivered to Moses, David, and Jesus."
Sale's Koran, page 57, the preliminary discourse.

অঙ্কুরোদয় কালে এই প্রাধান্য সূচিত হয়। চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে সময়ের গণনা এবং নক্ষত্রগণের অবস্থান অনুসারে ঋতু কাল নির্দ্ধারণ করার সুবিধা হইল এবং মানবের কৃতজ্ঞতা বৃত্তি উত্তেজিত করিল। যে সপ্তর্ষির বংশ পরম্পরার উপর হিন্দুর মহাভারত স্থাপিত হইয়াছে, সেই সপ্তর্ষি একদা আরবেও পূজিত হইত।* এই প্রকারে তখন তারাবৃত চন্দ্রের প্রাধান্য বাড়িতে থাকে। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে ব্যাধ গণের প্রাধান্য থাকাতে চন্দ্র ও নক্ষত্রালোক তাহাদের যেমন রমণীয় ও রাত্রি কালে গতি বিধির সুবিধাজনক, আর কিছুই তেমন নয়। এজন্যও চন্দ্র-প্রাধান্য বদ্ধমূল হইল।

এ সময়ে শিব সকলেরই উপাস্য দেবতা, কেন না, তিনি পঞ্চভূতাত্মক পদার্থ-জ্ঞানের দ্বারা সর্ব্বত্র ঐশী শক্তির সদ্ভাবের বিষয় জগতে প্রচার করেন এবং মহা মান্য প্রাপ্ত হন। তদানীন্তন সময়োচিত পূজা প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করিলে, উপাসকেরা তাহাকে চন্দ্রমৌলী ও তারাসতী সেবিত মনে করিল। যদি স্বর্গে ঈশ্বরের স্থান হয়, তবে সুধাকর ও নক্ষত্র নিকরই সেই স্থানের চিহ্ন, সন্দেহ নাই।

কৃষি-প্রণালীর সহিত সূর্য্য প্রাধান্য সূচিত ও সভ্যতার বিকাশ হয়। সূর্য্যালোক কৃষিকার্য্যের জীবন, সুতরাং কৃষক সম্প্রদায় সৌর। কৃষি উৎপন্ন শস্যের পাক-প্রণালীর সহিত অগ্নি উপাসনার সৃষ্টি। এই প্রকারে কালক্রমে মানব জাতির কৃষক শাখা সাগ্নিক সৌর সম্প্রদায়ে পরিণত হইল। যজ্ঞ ও গায়ত্রী ইহার প্রমাণ। কৃষকগণের গত্যাভিমুখী জ্বলন্ত সূর্য্যদেব সমধিক সংপূজিত হইতে লাগিলে, আত্মাবাদ প্রকটিত হইয়া তৎসহ সাদৃশ্য স্থাপন হইল। এই আত্মাবাদ হইতে প্রবেশার্থে বিষ্ণু (বিশ + স্নুক) সূর্য্যের এক নামান্তরাবলম্বনে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি।

এই প্রকারে ব্যাধ ও কৃষক সম্প্রদায় পূর্ব্বে চন্দ্র সূর্য্য, পরে শিব বিষ্ণুর উপাসক ভাবে দাঁড়াইল। শিব যেমন বিজ্ঞান বলে সকল পদার্থে এক ঐশী শক্তি প্রচার করিয়াছিলেন, বিষ্ণুকে যাহারা শিবের স্থলে বা বিরুদ্ধে দাঁড় করিতে চেষ্টা করিল, তাহারা বিষ্ণুতেও সেইরূপ ঐশপ্রভাব আরোপিত করিল। এই স্থলে উভয় সম্প্রদায়ের মূল প্রকৃতি ঐশী শক্তি স্থিরীকৃত হইল। কিন্তু যেমত একবৃন্তে দুই ফুলের ন্যায় চন্দ্র সূর্য্য, শৈব বৈষ্ণব দুই শাখা থাকিয়া গেল। একে শিব প্রাগুক্ত ও আদ্য ভাবে বর্ণিত, বিষ্ণু সূর্য্যের নামান্তর ভাবে সেবিত।

কেহ কেহ ব্যাধ ও কৃষককে অনার্য্য ও আর্য্য নামে অভিহিত করেন। ইহাদের অবলম্বনেই চন্দ্র সূর্য্যবংশ কল্পিত হইয়াছে।

শিব জগতের আদি ধর্ম্ম-প্রচারক এবং স্বয়ং ঈশ্বর (Personal God) ঈশ্বর, ঈশ, ঈশান, মহেশ শব্দ ভিন্ন অন্যে প্রযুক্ত হইতে পারে না। তবে পৃথিবীতে শিব মতাবলম্বী যে সকল মহাত্মা জন্মগ্রহণ

*'The ancient Arabians and Indians between which two nations there was a great confirmity of religions had *seven celebrated temples* dedicated to seven planets."

Sale's preliminary discourse on the Koran.

করিয়াছেন, তাহাদের অনেকে শিবোহহং বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

চন্দ্র সূর্য্য, শিব বিষ্ণু বা জড়াজড় উপাসক দলদ্বয় পৃথিবীতে বিস্তর বিবাদ বিসম্বাদ করিয়াছে ও করিতেছে। তজ্জন্য সময়ে সময়ে মহাপুরুষ সকলের আগমন আবশ্যক হইয়াছে। ইঁহারা স্থানে স্থানে একতা সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন এবং কার্য্যক্ষেত্রের বিস্তৃতি অনুসারে জগতে মান, প্রতিষ্ঠা ও পূজা পাইয়াছেন। এই একতা সংস্থাপনকালে সকল সময়েই শিব-প্রবর্ত্তিত পথে তাঁহাদিগকে চলিতে হইয়াছে। ইহার প্রমাণ হিন্দু শাস্ত্রে অনেক। রাম সীতা ধর্ম্ম প্রচারার্থে দাক্ষিণাত্যে ও লঙ্কায় গমন করিয়া মহেশের আশ্রয়েই কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ, উপমন্যু মুনির আশ্রমে শিব মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। (১) পরম বক্তা ও অমিত ধর্ম্ম প্রচারক অর্জ্জুন কিরাতরূপী শিবের অনুগৃহীত। বঙ্গবাসী দলের উপধর্ম্মিগণের নিকট এ কথাগুলি নূতন বোধ হইতে পারে, কিন্তু ইহার কিছুই নূতন নহে। আমরা মহাভারত ও তৎশাখা রামায়ণ পাঠে. রাজকীয় ধর্ম্ম প্রচার কার্য্য ভিন্ন আর কিছুরই প্রাধান্য দেখিতে পাই না। কিন্তু যেখানে ধর্ম্ম প্রচার, সেই থানেই একতা, কারণ একতাই ধর্ম্ম। কিন্তু এই একতা সংস্থাপন, যখন মানবজাতি এক ছিল, তখনকার উপাস্য ঈশ্বর শিবের কৃপা ভিন্ন কোন স্থানে কোন কালে সিদ্ধ হয় নাই।

বিষ্ণুভক্তগণ ভারতে প্রবেশের পূর্ব্বে অনেক সময় পর্য্যন্ত নিরাকারবাদী ছিল। এবং পরেও বহু কাল নিরাকারবাদের প্রভুত্ব চলিয়াছে। উপনিষৎ তাহার সাক্ষী।

এই সময়ে একদল আফগানবাসী আর্য্য সম্প্রদায় শিরিয়া দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে। তাহাদের সঙ্গে নিরাকার বিষ্ণুবাদ তথায় গমন করে।* প্রাকৃত পদার্থের অর্চ্চনার সহিত শৈববাদ ত পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ছিল। একটুক নিরাকারবাদের ধূয়া বশতঃ, বাইবেলে ইহুদী জাতির নিকট প্রথম ঈশ্বর বাক্য প্রচারিত হয়, এই ঘোষণা আছে। কিন্তু সমুদ্রের মধ্যে একবিন্দু জলের ন্যায় সেই নিরাকারবাদ তথায় টিকিল না, এজন্যই আবার ঐ ইহুদী জাতি খ্রীষ্টানগণের নিকট এত ঘৃণ্য। যাহারা নিরাকারবাদ প্রচারক, তাহারাই নিরাকার-বাদনিবারক, এই অসামঞ্জস্যতা পরিহার মানসে ইহুদীজাতির প্রতি ঈশ্বরের কত শাপ, শাস্তির কথা লেখা আছে।

যে সকল অবতার একতা সংস্থাপনের

---

(১) "বৎস মহারাজ! পূর্ব্বে আমি পুত্রের নিমিত্ত যখন সুমেরুপর্ব্বতে তপস্যা করি, তৎকালে এই স্তব (শিবের সহস্রনাম বিষয়ক স্তব) কীর্ত্তন করিয়াছিলাম। হে পাণ্ডুনন্দন, আমি সেই স্তোত্র পাঠ করিয়া অভিলষিত বিষয় সমুদায় প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তদ্রূপে তুমিও শঙ্কর হইতে কামনা প্রাপ্ত হইবেক" ১৮শ অনুশাসন পর্ব্ব, মহাভারত।

* Asiatic Researches গ্রন্থে Sir William Jones আফগান ভূগে Jews ইহুদী জাতির উপনিবেশের কথা বলেন। কারণ আফগান-বাসীতে ও ইহুদীতে যে দৃশ্যমান ও শাস্ত্রোক্ত সাদৃশ্য আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। আমরা বুঝি, শিরিয়াতে হিন্দুকুশ-নিবাসী আর্য্যগণ উপনিবেশিত হইয়াছিল। টেলর সাহেবের মতে মিসরে হিন্দু উপনিবেশ ছিল, তবে শিরিয়াতে থাকিবে না কেন? খ্রীষ্টান লেখকগণ বাইবেলের প্রাধান্য ও আদিমত্ব রক্ষা করার জন্য মাতৃদেশ ও উপনিবেশিত দেশ উলটা করিয়া বলেন।

জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিল, তন্মধ্যে হিন্দু শাস্ত্রোক্ত, আজ পর্য্যন্ত, শেষ অবতার বুদ্ধদেব। ইনি পরম শৈব ও কৈবল্যবাদী। ইনি জন্মান্তর পরিগ্রহ উঠাইয়া দিয়া নির্ব্বাণ মুক্তির উপদেষ্টা। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্কিম বাবুও নির্ব্বাণমুক্তির পক্ষপাতী। সে কথা যা'ক।

বহুশতাব্দীর বৈদিকধর্ম্মবাদের বিরুদ্ধে যখন নির্ব্বাণ মুক্তির কথাটা উঠিল, তখন লোকগুলি ক্ষেপিয়া গেল। শাক্যসিংহ ব্রাহ্মণগণের দাসত্ব হইতে সকলকে মোচন করিতে লাগিলেন, তাহার উপর অসংখ্য জন্মান্তর পরিগ্রহ নিবারণ করিয়া দিলেন, যুগযুগান্তরের গর্ভ যন্ত্রণা উঠিয়া গেল, লোকে আর চাহিবে কি? ক্রিয়া কর্ম্ম উঠাইয়া দিলেন, ইহা ত আরও সুবিধা। রাজা প্রজা উন্মত্ত হইয়া সমুদায় দেশ বৌদ্ধ হইল।

৫০০ হইতে ১০০০ বৎসরের মধ্যে একএক অবতার আবশ্যক। অতিপূর্ব্বে ২০০০ বৎসরেও ধর্ম্ম-শিথিলতা জন্মিত না। সুতরাং অবতারগণও একটুকু বিলম্ব করিয়া আসিতেন। অনুষ্ঠানের লোপ নিবন্ধন, সত্বর সত্বর অবতারের আগমন পথ, বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক প্রশস্ত হইল। কারণ ধর্ম্ম-শিথিলতা জন্মিতে আর গৌণ থাকিল না।

৫০০, ৬০০ বৎসর অতীত হইতে না হইতেই কৈবল্যবাদের কৃত্রিম নকল নির্ব্বাণ মুক্তিবাদ লোকের নিকট হেয় বোধ হইতে লাগিল। যাগযজ্ঞ তপস্যা দ্বারা যে কৈবল্য লাভ করা যায় না, কিছু না করিয়াই, "খাই দেলাই সুখে থাকি" মতাবলম্বনে সেই কৈবল্য লাভ হইবে, ইহা লোকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। তাহারা দেখিল, নির্ব্বাণ মুক্তিবাদ কেবল নাস্তিকতা বাদ মাত্র।

শৈবদিগের ৭টী প্রধান ধর্ম্মালয় বা প্রচার-কেন্দ্র ছিল। পাঠক তাহার আভাস পাইয়াছেন, তন্মধ্যে কৈবল্যধাম কৈলাস তিব্বতে, কেবলা (Kebla) ইহুদীয় প্রদেশে এবং কাবাবা Kaaba আরবে *। অন্য ৪টা কোথায় তাহা নির্ণয় করিতে পারি নাই, এ প্রসঙ্গে উল্লেখেরও আবশ্যক নাই। কেবলার অন্যনাম জেরুজেলম। বৌদ্ধধর্ম্মের তরঙ্গ শৈবধর্ম্মের শিরায় শিরায় প্রবেশ করিয়াছিল, সুতরাং জেরুজেলমে তাহার আঘাত লাগিল। ধর্ম্ম শিথিলতা জন্মিল। যুক্ত অবতার ঈশকৃষ্ণ (হরহরি) জন্মগ্রহণ করিলেন। Jesus Christ কে কোরাণে ঈশ পেগম্বর বলে। এজন্য পূর্ব্বেই বলিয়াছি, Jesus Christ এর হিন্দুকৃত নাম ঈশকৃষ্ণ।

ঈশকৃষ্ণের প্রকৃত নাম লুপ্ত। কয়জন লোকে বিশ্বম্ভর মিশ্র ও সিদ্ধার্থের নাম জানে? অথচ চৈতন্য ও বুদ্ধদেবের নাম সকলেই জানে।

মেরী পুত্র কৃষ্ণ ও বুদ্ধের প্রণালী অবলম্বন করিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য শিবালয় কৈবল্য ধাম (Kebla) জেরুজেলমে শিবাদেশ ভিন্ন তাঁহার কথা শুনে কে? বিশেষত সে সময়ে পৃথিবীর লোক ৮০ ৭০ আন্দাজ শৈব বৈষ্ণব হইয়াছে, সুতরাং তিনি কৃষ্ণ অবতারের আরোপ করিয়া আপনাকে পরিচয় দিলেন।

তবে ঈশকৃষ্ণ, ঈশের মহত্বও কৃষ্ণের চতুরতা, উভয়েই দক্ষ ছিলেন। বুদ্ধদেবের দোষ পরিহার করিয়া চলিতেও ত্রুটী করেন নাই। নির্ব্বাণ মুক্তিবাদ ও জন্মান্তরবাদের সামঞ্জস্য

* হিন্দুদিগের যে বদ্ধমূল বিশ্বাস আছে, কাবাবাতে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা মিথ্যা নহে। উহা শুক্র প্রতিষ্ঠিত

মানসে তিনি পুনর্জীবন ও বিচারের কথা প্রচারিত করিলেন। ইহাতে পাপপুণ্যের শাস্তি ও পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকিল, অথচ পুনঃ পুনঃ জন্মের কেলেঙ্কারী থাকিল না। প্রচারের ভাব কৃষ্ণের প্রচারের মত হইয়া দাঁড়াইল। ইহা এক প্রকার বৌদ্ধপ্রচারের প্রতিক্রিয়ার সূচনা (Reaction)।

কিন্তু তাঁহার স্বদেশতন্ত্রী Messiah (মহেশের) নামে বাজিত। উক্ত হিব্রুশব্দ আরবী ভাষায় Masih। পাঠক সহজেই বুঝিবেন, হ, শ স্থানে উল্টে যাওয়ায় মহেশ শব্দ ঐ আকার ধারণ করিয়াছে। এই প্রকারে দ্বিতীয়ান্ত হবিম রহিম হইয়াছে, রুদ্র পদ রুদ হইয়াছে। Saviour শব্দও শৈবর (শৈবঃ) হইতে হইয়াছে

যদি এদেশে কোন মোক্ষমূলর জন্মিতেন, আরবী ও হিব্রুর সহিত আদি সংস্কৃতভাষার অনেক সামঞ্জস্য করিতে পারিতেন। আমাদের কথা কে শুনিবে ?

মহেশানুগত ঈশকৃষ্ণ, ঈশ নাম ধারণে, মহেশের সহিত পিতা পুত্র ভাব প্রকাশ করিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার সম্পাদক যোগ্য শিশির বাবু জন রবার্টসন সাহেবের কৃষ্ণ খ্রীষ্ট অভিন্নবাদের কথায় মোহিত হইবার পূর্ব্বে একবার স্মরণ করিতে পারেন, এই প্রবন্ধ-লেখক বৎসরাধিক পর্য্যন্ত হোপ ও নবাভারতে ঐ কথাই প্রচার করিতেছেন। তবে Jesus Christ এর ধর্ম্মপ্রচারে ।৶০ আনা যে শৈব ভাব আছে, সে কথা আমরা ভুলিতে পারি না। এজন্য ঈশকৃষ্ণ, মহাদেবের সম্পূর্ণরূপে না হইলেও, অধিকাংশে অবতার, একথা বলিতেই হইবে।

মহেশের দ্বিতীয় এবং অপেক্ষাকৃত পূর্ণ অবতার মহাযোগী মহম্মদ। বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে যে প্রতিক্রিয়া খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে আরম্ভ হয়, তদনুসারেই মহম্মদীয় ধর্ম্মে, তাহা চলিতে থাকে। মহেশে বিশ্বাসের ত্রুটীবশতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম, দর্শনশাস্ত্রের এমন সুন্দর লীলাক্ষেত্র হইয়াও, অধিকারচ্যুত হইতে থাকিল। ঈশকৃষ্ণ সে বিশ্বাস আংশিক স্থাপিত করিতে পারিয়াছিলেন। মহম্মদ তাহা পূর্ণমাত্রায় বদ্ধমূল করার মানসে যেরূপ চেষ্টা করিয়াছেন ও কৃতকার্য্য হইয়াছেন, জগতে কোন ধর্ম্মপ্রচারক সেরূপ হইয়াছে কিনা, সন্দেহ। অথচ ইহার মধ্যে একটুকু প্রতিক্রিয়ার ভাব আছে। যে শৈব ও বৈষ্ণব ভাব ঈশকৃষ্ণে যুক্ত হয়, মহম্মদে তাহা বিযুক্ত হইয়া আদি শৈবভাব থাকে। পাঠককে বলিয়াছি, জড়পদার্থের উপাসনাতে ঈশ্বরের অনুপ্রাণিত আদি শৈব মত, এবং মহম্মদের মত ও Unity of God অর্থাৎ একতাবাদ। ঈশ্বর ভিন্ন কোন দেবতাই নাই। (১) কিন্তু পার্থিব রাজ্য বিস্তারের সহিত কতকগুলি পার্থিব স্পৃহা জন্মে। তদনুসারে তিনি কোন কোন দেবালয় ধ্বংস করেন। কিন্তু তাঁহার দেবভাব শৈব-ভাব। এমন কি, কোরাণের আদ্য অধ্যায় শৈব যুধিষ্ঠিরের (২) বাক্যের প্রতিচ্ছায়া মাত্র। নিম্নে তাহার অনুবাদ দেওয়া গেল ঃ

জয় জয় ঈশ সর্ব্বজীব অধিপতি !
বিচার দিনের পতি দয়াময় অতি।
তোমারে আমরা ভক্তি হইয়া সহায়
চালাও সেপথে, যে পথে হয় ন্যায় ;

"(১) "There is no God but God."
(*Sale's Koran.*)

(২) যে অর্থে অর্জ্জুন শৈব, সে অর্থে যুধিষ্ঠিরও শৈব। যে ধর্ম্মবকের সঙ্গে কথোপকথন হয়, সে বক শিব ভিন্ন আর কেহই নহে। বকাধিপতি কুবের শিবের অনুচরই।

সে পথে, যেপথে গত তব প্রিয়জন (১)
কিন্তু সেই পথে নহে যেপথে দুর্জ্জন।

এতদপেক্ষা সুন্দর ও যোগ্য প্রার্থনা বাক্য হইতে পারে না। ইহা মক্কায় আদৃত।

"মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থা।"

এই সমীচীন বাক্যও ইহা হইতে ভিন্ন নহে।

কিন্তু মহাম্মদও জন্মান্তরবাদের বিরুদ্ধ। ঈশকৃষ্ণের পুনর্জীবন ও বিচার দিন (রোজ কেয়ামৎ) মত তিনিও বিধিবদ্ধ করেন। পাঠকগণ অনুভব করিবেন, ভরসা করি, শিবের কৈবল্যবাদ হইতেই বুদ্ধের নির্ব্বাণ, ঈশকৃষ্ণের resurrection এবং মহম্মদের রোজকেয়ামৎ হইয়াছে। তবে বিভিন্নতা এই, কৈবল্য, জন্মান্তরবাদকে ধ্বংস করে নাই, অপর তিনটী মতে করিয়াছে।

কৈবল্যবাদে জড় বহুজন্মে অজড়ে (আত্মায়) পরিণত হইবে। Matter spirit হইবে। (২) এবং বিশ্বব্যাপী আত্মার অবস্থাই নিত্য সুখময় (perpetual felicity); ইহাই কৈবল্য বা কেবল সুখ। বোধ হয়, বহুকাল হইতে প্রকৃতি পুরুষবাদের মতে পুরুষ হইতে প্রকৃতি উৎপন্ন যাঁহারা মনে করেন, সেই বৈষ্ণবগণ স্বীয় মতকে তর্ক শাস্ত্রদ্বারা নির্ব্বোধ জনসংখ্যার মনে বদ্ধমূল করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধ, ঈশকৃষ্ণ এবং মহাম্মদ কেহই যে ইহার খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এরূপ আমাদের ধারণা নহে। তবে সহজে যতদূর বুঝি, তাহাতে প্রকৃতি হইতে পুরুষের উৎপত্তিই বা কেন না হইবে, ইহার কারণ দেখি না।

যাহা হউক, মহম্মদের অন্যান্য কার্য্যে ও প্রচারে বহু পরিমাণে শৈবভাব রহিয়াছে। এমন কি, বহুশতাব্দী পূর্ব্বে শিবলিঙ্গ উপাসকগণকে স্বতন্ত্র রাখিবার জন্য যে চর্ম্মচ্ছেদ সংস্কারের ব্যবস্থা ছিল, তাহাও মহাম্মদ বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, বর্ত্তমান সময়ে বৈদিক ও কোরাণিক সম্প্রদায় এমন কুসংস্কারাবৃত যে, শাস্ত্রে ও প্রচারে সহস্র ঐক্যভাব সত্ত্বেও তাঁহারা অনৈক্যভাব চক্ষে দেখেন। বৈদিকগণ কোরাণিকগণের জলস্পর্শ পর্য্যন্ত বর্জ্জিত করিয়াছেন, সুতরাং তাহাদের মনের দূষিত ভাবের সহিত শাস্ত্রের নির্দ্দোষ অবস্থাকেও দূষিত মনে করেন এবং যেখানে গভীর ভ্রাতৃত্ব রহিয়াছে, সেখানে গভীর শত্রুতার কারণ সৃষ্টি করিয়া বৈদিকগণ বৃথা সামাজিকতায় মত্ত হন। কাল নিকট হইয়াছে, যেদিন স্পর্শ দোষ উঠাইয়া বৈদিক ও কোরাণিকে, হিন্দু মুসলমানে অপূর্ব্ব মিশ্রণ সম্পাদিত হইবে। ভগবান সত্বর সেইকাল আনয়ন করুন।

শ্রীমধুসূদন সরকার।

(১) Sale সাহেবের ইংরাজী অনুবাদের অনুবাদ।

(২) নিউটন সাহেবও বলেন God is a Substance ইহারই অর্থ ঐশ ভাব জড়ভাব হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না।

তত্ত্বকথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

৬১। তুমি তাপসবর জনিদের (কবিরের) খেড়কা অঙ্গে পরিধান করিয়াছ, কিন্তু বোধ হয় সয়তান তোমা হইতেই শিক্ষা পাইয়াছে। অন্তরকে নির্ম্মল করিতে চেষ্টা পাও, বাহ্য ভেক ধারণে কিছুই হইবে না। মাকাল ফল দেখিতে অতি সুন্দর, কিন্তু তাহার ভিতরে অঙ্গার।

৬২। তুমি মিষ্ট কথার উপদেশ দানে সকলকে মুগ্ধ করিতেছ, কিন্তু তুমি নিজেই যে সংসার-সুখান্বেষণে কুকুরের ন্যায় দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছ। তুমি প্রকাশ্য ধার্ম্মিকতা দেখাইতেছ, কিন্তু তোমার হৃদয় যে অত্যাচারে পরিপূর্ণ। হৃদয়কে পবিত্র কর। সংসারের সহিত সন্ধি করিয়া সেই করুণানিধি প্রাণেশ্বরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইও না।

৬৩। যিনি দয়া করিয়া তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে তোমার কার্য্যক্ষেত্রের সহায় করিয়াছেন, যিনি তোমাকে তোমার দেহ ও মনোরাজ্যের সম্রাট করিয়াছেন, সেই পরম কারুণিকের সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হইতে কি তোমার লজ্জা হয় না?

৬৪। তুমি জ্ঞান দৃষ্টিতে ভাল মন্দ বাছিয়া নও। অহং ভাব ছাড়িয়া সম্পূর্ণ তাঁহার অনুগত হও, তবে তাঁহাকে পাইবে।

পারসিক সুফি বলিয়াছেন,—

৬৫। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রেম-সাগরে নিমজ্জিত হন, তিনি দিন দিন অধিকতর প্রেম-পিপাসু হইতে থাকেন।

৬৬। সর্ব্বাবস্থায় প্রভুর দাস হইয়া থাকাই স্বাধীনতা। সখাকে মনন করিতে যাহা কিছু প্রতিবন্ধক, তাহা হইতে দূরে থাকাই প্রেমের লক্ষণ।

৬৭। নিভৃতে প্রেম করা এবং সাধনাকে গুপ্ত রাখাই সাধকের লক্ষণ।

৬৮। যাঁহারা প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বরকে মনে করেন, তাঁহাদের মনে অন্য কোন পদার্থেরই স্থান হয় না।

৬৯। তুমি ঈশ্বরকে প্রীতি করিতে লোকের অপ্রিয় হইতে পার, শারীরিক ক্লেশও পাইতে পার, কিন্তু তাহাতে ভীত হইও না। মনসুরের কথা স্মরণ করিলে তোমার সকল ভয় নিবারিত হইবে। কারাগারে তাহার প্রতি ভীষণ পাশব অত্যাচার হইয়াছিল। সেই বীরাত্মা অম্লানবদনে তৎসমস্ত সহ্য করিয়া সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। খলিফা তাঁহার বধের জন্য শূল আনাইলেন। মনসুর শূল চুম্বন করিয়া বলিলেন, বীর পুরুষেরা স্বর্গীয় শূলে আরোহণ করিয়াই স্বর্গারোহণ করিয়া থাকেন। খলিফার আদেশে তাহার হস্ত ছিন্ন হইল। তখন তিনি সহাস্যে বলিলেন, তুমি আমার মানবীয় হস্ত ছেদন করিলে, কিন্তু আধ্যাত্মিক হস্ত, যাহা স্বর্গের চূড়া হইতে গৌরবের মুকুট আকর্ষণ করিতেছে, তাহা কিরূপে ছেদন করিবে? খলিফা তাঁহার পদদ্বয় ছেদন করাইলেন। তখন ধর্ম্মবীর মনসুর বলিলেন, এরূপ ছেদন করা সহজ বটে, কিন্তু আমি যে পদ দ্বারা স্বর্গলোক ভ্রমণ করিব, তাহা আমার এখনও অছিন্ন রহিয়াছে।

অনন্তর মনুষ্যের শরীর-নিঃসৃত শোণিত দ্বারা অজু করিয়া বলিলেন, প্রেমের অজু শোণিত ভিন্ন বিশুদ্ধ হয় না। খলিফা তাঁহার চক্ষু-দ্বয় উৎপাটন করাইলেন। তখন সেই ধর্ম্মপ্রাণ মনুষ্যের বলিলেন, হে ঈশ্বর! ইহারা আমাকে এত যন্ত্রণা দিতেছে, কিন্তু তুমি ইহাদিগকে পরম সম্পদ হইতে নিরাশ ও বঞ্চিত করিও না। আমার হস্ত পদ তোমার পথেই ছিন্ন হইয়াছে। ইহাদের কোন অপরাধই নাই। যখন আমার মস্তক দেহ হইতে বিচ্যুত হইবে, তখন সে তোমাকেই দর্শন করিবে।

৭০। সংসারের প্রতি যাঁহার ঘৃণা, ঈশ্বরের প্রতি যাঁহার দৃষ্টি, তিনিই ধনী। লোকের অত্যাচারে যিনি অক্ষুণ্ণ, তিনিই মহাজন।

৭১। তুমি বিশ্বাসের চক্ষে বুলবুল ও পতঙ্গের প্রতি দৃষ্টিকর, দেখিবে পতঙ্গ অগ্নি দর্শন মাত্র আনন্দে মুগ্ধ হইয়া প্রগাঢ় অনুরাগ প্রকাশ পূর্ব্বক আত্মজীবন বিসর্জ্জন দিতেছে। বুলবুল বসন্তাগমে প্রফুল্ল চিত্তে উদ্যানভূমিস্থিত বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে মধুর কূজন ধ্বনি বিস্তার করিয়া বেড়াইতেছে। প্রস্ফুটিত কুসুমরাজির কোলে কোলে বসিতেছে, কিন্তু মধুর স্বাদ গ্রহণে বিমুখ। তাহার আনন্দে অনুরাগের চিহ্ন মাত্র নাই। ঈশ্বরে যাঁহার প্রকৃত অনুরাগ আছে, সে পতঙ্গের ন্যায়। যাহার অনুরাগের চিহ্ন বাহ্য আড়ম্বরে পর্য্যবসিত, সে বুলবুলের ন্যায়।

৭২। তুমি সংসার-কুহকিনীর কুহকে কখনই মুগ্ধ হইও না। সে তোমাকে ব্যাধের ন্যায় লোভ দেখাইয়া ফাঁদে ফেলিতে চেষ্টা করিতেছে।

৭৩। তুমি লোভ বাহনে আরোহণ করিয়া কখনই পৃথিবী রূপ রেকাবে পা রাখিও না। যদি রাখ, তবে তোমাকে কলুর বলদের ন্যায় ঘুরাইয়া ২ তোমার প্রাণ ওষ্ঠাগত করিবে।

৭৪। তুমি কাকের ন্যায় লোভাকৃষ্টচিত্তে পর্ব্বতের শিখরে শিখরে উড়িতেছ, কখনই বুলবুলের ন্যায় স্থায়ী উদ্যান বিহার করিতে সমর্থ হইবে না।

মছনবীতে উক্ত হইয়াছে—

৭৫। ধিক্ সে জীবনে, যে স্থায়ী সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া অস্থায়ী সম্পত্তি লাভ লালসায় ব্যগ্র। যে উদ্যান কণ্টকাকীর্ণ, তাহাতে পুষ্পান্বেষণ করিতে গেলে সর্পের হস্তে পড়িতে হইবে।

৭৬। যদি তুমি বুলবুলের ন্যায় উদ্যান বৃক্ষে পুষ্পান্বেষণ করিতে চেষ্টা কর, বিষ্টাস্থিত কীট ভিন্ন কোন সুগন্ধ পুষ্প তোমার ভোগে আসিবে না।

কোরাণে উক্ত আছে—

৭৭। সংসারকে মৃত শব রূপে সৃষ্টি করিয়াছি, যে তাহার অন্বেষণ করিবে, তাহাকে কুকুর ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পাবে?

৭৮। জ্ঞানীগণ পরম বন্ধুকে পরিত্যাগ করিয়া পরম শত্রুর সহিত প্রীতি করেন না। তুমি কদাপি শত্রু মিত্র নির্ব্বাচনে বিমূঢ় হইও না।

৭৯। ভগবানের দর্শনলাভ জন্য নিরন্তর চেষ্টা চাই, দেওয়ালের পশ্চাৎ পেঁচকের ন্যায় বসিয়া থাকিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না।

মছনবীতে লিখিত আছে—

৮০। তাঁহার সহিত বন্ধুতা করিতে

গেলে তিনটী গুণ থাকা চাই। নদীর ন্যায় বদান্যতা, সূর্য্যের ন্যায় ঔদার্য্য এবং পৃথিবীর ন্যায় সহিষ্ণুতা।

হাফেজ বলিয়াছেন,

৮১। ঈশ্বরে বন্ধুতার প্রাচুর্য্য সংখ্যানুসারে নয়, হৃদয়ের যোগে প্রত্যক্ষ।

৮২। এই দুইটী ব্যাপার মনুষ্যের পক্ষে তুল্য গর্হিত—নর-নারীর অবমাননা করা, এবং ঈশ্বরের আনুগত্য অস্বীকার করা।

৮৩। তুমি অনন্য চিত্তে ঈশ্বরকে স্মরণ করিবে, তবে অন্য পদার্থকে ভুলিতে পারিবে, তবে তাহাকে বন্ধু সম্বোধন করিতে পারিবে। যদি তুমি তাহা পার, তবে ঈশ্বর তোমার সকল পদার্থের স্বরূপ হইবেন।

মছনবীতে আছে,—

৮৪। তুমি প্রতিদিন সহস্রবার মরিবে, তবে জীবিত হইতে পারিবে। তাহাতে তুমি এমন একটী জীবন লাভ করিবে, যাহার মৃত্যু নাই। যখন তুমি তাঁহাকে জীবন অর্পণ করিবে,তখন তুমি মরিবে,কিন্তু তিনি তাহার জীবন তোমাকে অর্পণ করিবেন। তখন তিনি তোমার সম্মুখে যে পথ উপস্থিত করিবেন, তাহাতে তোমাকে তোমার নিকট প্রকাশ করিবেন। তাহাতে দর্শন, অলৌকিকতা এবং তত্ত্ব-জ্ঞান প্রকাশিত হইবে। তখন সমুদয় জগৎ ভুলিয়া উজ্জ্বল রূপে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। তখন তুমি কিছুই থাকিবে না, সম্পূর্ণ তিনিই থাকিবেন। মনে কর, যখন লৌহ অগ্নি সংযুক্ত হইয়া অগ্নির আকার ধারণ করে, তখন কি লৌহ ও অগ্নিতে কোন প্রভেদ থাকে?

৮৫। তুমি জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করিলে দেখিতে পাইবে, যেমন সূর্য্যোদয় হইলে রাত্রির অন্ধকার থাকেনা, কেবল আলোকই প্রত্যক্ষ হয়, তদ্রূপ তোমার অন্তরের হৃদয়ে তাহার উদয় হইলে কেবল জ্যোতিই থাকিবে। তুমি ও তোমার হৃদয় থাকিবে না, কেবল তিনি। কেবল তিনি!!

৮৬। তুমি সাবধান হইও, নিজের হস্তকে কদাপি ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণে নিযুক্ত করিও না। জিহ্বাকে অসত্য ও পরদোষ কথনে ও তোমার ইন্দ্রিয়গণকে অবশীভূত হইতে দিও না। তাঁহার চিন্তা যেন তোমার অন্তরাকাশে সূর্য্যের ন্যায় উদিত থাকে।

৮৭। যাহারা তোমার নিকট অন্য লোককে অগ্রাহ্য করে, তাহাদের প্রতারণা বাক্যে ভুলিও না। উহা মহা বিপদ-সকলের মধ্যে প্রধানতম বিপদ।

৮৮। তুমি কাহারও প্রতি অসদাচরণ করিও না। যদি কেহ কাহারও প্রতি দুর্ব্যবহার করে, ঈশ্বর অপরকে দিয়া কৌশলে তাহার প্রতিবিধান করেন।

৮৯। তুমি কেবল সেই ঈশ্বরকেই ভয় ও কেবল তাঁহারই সহিত বন্ধুতা করিবে। সংসার বা সাংসারিক পদার্থকে ভয় ও তাহার সহিত বন্ধুতা করিও না।

৯০। ঈশ্বরের নিকটেই বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবে, জনক জননী, তাপস ও রাজার নিকটে সাধারণ।

৯১। যখন কোন রোগীকে দেখিতে যাইবে, খালি হাতে কখনই যাইও না।

৯২। ধর্ম্ম-বিরোধী লোকদিগের সহিত কদাপি বন্ধুতা করিও না।

৯৩। ঈশ্বরের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলে তাহাই তোমার দীনতা।

৯৪। তুমি কখনও কুচিন্তা করিও না। যাহারা কুচিন্তাকে মনে স্থান দেয়, তাহারা ঈশ্বর হইতে বহু দূরে থাকে। তুমি কেবল সেই ঈশ্বরকেই হৃদয়ে স্থান দিবে ও তাঁহাকেই স্নেহ করিবে। এক হৃদয়ে দুই বস্তুর স্থান হইতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী গল্প বলা যাইতেছে।

কোন নগরে রূপগুণ সম্পন্না এক ষোড়শী-যুবতী বাস করিতেন। তিনি কোন যুবাপুরুষের উজ্জ্বলরূপে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করেন। যুবাপুরুষও রমণী-রত্ন লাভে আপনাকে কৃতার্থম্মন্য মনে করিলেন। পরস্পর প্রগাঢ় প্রণয়ের সহিত কিছু দিন সুখে অবস্থিতি করিলে পর, একদিন যুবক একটী প্রস্ফুটিত গোলাপ পুষ্পের আঘ্রাণ লইতে লইতে ঐ যুবতীর সমীপস্থ হইলেন। যুবতী যুবকের হস্তে গোলাপ পুষ্পটী দেখিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন, ওরে অপ্রেমিক! অদ্য হইতে তুমি আর আমার নিকটে আসিও না। আমিও তোমার নিকট যাইব না। মক্ষিকা কি পতঙ্গের ন্যায় প্রেমিক হইতে পারে? চিল কি কখনও বাজকে ধরিতে পারে? কাক কি কবুতরের ন্যায় চলিতে পারে? যে বনে জঙ্গলে উড়িয়া বেড়াইবে, সেকি কখনও উদ্যান-বিহার-সুখ অনুভব করিতে সমর্থ হয়? বাজ যেরূপ অন্যের শরীর-নিঃসৃত শোণিত অঙ্গে মাখাইয়া সহিদের গোরে শুইলে সহিদ হইতে পারে না, তদ্রূপ মৌখিক প্রেমের লক্ষণ প্রকাশ করিলেই কেহ প্রেমিক হইতে পারে না। প্রেমিকের হৃদয়ে দুইটী ভালবাসার স্থান হয় না। এক সিংহাসনে এককালীন কি দুই সম্রাট রাজ্য শাসন করিতে পারেন? তুমি যখন গোলাপ পুষ্পকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছ, তখন তোমার হৃদয়ে আমার স্থান নাই।

প্রেমিক ইয়াহিয়ার কথা শুনিয়া থাকিবে। তিনি অত্যন্ত প্রেমিক ও বৈরাগী লোক ছিলেন। এক দিন তিনি পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া তাহার মুখ চুম্বন ও মুখাবলোকন করিতেছেন, এমন সময়ে সেই পুত্র বলিল, পিতঃ! আপনি কি আমাকে ভাল বাসেন? ইয়াহিয়া বলিলেন, হাঁ। পুত্র বলিল, আপনার ঈশ্বরকেও ভালবাসেন? পিতা বলিলেন, তাঁহাকেও ভালবাসি। তখন পুত্র বলিল, পিতঃ, এক হৃদয়ে দুই ভালবাসা তিষ্ঠিতে পারে না। ইয়াহিয়া শিশু পুত্রের মুখনিঃসৃত অমৃতময় উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া জ্ঞান লাভ করিলেন। তিনি তদ্দণ্ডে পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া শেষ জীবন পর্য্যন্ত নির্জ্জন বাস করেন। তুমি যখন গোলাপ পুষ্প ভালবাসিয়াছ, তখন আমাকে ভালবাসিতে পারিবে না। অদ্য হইতে আমাকে পরিত্যাগ কর। আমিও তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম।

৯৫। তুমি সতর্ক থাক, দস্যু সয়তান (কুবৃত্তি) তোমার হৃদয়-গৃহে প্রবেশ করিয়া যেন বিশ্বাস রূপ মূল ধন চুরি করিতে না পারে।

মছনবীতে উক্ত আছে;—

৯৬। তোমার হৃদয়-গৃহে চক্ষু ও কর্ণ রূপ যে দুইটী দ্বার আছে, সয়তান ঐ দ্বার দিয়া হৃদয়-গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক তোমার মূলধন বিশ্বাসকে অপহরণ করত জিহ্বারূপ দ্বার দিয়া নির্গত হইয়া যাইবে। অতএব তুমি জ্ঞানরূপ দ্বারবানকে উপদেশ দেও

যে, সে যেন সর্ব্বদা সতর্কতার সহিত দ্বার রক্ষা করে।

কবিবর সেখ সাদি বলিয়াছেন—

৯৭। যিনি চক্ষু, কর্ণ ও জিহ্বারূপ তিন দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া সয়তানের হস্ত হইতে বিশ্বাসরূপ ধন রক্ষা করিতে সমর্থ, তিনিই ধনী।

৯৮। তোমার মৃত্যুর দিন উপস্থিত হইতেছে। মুমূর্ষু সময়ে জ্ঞান শূন্য হইবে। জীবিত থাকিতে থাকিতে ঈশ্বরকে সাধিয়া লও।

৯৯। তুমি জ্ঞানরূপ চক্ষুকে উন্মীলিত রাখ, মরণান্তে তোমার কি, হইবে, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে।

১০০। তুমি যাহাদের জন্য সর্ব্বদা কুচিন্তা বিষে জর্জ্জরিত, তাহারা সে বিষের একটুও ঔষধ দিতে পারে না। মরণ সময়ে তাহারাই তোমার গাত্রচ্ছাদন উন্মোচন পূর্ব্বক তোমাকে মৃত্তিকায় সমাহিত করিবে। তোমার নিজের বলিবার একটী বস্তুও তোমার সঙ্গে যাইবে না। (ক্রমশঃ)

শ্রীমির্জ্জা আমিনউদ্দিন আহাম্মদ।

বঙ্গবাসী ও অনাচরণীয় হিন্দু।

(২)

এখন কথা এই, ঊনবিংশ শতাব্দীতে এত অনুদার ভাব লইয়া বঙ্গ-বাসী মাথা তুলিতেছে কেন? অনেকে বলেন, বঙ্গদেশের অপকৃষ্ট শ্রেণীর পাঠকবৃন্দ, বঙ্গবাসী যে খাদ্য যোগায়, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট খাদ্য পরিপাক-করিতে অসমর্থ। ইহা আংশিক সত্য হইতে পারে, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। আমাদের বিবেচনায়, বাঙ্গালী যে প্রকার ধর্ম্ম ও সামাজিক ভাব-প্রধান জীব, বঙ্গ-বাসীও তেমন ঐ সকল ভাব-উদ্দীপক ব্রতে লিপ্ত। ধর্ম্মের বিকৃত অবস্থা না হইলে অবশ্য দেশের এ বিকৃত অবস্থা হয় নাই: সুতরাং ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে সত্য মিথ্যা যাহা বলা যায়, তাহাতে বাঙ্গালীর মন আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। "সুসংবাদের ঝুটাও ভাল," বঙ্গ-বাসীর উন্নতির মূল মন্ত্রও তাই। হিন্দু-ধর্ম্মের উন্নতির কথা বলিয়া, হিন্দু ধর্ম্মের মাথা খাইলেও সংজ্ঞাহীন হিন্দুজাতি নয়ন তুলিয়া দেখিবে না। তাহা না হইলে ৩৬ লক্ষ ব্রাহ্মণের স্বার্থে পরিচালিত হইয়া ৪ কোটি হিন্দুর স্বার্থ-ধ্বংস-কারককে অম্লান বদনে দেশের লোকে হিন্দু ধর্ম্মের রক্ষক বলিয়া স্বীকার করিবে কেন? সত্য বটে, বঙ্গ-বাসীর প্রবর্ত্তনায় রাজসাহীর ধর্ম্ম-সভা বরিশালের ধর্ম্ম সভা, কুমিল্লার ধর্ম্ম-সভা প্রভৃতি কতকগুলি হিন্দু ধর্ম্মের সংরক্ষিণী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, এগুলি কি হিন্দু ধর্ম্মের সভা, না ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সভা? এই সকল সভায় অনাচরণীয় হিন্দুর প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করা হয় এবং তাহাদের সামাজিক ও ধর্ম্মোন্নতি সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা আছে কিনা? পার্শ্বডাঙ্গার শৌণ্ডিক বংশ, দিঘলহাটীর রাজা, ঢাকার শৌণ্ডিকগণ, চাঁদসীর ডাক্তার পরিবার, মাধবপাসার জমীদারগণ, বাবু উমাচরণ দাস প্রভৃতি আরও লক্ষ লক্ষ অনাচরণীয় হিন্দু এই সকল ধর্ম্মসভায় হিন্দু ধর্ম্মের সাম্যবাদের সুবিধা সকল প্রাপ্ত হন কি না, এ কথা কে বলিবে? যদি তাহা না হয়, তবে কাহাকে লইয়া হিন্দু ধর্ম্ম?

জন কতক স্বার্থপর ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ ও জন কতক অপরিণামদর্শী কায়স্থ ইহারাই কি হিন্দু জাতি সকলের কর্তা? ইহা যে ভাবে, সে পাগল। হিন্দু ধর্ম্মের সমুদ্রে যে একটুক একটুক বাতাস উঠিতেছে, তাহার যে পরিণাম ফল ভয়ানক তরঙ্গাঘাত, একথা ধারণা করা তাহার সাধ্যায়ত্ত নহে। সাধারণ শিক্ষা, প্রজাসত্ত্ব আইন এবং অনুবাদিত বেদ ও কোরাণ যখন কার্য্যকারী সাত্ত্বিকের হস্তে পড়িয়া সমুদায় নিম্ন শ্রেণীকে ঊর্দ্ধে প্রধাবিত করিবে, যখন দেশের ৩/৪ ভাগ লোক অর্থাৎ শূদ্রজাতি তাহাদের স্বত্ব ও অধিকার পুনঃ প্রাপ্ত হইবার জন্য অকুতোভয়ে অভ্যুত্থান করিবে, তখন বৌদ্ধদেবের উত্তরাধিকারী কল্কিদেব স্বীয় হিন্দু ধর্ম্মের সাম্যবাদের কশাঘাতে এই হিজিবিজি ধর্ম্মসভা গুলিকে উঠাইয়া দিয়া নব হিন্দু ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিবেন। তাহার ভিত্তি বৈদিক সাম্যবাদ, তাহার বাহ্য শোভা পৌত্তলিকা রূপ ধর্ম্মজগতের অপূর্ব্ব কারা, তাহাতে জাতিভেদের সৌন্দর্য্যও থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার কদর্য্য ভাব স্পর্শদোষ থাকিবে না।

বঙ্গ-বাসীর কৃতকার্য্যতার দ্বিতীয় কারণ, বাঙ্গালী জাতি যায় কোথা? সঞ্জীবনী একখানি উৎকৃষ্ট কাগজ বটে, হিন্দুগণ তাহার উপর আস্থা প্রদর্শন করিতে পারে না। সঞ্জীবনী নিজেও হিন্দু ধর্ম্মের সমালোচনার জন্য অগ্রসর নহে। "সময়" ও "সহচর" প্রভৃতি সংবাদপত্র হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজ পরিত্যাগ করিয়া নানা বিষয়ের গণ্ডগোল লইয়া ব্যস্ত। সুতরাং হিন্দু সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে অযথা বাক্য ও কুসংস্কার সম্পন্ন মত প্রকাশ করিলেও বঙ্গবাসী করে। বঙ্গ-বাসী যদি আচরণীয় ও অনাচরণীয় হিন্দু ব্রাহ্মণ ও শূদ্র, ধনী ও দরিদ্রের প্রতি অপক্ষপাতে হিন্দুধর্ম্মের সাম্যবাদ শিক্ষা দিত বঙ্গ-বাসী দেশের উপযুক্ত কাগজ হইত। বঙ্গ-বাসীর ভূতপূর্ব্ব লেখকগণ এই নীতি বলেই বঙ্গবাসীকে দেশীয় কাগজের শীর্ষস্থানে আনিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গ-বাসী ব্রাহ্মণের হস্তে পড়িয়া সে নীতি ভুলিয়া গিয়াছে। ভুলিয়া গেলেও, যে পাঠকগণ বঙ্গ-বাসী পড়েন, তাহারা বঙ্গ-বাসীর নীতি পরিবর্ত্তন অনুভব করিতে পারেন নাই। আমরা যে পর্য্যন্ত বঙ্গ-বাসীকে নিরপেক্ষ না দেখিব, যে পর্য্যন্ত বঙ্গ-বাসী অনাচরণীয় হিন্দুর সামাজিক উন্নতির জন্য অগ্রসর না হইবে, সে পর্য্যন্ত বঙ্গ-বাসীর কুটিলতা ঘোষণা না করিয়া থাকিতে পারিব না। এরূপ ব্রতে আমাদের কষ্ট না আছে, এমত নহে, কিন্তু সমস্ত হিন্দু জাতির সংঘটন অপেক্ষা জনকতক ব্রাহ্মণের স্বার্থপরতা প্রকাশিত করা তত অনভীপ্সিত হইতে পারে না। নিজের দোষ নিজে দেখা প্রায়ই ঘটেনা। এজন্য বঙ্গ-বাসীর দোষ প্রদর্শনেই এই প্রবন্ধ লেখা হইল। রাজনীতি ও বাণিজ্য নীতি সম্বন্ধে বঙ্গ-বাসীর মত, আমাদের বিবেচনায় তত অন্যায় নহে।

বঙ্গবাসী যদি সত্বর জলচল অর্থাৎ অনাচরণীয় হিন্দুর সজল ব্যবহারের পক্ষ সমর্থন না করে, তবে অনাচরণীয় হিন্দু বঙ্গ-বাসীর হাত ছাড়া হইবে। ৩/৪ ভাগ হিন্দু সংখ্যার স্বার্থের জন্য দ্বিতীয় বঙ্গ-বাসী প্রকাশিত হইতে আজ কালকার দিনে বড় অধিক বিলম্ব হইবে না। বঙ্গ-বাসীর প্রতি অদ্যাপি আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি আছে বলিয়াই এই সাবধানতার প্রবন্ধ লিখিত হইল। আশা করি, আমাদের উদ্দেশ্যের অন্যায় অর্থ করা না হয়।

শ্রীমধুসূদন সরকার।

জন বুল ও রাজা বাহাদুর।

রাজা ক্ষুদীরাম জমীদার বাহাদুর, ঘটিরাম ডিপুটী ও জলধর মুন্সেফের সম্মুখে ভয়ে কাঁপেন; হ্যাট্‌কোটধারী সবডিপুটী ইঁদ্রুস্‌ সাহেবকে দেখিলে ত কথাই নাই। একজন সাম্যবাদী ইংরেজের পক্ষে ইহা বিষম প্রহেলিকা। ইউরোপে লালিত পালিত শিক্ষিত জন্‌বুল বুঝিতে পারেন না, কি কারণে মানুষ এত হীনহৃদয় হইতে পারে। রাজা বাহাদুরের সঙ্গে জন্‌বুলের যদি শারীরিক (Anatomically) কোনপ্রকার পার্থক্য থাকিত, জন্তুতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের সভাতে (Zoological society) জানাইয়া প্রাণীবিদ্যার (Natural History) নূতন সংস্করণে রাজা বাহাদুর ও তাঁহার স্বজাতিবর্গকে, নাম খারিজ করত, দার্ব্বিনের হারাধনের (Missing link) শ্রেণীতে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন। অনুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা (Histologically) করিয়াও কোন প্রভেদ পান নাই, সুতরাং শ্বেতাঙ্গ ভায়ার অত্যন্ত ধাঁদা লাগিয়াছে। "In what category can this curious featherless biped be placed ; A human body presupposes a human soul, it cannot reasonably carry any thing less dignified in it." অনেক চিন্তার পর, এই বলিয়া টেবিলে এক ঘুসি মারিলেন।

বন্ধু জনবুল! সব দেশ ইউরোপ নয়, একটু স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখ, ক্রমাগত বিংশতি পুরুষের আলস্য ও মূর্খতা (সুতরাং নিষ্ঠুর ক্ষুদ্রহৃদয়তার জননী ঘোর স্বার্থপরতা) একত্র করিলে কি এরূপ একটী অভিনব জীব প্রস্তুত হইতে পারে না? তোমাতে উঁহাতে কেন এত তফাৎ, ভাল করিয়া বুঝাইয়া তৎসঙ্গে কিছু উপদেশ দিলে শাদার উপর একটু কালীর আচড় পড়া অসম্ভব নয়; যৎ কিঞ্চিৎ কণিকামাত্র শুভফলের আশা করা যাইতে পারে। ভারত উদ্ধারের জন্য ভগবান যখন তোমাদের হস্তে রাজ্য সমর্পণ করিয়াছেন, চেষ্টা করিয়া দেখ; তবে, একদিনে সাগর বন্ধন হয় না, সাতশত বৎসরের কলঙ্ক সহসা মোচনের আশা, বাতুলতা।

শ্রুতমাত্র মহামনা ইংরেজ লোকাচার্য্যরূপে রাজার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া প্রেমের সহিত আরম্ভ করিলেন:—

"রাজা বাহাদুর! তুমি যে আমাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া সম্ভাষণ কর, উহা আমি ভালবাসি না; এবং কোন বিষয়ে তোমার মত জিজ্ঞাসা করিলে, তুমি যে উত্তর দাও, "হুজুরের যাহা মত, আমারও তাহাই," ইহাতেও আমি বিশেষ দুঃখিত; প্রথম, আমার মত জানিবার পূর্ব্বে তুমি তাহাতে সায় দাও, এ কিরূপ অসঙ্গত ও অনৈসর্গিক ব্যাপার। তারপর, সর্ব্বদা আমার বা অন্য কাহারও (সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর সম্রাট হউন না কেন?) সহিত তোমার মতের ঐক্য হইবে, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। বহুকাল মুসলমান দৌরাত্ম্যের অধীনে থাকিয়া এই সকল কু অভ্যাস চরিত্রগত হইয়া পড়িয়াছে। "Fatherhood of God and

brotherhood of man." আমাদের ধর্ম্ম, সুতরাং সমদৃষ্টি আমাদের স্বভাব; ইতর বিশেষ ভাব জোর করিয়া অনেককে অবলম্বন করিতে হয়, কেবল তোমাদের দোষে। তোমাদের যে সকল লোক আমাদের দেশে গিয়াছেন, তাঁহারা সাক্ষ্য দিতে পারেন, জাতি নির্ব্বিশেষে সকল ব্রিটীশ নরনারী তাঁহাদের প্রত্যেকের সহিত কিরূপ সুন্দর, সুমিষ্ট ব্যবহার করিয়া থাকেন, মানুষমাত্রের প্রতি আমাদের দেশে কিরূপ সম্মান। যে সকল দৃশ্য জন্মে কখন সহ্য করি নাই, তোমাদের জন্য তাহাও চুপ করিয়া দেখিতে হইতেছে:—যদি দেশে কেহ তোমার মত সেলাম করে, অপ্রকৃতিস্থ পাগল বলিয়া তাহাকে পুলিশের জেম্মা করিয়া দিতে হয়; এইরূপ কত সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত বিসদৃশ ব্যাপার সর্ব্বদা সম্মুখে অবাধে ঘটিতেছে, দেখিতে দেখিতে চক্ষু অসাড় ও হৃদয় কঠিন হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, এখন কিসে ভাল হয়, এ সম্বন্ধে দুই এক কথা তোমাকে বলিতে ইচ্ছা করি।

জ্ঞান পশুকে মানুষ করে, মানুষকে দেবতা করে, সুতরাং জ্ঞানলাভ তোমাদের প্রথম প্রয়োজন; এই অমূল্যধন অধিকৃত হইলে সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সহজ হয়। জ্ঞানোপার্জ্জন হইলে জীবন সম্বন্ধে মনে এক নূতন ভাব দাঁড়াইবে। এখন 'পারিবারিক সম্ভ্রম' 'বংশ মর্য্যাদা' প্রভৃতি দানবগণের সেবার্থ ক্রমাগত অর্থসংগ্রহ করিয়া ভাবিতেছ, পুত্র পৌত্রাদির প্রতি কর্ত্তব্যসাধন হইতেছে; কিন্তু জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইলে দেখিতে পাইবে, পুঞ্জীকৃত অর্থ রাশীকৃত রোগের কারণ; এইরূপ উত্তরাধিকারের সাহায্যে, সকল প্রকার অনর্থের মূল আলস দ্বারা আক্রান্ত সন্তান সন্ততি, নিজেদের এবং সংসারের দারুণ অকল্যাণের হেতু হইয়া থাকে। আমাদের দেশে বলে, 'Idlers are the worst thieves that plague and infect the community.' পুরুষ পুরুষানুক্রমে এইরূপ আলস্যের স্রোত চলিলে শারীরিক ও মানসিক প্রাণশূন্যতা অনিবার্য্য। হৃদয়ের বলাভাব হেতু ওরূপ অস্বাভাবিক "ফাকিমভীতি," শারীরিক হীনতার প্রমাণ পোষ্যপুত্র গ্রহণ। দত্তক দ্বারা বংশরক্ষার চেষ্টা যে নিতান্ত জঘন্য শ্রেণীর অর্ব্বাচীনতা, এরূপ সোজা কথাও তোমাদের বুদ্ধিস্থ হয় না, ভাবিয়া দেখ, কতদূর শোচনীয় তোমাদের অবস্থা। একজন গরিবের ছেলেকে মূর্খতা, আলস্য, ভোগ বিলাস, এবং দুরন্ত ছয় রিপুর ন্যায় প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুদল মধ্যে হাত পা বাঁধিয়া নিক্ষেপ করাতে যে মহাপাপ হয়, বুঝিবার বোধ হয় শক্তি নাই। আমাদের দেশে কত কুবের সম ধনী, অপুত্রক অবস্থায় ইহ সংসার ত্যাগ করিবার সময়, সমস্ত সম্পত্তি লোক-সেবার্থ দান করিয়া যান। এরূপ সর্ব্বদাই ঘটিতেছে; কোটী কোটী টাকা এই প্রকারে সাধারণের কাজে লাগিতেছে।

ত্রিভুবন-পালক পরমপিতা পরমেশ্বর তাঁহার সৃষ্ট জীবগণকে প্রত্যেকের প্রয়োজনানুরূপ শক্তি দিয়াছেন, যাহা দ্বারা তাহারা অতিসুখে, সুস্থশরীরে, সচ্ছন্দমনে আপনাপন জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া যাইতে সক্ষম হয়। সেই সকল শক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক স্বাধীন ভাব অবলম্বন জীবের ধর্ম্ম। অতএব পৈতৃক ধন সম্পত্তি পান নাই বলিয়া যিনি আপনাকে

দুর্ভাগ্য মনে করেন, তিনি ঈশ্বরের অকৃতজ্ঞ বিদ্রোহী সন্তান। ঈশ্বরপ্রদত্ত শক্তির অপব্যবহারে উহা নাশ প্রাপ্ত হয় এবং জীবকে পরাধীন করিয়া দুঃখ আনয়ন করে।

সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম।
এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখ দুঃখযোঃ।

ইহা তোমাদের শাস্ত্রের কথা, অথচ তোমরা এরূপ সুন্দর বাক্য সম্পূর্ণ অবহেলা করিয়া চল। সর্ব্বদা প্রয়োজনীয় সকল কাজে ষোল আনা পরের উপর নির্ভর করিয়া অকর্ম্মণ্য জড় পিণ্ডের ন্যায় জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করা ঘোর বিড়ম্বনা, তাহা তোমরা অনুভব করিয়াও আমলে আনিতে চাও না; ঔষধাদি দ্বারা কোন প্রকারে তালি তুলি দিয়া নিস্তেজ * আত্মা ও দুর্ব্বল শরীর যেন কেনচিৎ একত্র রাখিয়া চিকিৎসক-পালনী বৃত্তি চরিতার্থ করত বাহাদুরী দেখাইতেছ। আর আমাদের দেশে ব্রিটীশ সম্রাজ্যের ভাবী সম্রাট প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টরের মত লোক বাল্যাবধি জাহাজের খালাসিদের সঙ্গে পরিশ্রম দ্বারা শরীর এরূপ সবল ও সুস্থ রাখিয়াছেন যে, কোন কালে তাঁহাকে কাহারও উপর নির্ভর না করিলেও চলে। সতেজে তিনি তোমাদের দেশ পর্য্যটন করিয়া গেলেন; স্বচক্ষে দেখিলে, আমি আর কি বলিব।

নামের জন্য তোমরা সর্ব্বদা ব্যস্ত, সুতরাং এই মোটা কথা অনায়াসে বুঝিতে পারিবে,—বর্ত্তমানে, বিশেষ ভবিষ্যতে দশজনে যাহাতে নাম করে, এমন কাজ করিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য। এখন ভাবিয়া দেখ, কি করিলে শত সহস্র মুখে প্রকৃত সুখ্যাতি লাভের সম্ভাবনা। তোমরা যে সকল মহাপুরুষকে প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি বল, তাঁহারা কি বহু অর্থ সঞ্চয় দ্বারা এবম্বিধ নাম রাখিয়া গিয়াছেন? না, তোমাদের শাস্ত্রের শাসন-বাক্যানুসারে স্বার্থপর কৃপণের নামগ্রহণ নিষেধ। পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই এক নিয়ম। স্বার্থপরতা ন্যায়ের মস্তকে কুঠারাঘাত করে, যাহা কিছু ন্যায় ও কর্ত্তব্যের বিরোধী, তাহা ক্ষণস্থায়ী জানিবে। স্বার্থপর কৃপণের সম্মুখে যে যাহাই বলুক, অসাক্ষাতে তাহাকে শাপ না দিয়া জল গ্রহণ করে না, জীবিত কালে এই দশা, তারপর তনুত্যাগান্তে নিকৃষ্ট জন্তুর ন্যায় মুহূর্ত্তমধ্যে সমগ্র সংসারের দ্বারা সম্যক রূপে বিস্মৃত। যাঁহারা এ সংসারে কোটী কোটী জীবের পূজা পাইয়াছেন, পাইতেছেন ও যাবচ্চন্দ্র দিবাকর পাইতে থাকিবেন, তাঁহারা সমকালিক ও ভবিষ্যদ্বংশের প্রকৃত মহত্ত্ব সংস্থাপনোদ্দেশে জ্ঞান ধর্ম্মোন্নতি জন্য বিপুল ত্যাগ স্বীকার ও দুঃখ ক্লেশ সহ্য করিয়া, কেহ কেহ সজ্ঞান শত্রু হস্তে প্রাণ পর্য্যন্ত দান করিয়া, উন্নত চরিত্রের মহোচ্চ আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মূল মন্ত্র "My nation first, myself second," সাংসারিক কোন বিষয়ে তাঁহারা লিপ্ত ছিলেন না, মর্ত্ত্যব্যাপারে কেবলমাত্র যথা প্রয়োজন মনোযোগ দিয়া, কীট-বহ্নি তস্করশক্তির অতীত, অক্ষয়, অজর, অমর ভাববস্তু প্রচারের জন্য জীবন সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। কেবল এই সকল ব্যক্তি, যাঁহাদের কার্য্যকলাপ দ্বারা জাতীয়

* দেশের ডাক্তার কবিরাজ ভায়ারাও এমনি যে, কখন তাঁহাদিগকে কোন অর্থশালী রোগীর জন্য ব্যায়ামাদির ব্যবস্থা করিতে দেখা যায় না, কেবল রিপুকর্ম্ম দ্বারা লোহার সিন্দুক বোঝাই করিয়া যাইতেছেন, বাবুর মন যোগান হইতেছে অর্থ উপার্জ্জনের দ্বার উন্মুক্ত রহিতেছে এমন সুবিধা কি ছাড়া যায়?

আধ্যাত্মিক বল বৃদ্ধি পাইয়াছে, কেবল তাঁহারাই নরলোকে নাম রাখিয়া যাইবার যোগ্য ;—আর তোমার আমার নাম এখনই লুপ্ত, পরে আর কি থাকিবে। অতএব "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা," স্মরণপূর্ব্বক পূর্ব্ববর্তী সাধু মহাত্মাগণের পথানুসরণ দ্বারা জ্ঞান ধর্ম্মোপার্জ্জন করিয়া কায়মনোবাক্যে পরহিতে রত হও, ইহকালে বিমল সুখ পরকালে স্বর্গ, এবং সংসারে অনন্তকাল স্থায়ী নাম রাখিয়া পৃথিবীতে অমরত্ব লাভ করত দুর্লভ মানবজীবন সার্থক কর ; চতুর্ব্বর্গ ফলের অধিকারী হইবে।

যদি ঐতিহাসিক মহাপুরুষদিগের বৃত্তান্ত কল্পনা বলিয়া মনে কর, আমাদের দেশে চল, প্রত্যক্ষ পরার্থপর জীবন দেখাইব। এক মহাত্মার জীবন সম্বন্ধে কিছু বলি। ইঁহার নাম জর্জ্জস্মিথ (George Smith), বয়স প্রায় ৬০ বৎসর, খুব সবল সুস্থ শরীরী, যুবার ন্যায় পরিশ্রমে রত। দরিদ্রের সন্তান ; সুতরাং বাল্যকালেই ইট্‌খোলায় মজুরি আরম্ভ করেন। ক্রমে একটী প্রকাণ্ড ইট্‌-কারখানায় প্রায় ১০০০৲ টাকা বেতনে প্রধান কর্ম্মচারীর (Manager) পদ প্রাপ্ত হন। কিছুকাল ঐ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া কথঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করত উহা পরিত্যাগ করেন। উদ্দেশ্য মহৎ। পরদুঃখকাতর স্মিথের প্রথম সংগ্রাম ইট্‌খোলার প্রপীড়িত বালক বালিকাদের উদ্ধারের জন্য এই কর্ত্তব্যসাধন ব্রতে সত্যসন্ধ বীরকে মহা প্রলোভন পদদলিত করিতে হয় ; শেষে প্রাণ লইয়া টানাটানি। সমস্ত ইট্‌খোলার অধিকারী একত্র হইয়া বিপুল অর্থ, উচ্চপদ ও সম্পত্তির অংশ দ্বারা তাঁহাকে সঙ্কল্প ভ্রষ্ট করিতে না পারিয়া অবশেষে গোপনে প্রাণ সংহারের চেষ্টা পায়। ঈশ্বর যাঁহার সহায়, মানুষ তাঁহার কি করিতে পারে। ইট-খোলার শিশুগণের রোদন (The cry of the children from the Brickyards of England) নামে গ্রন্থ প্রচার দ্বারা দেশের চিত্তাকর্ষণ করত পরিণামে সফল-মনোরথ হইলেন। যে রাত্রিতে পার্লামেন্ট মহাসভায় (House of Commons) তাঁহার প্রভূত চেষ্টার ফল ইট্‌খোলার শিশু মজুর উঠাইবার আইন বিধিবদ্ধ হয়, আনন্দে গদগদ চিত্তে প্রেমের জয়পতাকা উড়াইয়া বাহির হইলেন ; কিন্তু পকেটে একটী পয়সা নাই যে, কিছু কিনিয়া খান, উপবাসে রাত্রি কাটাইতে হইল। তখন বিলের পশ্চাতে স্মিথের নিজের প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা (সমস্ত পূর্ব্বসঞ্চিত ধন) ব্যয় হইয়া গিয়াছে। ধন্য হে স্মিথ। ধন্য তোমার জীবন! ইহ পরলোকে তোমার উন্নত আত্মার পোষণ জন্য নানাবিধ সামগ্রী প্রস্তুত রহিয়াছে, শারীরিক ক্ষুধা তোমার তুচ্ছ। উক্ত সম্বাদ যখন প্রথম একখানি সাময়িক পত্রিকায় পড়ি ; দশমিনিট শিশুর মত কাঁদিয়াছিলাম, (তখন উহার সঙ্গে পরিচয় ছিল না) এখনও মনে হইলে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি না। ঐ জয়লাভাবধি ধর্ম্মবীর দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছেন। সে দিন খালের বালক বালিকাদের শিক্ষার্থ বিধি ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন ; আজকাল জিপ্‌সি সন্তানগণের উদ্ধার চেষ্টায় প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছেন। দেশের সমস্ত সংবাদ পত্রে এই ভাবে আন্দোলন হইতেছে।

"What Mr. George Smith did for the brickyard and Canal children

is now a matter of history, and many will be interested in the effort he has been making to bring gypsy children within reach of legislation. We wish Mr. Smith's Bill all success."

স্মিথ এখন ভিখারী, নিজের ও পরিবারের প্রতিপালন ভার দেশের লোকের উপর; বেনামী পত্রে দশ বিশ পাউণ্ড প্রায়ই আসে। স্ত্রী ও পুত্র কন্যা গুলি অতি সুন্দর ও সুখী। সুখী স্মিথ মধ্যে মধ্যে পরিবার মধ্যে গিয়া আরাম করেন, নতুবা প্রায়ই দরিদ্র সেবার্থ লণ্ডন ও চারিদিকে ঘুরিতেছেন। স্মিথ সশরীরে স্বর্গভোগ করিতেছেন, কখন অপ্রফুল্ল দেখি নাই। সর্ব্বদা ভগবানের নাম, বিধাতার প্রতি চিরনির্ভর, এবং দুঃখীর সেবা, এই কাজ। প্রেমের সহিত স্মিথের নাম দেশে না করে, এমন লোক খুব কম। রাজরাজেশ্বরী পর্য্যন্ত জর্জকে এইরূপ পত্র লিখিয়াছেন :—

Buckingham Palace,
January 17th, 1876.

Sir,

I am desired to acknowledge your letter to the Queen and to say that Her Majesty takes much interest in the endeavours which you make to ameliorate the condition of this class of the laboring population.

I have &
Thos. Biddulph.

বহু লোক স্মিথের জীবনচরিত লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন; অনেকগুলি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। স্মিথের নিজের কয়েকখানি সুন্দর গ্রন্থ আছে।

স্মিথ আর একটী প্রকাণ্ড ব্যাপার করিয়াছেন। শিক্ষা, ধর্ম্মোপদেশ, পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতির বর্দ্ধন ইত্যাদি স্থায়ী উপায় দ্বারা দুঃখ দারিদ্র্য মোচনের চেষ্টায় "প্রেমের দল" (Band of love) সংস্থাপন করিয়াছেন। ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া ও তাঁহার কন্যা রাজকুমারী বিয়েট্রিস এই দল ভুক্ত। সম্রাট ও মজুর এক দলভুক্ত, এরূপ দল বোধ হয় পৃথিবীতে এই প্রথম।

স্মিথের জীবনে অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহার ভিতর দিয়া বিধাতার বিশেষ কৃপা ইঁহাকে এতদূর অগ্রসর হইতে সক্ষম করিয়াছে। এস্থলে সে সকল আলোচনার প্রয়োজন নাই; এখানে কেবল এই মাত্র বক্তব্য যে, প্রকৃত জীবন কাহাকে বলে, স্মিথ তাহার এক জীবন্ত উদাহরণ। স্মিথের পথ অনুসরণ করিতে পারিলে আমাদের আত্মার বিশেষ কল্যাণ হয়। ভরসা করি, তুমি এই সকল বিষয় আলোচনা দ্বারা "ক্ষুদীরাম" নাম পরিহার পূর্ব্বক "মহৎরাম" নাম গ্রহণে অধিকারী হইবার জন্য যত্ন পাইবে।"

এই বলিয়া জনবুল নিবৃত্ত হইলেন। রাজাবাহাদুরের ফাঁপা প্রাণে কোন ছাপ পড়িল কিনা, জানি না; ভবিষ্যত সে বিষয়ে সাক্ষী দিবে।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

মহারাষ্ট্র।

(২)

কলিকাতার প্রথানুসারে আমরা পার্শ্বের বাটীর লোকের সহিত আলাপ করিতাম না এবং তাঁহাদের সংবাদ রাখিতাম না। ধারণা ছিল, এ নগরে বুঝি বাঙ্গালীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। একদিন পথিমধ্যে একজনের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আলাপ হয় নাই কি করিয়া সম্ভাষণ করিব, এ বিলাতী ভাব, প্রবাসে মনে উদয় হইতে পারে না, অথবা পরিচিতের সহিত সাক্ষাৎ হইলে কেবল মাত্র দন্ত বিকাশ করিয়া সম্ভাষণ করিলে চলে না। দক্ষিণ মহারাষ্ট্র রেইল পথ প্রস্তুত উপলক্ষে দশ বার জন বাঙ্গালী এখানে বাস করিতেছেন। তাহাদের মধ্যে এক জনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, দেশের বৈচিত্র্য কি? তিনি স্ত্রীলোকের বস্ত্র পরিধান প্রণালীর কথা বলিলেন। কাশীতে অনেক দক্ষিণী আছেন। সুতরাং আমার চক্ষে এ দৃশ্য অভ্যস্ত হইয়াছে। সেরিং সাহেব কাশীকে Type of India কহিয়াছেন।

অনাবৃত মুখে সর্ব্বসমক্ষে বহির্গত হওয়াকে যদি স্ত্রী-স্বাধীনতা বলে, তাহা দক্ষিণাপথে আছে। এতদ্ভিন্ন আর কিছুতে নাই। স্ত্রীলোক সকল বিষয়ে পরাধীন, বাস্তবিক প্রকৃত স্ত্রী-স্বাধীনতা কোনও দেশে হইতে পারে না। দুর্ব্বল বলবানের অধীন হইবে, এই প্রাকৃতিক নিয়ম। মানুষ যখন ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট, তখন একবারে সকল বিষয়ে অন্যের অধীন হইতে পারে না। বাঙ্গালীর গৃহে কি স্ত্রী স্ব—অধীন নহে? সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার-বর্জ্জিত গৃহস্থকে স্বামিনীর অনুরোধে পৌত্তলিক অনুষ্ঠান করিতে হয়। বাল্যবিবাহ যে রহিত হইতেছে না, তাহার মূল স্ত্রীলোকের অমত। মহারাষ্ট্রে সধবার চিহ্ন “কুঙ্কু” ও ‘বাঙ্গড়ি”। অবশ্য কুমারিতেও তাহা ব্যবহার করে। বিধবা দর্পণে মুখাবলোকন করিতে পারে না। ভোজে যায় না। বরযাত্রী প্রভৃতির দলে যাইতে পারিবে না। কুঙ্কু অর্থাৎ টিপ না পরিয়া সধবার পক্ষে মুখ দেখান নিষিদ্ধ। প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়াই করণ্ডি হইতে উপকরণ বাহির করিয়া তিলক করা আবশ্যক। বিলাসিনী রমণী অতি ক্ষুদ্র বিন্দুবৎ পরে। কিন্তু অন্যে আধুলি পরিমাণের পর্য্যন্ত পরিয়া থাকে। সন্তান হইলে ৪০ দিন অশৌচান্তে নূতন চূড়ী পরা আবশ্যক। তাহাকে বালন্ত চূড়া কহে। চাউল পান শুপারি একটা নারিকেল এবং কয়েকটা পয়সা দিয়া সিধা সাজাইয়া চূড়ী বিক্রেতার সম্মুখে রাখিয়া হাত যোড় করত নারী অভিবাদন করে। বাঙ্গড়ি-বিক্রেতা বলে, জন্ম এয়োতি হইয়া থাক। অন্য সময় প্রকৃত মূল্য দিয়া চূড়ী পরিবার কালেও অভিবাদন করিতে হয়। হাতের চূড়ী যে মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়াছে, এ কথা বলিতে নাই। কারণ চুড়ি যে এয়োতি। স্বামীর জন্য যদি কাহারও নিকট অনুরোধ করিতে হয়; তবে কহে আমার হাতের চূড়ী রক্ষা কর। স্বামী মরিলে শব বাটী হইতে লইয়া যাইবার পূর্ব্বে বাঙ্গড়ি ভাঙ্গিয়া মাথার চুল

মুড়াইয়া একত্র করিয়া "চোলিতে" বাঁধিয়া দেয়। কুক্ষ মুছিয়া এক অন্ধকার গৃহে প্রবেশ করিতে হয়। অন্যের সে মুখ নিরীক্ষণ করা দুষ্য। বাটীতে অপর কোন বিধবা থাকিলে সেই ঘরে খাবার দিয়া আসে, নতুবা পুরুষে দেয়। সধবা বা কুমারী সেই ঘরে যায় না।

গণেশ বাসুদেব জোশী প্রভৃতি যে লওয়াদ অর্থৎ সালিসী আদালত স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার কোন সংবাদ পাই-লাম না। যে সময়ে বাঙ্গালায় পাবনার প্রজা বিদ্রোহ ঘটে, তাহার কিছু পূর্ব্বে এ দেশে মহাজনদের বিরুদ্ধে রায়তেরা উপদ্রব করিয়াছিল। হাটের দিন মাড়ওয়ারি ও মহারাষ্ট্রীয় বণিকের দোকান লুণ্ঠন আরম্ভ হইল। খাতা পত্র, কাপড় ও অন্যান্য সামগ্রী একত্রিত করিয়া অগ্নি সংযোগ করিয়া দিত। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল। তাঁহাদের বিজ্ঞাপনী দৃষ্টে বৃটিশরাজ দক্ষিণী কৃষকের কষ্ট-নিবারিণী বিধি প্রচার করি-লেন। এই আইন অনুসারে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে বাদীকে মধ্যস্থের নিকট যাইতে হয়। তিনি আপসে না মিটাইতে পারিলে বিচারালয়ে যাইবার অনুমতি দেন, তাহার পর আদালতে আবেদন গ্রহণ হইতে পারে। সুদের সুদ কিম্বা অতিরিক্ত হারে সুদ চুক্তিসম্মত হইলেও গ্রাহ্য নহে। রায়তের ভূমি সম্পত্তি বন্ধক না থাকিলে দেনার জন্য বিক্রয় হইবে না। দেনার ডিক্রীজারী-জনিত কারাবাস নিষিদ্ধ। অন্যূন পঞ্চাশ টাকার ঋণ পীড়িত কৃষিজীবী ইন্‌সলভেন্সি লইতে পারে। মহাজন সম্বন্ধে যে রূপ প্রজার কল্যাণকর বিধান হইল, গবর্ণমেণ্ট আপন রাজস্ব আদায় ব্যাপারে তদ্রূপ উদার আইন করিতে পারেন না।

ভূমির রাজস্বের বন্দোবস্ত অস্থায়ী। রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত ত্রিংশত বৎসর ব্যাপী। সুখের জন্য মনুষ্য শ্রম স্বীকার করে। ইহাতে যে সুবিধা ঘটে তাহাতে সে ব্যক্তির স্বত্ব জন্মান উচিত। সে সুবিধা টুকু যদি বলপূর্ব্বক অন্যে অধিকার করিতে চায়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি আবার অপরের দ্বারা অন্য বিষয় হইতে বঞ্চিত হইতে পারে। সুতরাং কেহ সুখী হইতে পারে না। এজন্য অন্যের স্বত্বে হস্তক্ষেপ করা মনুষ্য সমাজে নিষিদ্ধ হইয়াছে। এতাবতা ভূমির উপর প্রজার চিরস্থায়ী স্বত্ব হওয়া প্রাকৃতিক নিয়ম। ভূমির উৎকর্ষ হইলে যদি খাজনা বৃদ্ধি হয়, তবে প্রজার স্বত্ব অক্ষুণ্ণ রহিল না। প্রজার জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করিয়া থাকেন বলিয়া সেই কার্য্যের বেতন স্বরূপ রাজা কর পাইতে পারেন। তাই বলিয়া রাজা ভূম্যধিকারী নহেন। যে ভূমি আবাদ করিয়াছে, সে-ই ভূমির অধিকারী। অদ্যাপি তাতার জাতি যে ভূমিখণ্ড দখল করিয়া কৃষিকার্য্য করে, তাহার শস্য গৃহীত হইলেই অন্য লোকে সে জমি ব্যবহার করিতে পারে। কিন্তু তাহারা এক স্থানে স্থায়ী হয় না বলিয়া স্বামিত্ব হারায়। ভূমি অধিকারের মূলে বল প্রয়োগ না হইয়া শ্রমশীলতা দেখা যায়, পরিশ্রম করিলে স্বাভাবিক স্বত্ব জন্মে। সাঁওতাল পরগণায় কমিশনর সাহেবের নিকট কতকগুলি সাঁওতাল একখানি থালে একটু মৃত্তিকা ধান্য ও টাকা রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিল, আমরা খাটিয়া ভূমিতে শস্য উৎপাদন করি, তবে সে জন্য টাকা লন কেন?

ভারতের অপর স্থানের ন্যায় পুরাকালে মহারাষ্ট্র রাজ্য খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পরস্পর সম্পর্কশূন্য ছিল। মহারাষ্ট্র ইতিহাস-লেখক গ্রাণ্ট ডফ কহেন, সম্ভবতঃ গোদাবরীর তীরে আধুনিক ভীর নগরের সমীপে টগর নামক রাজধানীতে রাজপুত ভূপতি বর্ত্তমান ছিলেন। তাহার পর কুম্ভার বা কুনবী জাতীয় শালিবাহন সেই রাজাকে বধ করিয়া গোদাবরী তীরস্থ বর্ত্তমান মুঙ্গী পাটন অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। অতঃপর দেব গিরী অর্থাৎ দৌলতাবাদের দেবগড়ে মহারাষ্ট্র রাজধানী স্থাপিত হয়। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দের শেষভাবে যখন মুসলমান দেখা দেয়, তখন দেবগিরিতে যাদব রাম দেবরাও রাজত্ব করিতেছিলেন। ইংরাজের মত মুসলমানী রাজ-প্রণালী সর্ব্ব-সংহারক ছিল না। দেশীয় লোকে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিত, কেবল মুসলমান সর্ব্বোপরি কর্ত্তৃত্ব করিতেন। তাঁহাকে রাজা বলিয়া মানিলেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। গ্রাম্য কর্ম্মচারীর মধ্যে মহার বা ধেড় সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। সে পথ-প্রদর্শক, চৌকিদার ও চরের কর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ভ্রমণকারীর অশ্বের জবস আনয়ন প্রভৃতি করিতে হয়। যদি অন্য উপায় না থাকে, ভ্রমণকারীর দ্রব্যজাত তাহাকে বহন করিয়া আপন সীমার বাহিরে দিয়া আসিতে হইত। গ্রামাধিকারীর অপর নাম মকদম, পটেল বা দেশমুখ। কৃষি কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ, চৌকিদার নিয়োগ ও বিবাদ ভঞ্জন প্রভৃতি কার্য্য ইহা'র দ্বারা নির্ব্বাহ হইত। যে বিরোধ পটেল দ্বারা না মিটিত, তাহা তিনি পঞ্চায়তের হস্তে মীমাংসা করিতে দিতেন। ফৌজদারি ব্যাপার উপরিতন কর্ম্মচারিকে দিতে হইত। গ্রামলেখকের অপর নাম কানুন গো, দেশ পণ্ড্যা বা কুলকরণী। পটেল, কুলকরণী ও চৌগুলাতে গ্রামের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ ভূমি নিষ্কর ভোগ করিতে পাইত। বার্ষিক হিসাব রাখাই কুলকরণীর কাজ। তাহার পুস্তিকায় ভূমি সম্বন্ধীয় তাবৎ বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকিত। গ্রামাধিকারীও গ্রামলেখক কর্ম্মচারীর উপর কোনও সময়ে দেশাধিকারী ও দেশলেখক কর্ম্মচারীর পদ ছিল। উক্ত সকল পদই পুরুষানুক্রমে চলিত। গ্রামাধিকারীর ক্ষমতা ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া দেশাধিকারী রূপে পরিণত হইতে পারিত। অধিরাজের ক্ষমতা দুর্ব্বল হইলে সেই দেশাধিকারী স্থায়ী হইয়া রাজা হইয়া পড়িতেন।

মুসলমান সাম্রাজ্য এমন হীন হইয়া গিয়াছিল যে, সপ্তদশ খ্রীষ্টীয় শতাব্দিতে সেই অধীন মহারাষ্ট্রীয়েরা পার্ব্বত্য ভূমি হইতে যখন বহির্গত হইয়া মস্তক উন্নত করিতে লাগিল, তখন লোকে তাহাদিগকে এক অপরিচিত নূতন জাতি বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে সিউনেরী দুর্গে শিবাজী ভোঁসলে জন্ম গ্রহণ করিলেন। তিনি আপন নাম পর্য্যন্ত স্বাক্ষর করিতে পারিতেন না। অল্প বয়সেই অস্ত্র শস্ত্র চালনায় নিপুণতা লাভ করেন। ধনুর্ব্বিদ্যা বিলক্ষণ শিখেন। কুরুপাণ্ডব ও রাম রাবণের যুদ্ধ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অতিশয় উত্তেজিত হইতেন। কেহ বলে, সেই উত্তেজনায় ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমে এক দস্যু দলে মিলিত হন। বিজাপুরের নিজামশাহি রাজ্যে তাঁহার পিতা চাকরি করিতেন।

শিবজী নানা প্রতারণা ও অপকর্ম্ম করিয়া রাজ্য উপার্জ্জন করেন। সকল রাজ্যেরই মূলে ছলনা প্রবঞ্চনা প্রভৃতি আছে। রাজা সুশাসন জন্য প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে প্রজা আপন ক্ষমতা রাজাকে দিয়াছে ও রাজা প্রকৃতিবর্গের সেবক স্বরূপ আপনাকে জ্ঞান করেন, এমন দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রজা একটি নরহত্যা করিলে প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত হয়, কিন্তু রাজা সহস্র মানবকে যুদ্ধ স্থলে বিনাশ করিলেও অপরাধী নহেন। তাহার কারণ, উক্ত যুদ্ধ দেশের হিত সাধন জন্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, কথিত হয়। এই সকল কারণে শিবজী নিন্দনীয় না হইয়া প্রশংসা-ভাজন হইয়াছেন। তিনি আপনাকে রাজপুতবংশীয় বলিয়া নির্ণয় করিতে উদ্যোগ করিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি মরাঠ। তাঁহার চিত্র দেখিলে কোন বন্যরাজা বা দস্যুপতি বলিয়া প্রতীয়মান হয়। শিবজীর গূঢ়চর হাইয়াজী ভবানী দেবী কর্ত্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছে, এমন বাক্য প্রচার জন্য নানা কাহিনী গ্রন্থন করিতেন। ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে ৫৩ বৎসর বয়সে ছত্রপতি শিবজী যবন মর্দ্দন ব্রত সমাপ্ত করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। কোকনে রায়গড়ে তাঁহার মৃত্যু হয়। চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়া চিতাবশেষ রক্ষিত হইয়াছে। স্বদেশবৎসল শিক্ষিত নব্য মরট্টা অধুনা উক্ত মহাত্মার দেহাবশেষ পুনায় স্থানান্তরিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। নেপোলিয়ান বোনাপার্টির দেহ সমাধি উত্তোলন করিয়া ফরাসি ভূমিতে নীত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা নির্ব্বাসনে ছিল বলিয়াই আনীত হইয়াছে। ছত্রপতি শিবজী রায়গড়ে বাস করিতেন এবং তাঁহার মহৎ কার্য্য কলাপ ঐ স্থান হইতে অনুষ্ঠিত হয়, সুতরাং সে মহাপুরুষের স্মৃতি চিহ্ন ঐ স্থানে থাকাই উচি- বিবেচিত হইল। রায়গড়, বিজ্ঞ. অবস্থিত হওয়ায় পুনায় আনায়নের প্রস্ হইয়াছিল। শিবজী অতিশয় দক্ষ ও অনলস পুরুষ ছিলেন। সেই সকলগুণে উত্তরাধিকারীরা কেহই তুল্য হন নাই। সাম্ভজী ওরঙ্গজেবের নিকট প্রেরিত হইলে, সম্রাট তাঁহাকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে কহিলেন। তাহাতে বিদ্রূপ করায় নরাধম শিরশ্ছেদ করিতে আজ্ঞা করিল। শাহুর সময়ে মহারাষ্ট্রীয় মন্ত্রিসমাজে এই কয় ব্যক্তি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। প্রতিনিধি—পরশুরাম ত্র্যম্বক। অষ্ট প্রধান মুখ্য প্রধান—বালাজী বিশ্বনাথ, (অন্য উপাধি পেশয)। অমাত্য অম্বারাও বাপুরাও হনবন্তি সচিব নারুশঙ্কর। মন্ত্রী—নারু রাম শেনবী। সেনাপতি—মামসিং মোরে। সমন্ত—আনন্দ রাও। ন্যায়াধীশ—হোনজী অনন্ত। পণ্ডিত রাও মুদ্গলভট্ট উপাধ্যায়। রাজ প্রতিনিধির বল খর্ব্ব করিয়া মুখ্যপ্রধান অর্থাৎ পেশয়া ক্রমশঃ রাজ্যের বিধাতা হইয়া উঠিলেন। রাজা জগদীশ্বরের ন্যায় সাক্ষী স্বরূপ রহিলেন। তাহার পর যাহা হইবার কথা, তাহাই হইল। পেশয়া রাজ্যের স্বামী হইলেন। হোলকর সিন্ধিয়া তাঁহার পাদুকা হৃদয়ে ধারণ করিয়া মহত্ত্ব লাভ করিল। জন্ম গুণে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ায় কিছু গৌরব নাই। ক্ষমতা না থাকিলে বা ঘটনা চক্র (যাহাকে অদৃষ্ট কহে) অনুকূল না হইলে সে বিভব রক্ষা হয় না। মহারাষ্ট্র রাজ্যে শিবজী ভোঁসলে ও বালাজী বিশ্ব-নাথের ন্যায় তৃতীয় ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিল না। বাজীরাও পেশয়া হোলকরকে শাসন করণার্থ বৃটিশ রাজ্যের সহায়তা যাচিঞা

। অবশেষে সেই মহাবলে ক্ষুদ্র ন হইয়া গেল। হায়! মহারাষ্ট্র শ্য কয় দিন থাকিল! ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র রাজ্যের সংস্থাপক শিবাজী রাজোপাধি গ্রহণ করেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে বাজীরাও হইতে ইংরাজ যে রাজ্য আত্মসাৎ করিলেন। ১৫৪ বৎসর মাত্র সময়। কেহ কেহ কহেন, ভারতে বৃটনবাসী প্রবেশ না করিলে, মুসলমানের পর মহারাষ্ট্রীয়েরা সম্রাট হইতে পারিতেন। দিল্লী হইতে বহু অন্তর হওয়ায় দক্ষিণাপথে মুসলমান পরাক্রম দৃঢ় হইতে পারে না। এই সুযোগে শিবজী দেশীয় ছিন্ন ভিন্ন দল একত্রিত করিতে সমর্থ হওয়ায় মহারাষ্ট্র রাজ্যের অভ্যুদয় হয়। তাঁহা হইতে কিছু বা বালাজী বিশ্বনাথের দ্বারা উক্ত রাজ্যের সমুন্নতি হইয়াছিল। তদানীন্তন রাজনীতি অনুসারে তাবৎ সেনাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভূপতি প্রতিপালন করিতেন না, কর্ম্মচারিদিগকে নিরূপিত সংখ্যক বল পোষণের জন্য ভূসম্পত্তির অধিকার দিয়া রাখিতেন। রাজা ক্ষীণ হইলে উক্ত সেনাপতিরা স্বয়ং সেই প্রদেশাধিকারী হইতে পারিতেন। মহারাষ্ট্র রাজ্যের এই একটি কারণ। যে কারণে উক্ত রাজ্যের অভ্যুদয় হইয়াছিল, সেই কারণেই অবনতি হইল। নেতার ক্ষমতা বিসদৃশ হওয়ায় বিভিন্ন ফল উৎপন্ন হইল। শেষ পেশয়া এমন ক্ষমতাবান হইয়াছিলেন যে, ভদ্রলোকে তাঁহার বাটীতে স্ত্রী পাঠাইতে সাহস করিতেন না।

মহারাষ্ট্রীয়দের বখর নামক জাতীয় ইতিহাসে "সিংঘ" গড় পুনরধিকারের শৌর্য্য বৃত্তান্ত অতি শ্লাঘার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। ইষ্ট উইক্ কৃত বোম্বাই প্রদেশের বিবরণ পুস্তকে সিংহগড় পুনার সন্নিহিত জানিয়া, উক্ত স্থানে অবশ্য যাওয়া উচিত, স্থির করিলাম। সহ্যাদ্রি ও তাহার সমুদয় প্রত্যন্ত শৈলের ভাগ প্রায় সমতল, কিন্তু অত্যন্ত দুরারোহ। এদেশে তাহার উপর অসংখ্য দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে। এটী তাহার অন্যতর। পুনা, সিংহগড় হইতে ৬ ক্রোশ ব্যবহিত। ৪ ক্রোশ যাইয়া খড়কবাসলা জলাশয় দেখিতে পাওয়া গেল। পুনার নালোখিত জল এইখান হইতে যায়। একটী স্রোতস্বতীর মুখে পর্ব্বতাকার বাঁধ দিয়া হ্রদ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। বাঁধটি অর্দ্ধক্রোশ হইবে। উহার গাত্রে অপূর্ব্ব কৌশলসম্পন্ন বারি মধ্যস্থ ছিদ্র পরম্পরা দ্বারা জল বাহির হইতেছে, যেন পর্ব্বতের গাত্র ভেদ করিয়া উৎসবগুলি হইতে স্রোত নির্গত হইয়াছে। কেবল খড়ক বাসলার স্থাপত্য কৌশল দেখিবার জন্য একজন বাঙ্গালী ইঞ্জিনিয়ার এদেশে আসিয়াছিলেন। সিংহগড়ের পাদদেশে যাইয়া শকট ত্যাগ করত চেয়ারবাহিদের সাহায্যে শৈলে উঠিতে লাগিলাম। পর্ব্বতের উচ্চতা সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ৪১৬২ ফিট্। কিন্তু এখানে ভূমির উচ্চতা স্বভাবতঃ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৮২৫ ফিট্ হইবে, সুতরাং ২৩৩৭ ফিট্ ক্রোশ ঊর্দ্ধে যাইতে হইবে। পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইবার জন্য এখনও দুর্গের প্রাচীর রহিয়াছে। দুইটী তোরণের মধ্য দিয়া যাইয়া অবতরণ করা হইল। শিবাজীর সিংহগড়ে এক্ষণে ইংরাজের গ্রীষ্ম অপনোদন জন্য কয়েকখানি বাংলা পরিদৃশ্যমান হইতেছে। আমরা আহারীয় সমভিব্যাহারে লইয়া গিয়াছিলাম, প্রথমতঃ তাহার সৎকার্য্য করিবার জন্য এখানে "জিতাপানি" পাওয়া

যায় কিনা, জিজ্ঞাসা করিলাম। ঘাটিরা একটি কুণ্ডের নিকট লইয়া গেল। তাহার জল অত্যন্ত স্নিগ্ধ ও স্বচ্ছ। সেই "ঘাট মাথায়" প্রস্রবন জলে মৎস্য ফর ফর করিতেছে। দুই একটী প্রাচীন মন্দির দেখিলাম, তাহাতে বিগ্রহ নাই। রাম-রাজার (শিবজীর পৌত্র) মন্দির ভাল অবস্থায় আছে। ছত্রপতির পাদুকা (খড়ম) শিবলিঙ্গের নিকট রক্ষিত হইয়াছে। গ্রাণ্ট ডফ বখর পুস্তক হইতে এই স্থানের সংগ্রাম বৃত্তান্ত উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন, —"মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় নবমী তিথিতে (১৬৭০ খ্রী) রজনী সমাগত হইলে রায়গড় হইতে একদল মাওলী সৈন্য লইয়া তন্নাজী মালুশ্রে সিংহগড় লক্ষ্য করিয়া অভিযান করিলেন। সেনা দুইভাগে বিভক্ত করিয়া কিছু দূরে একদল রাখিয়া অপরগুলি পর্ব্বতের পাদ-মূলে স্থাপন করিলেন। যে ভাগ সর্ব্বাপেক্ষা বন্ধুর ও দুর্গম, সেদিকে হটাৎ প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা নাই বলিয়া একজন যোদ্ধা সেই দিক দিয়া অদ্রি শিখরে আরোহণ করিয়া রজ্জু নির্ম্মিত অধিরোহিণী বাঁধিয়া দিল। তদবলম্বনে একে একে সকলে উঠিয়া রজ্জু নিম্নে নিক্ষেপ করিল। দুর্গ মধ্যে তিনশত লোক প্রবেশ করিতে না করিতে তত্রত্য রক্ষিরাজপুত সৈন্য সন্ধান পাইল। একজন ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য অগ্রসর হইল, অমনি একটা শাণিত বান ধানুকীর হস্ত মুক্ত হইয়া নীরবে তাহার প্রশ্নের উত্তর দিল। অস্ত্র-নিঃস্বন ও কোলাহল শুনিয়া তন্নাজী তাহাদিগকে স্তম্ভিত করিবার জন্য আরও অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শব্দ লক্ষ্য করিয়া বান ত্যাগ করা হইতে লাগিল। শীঘ্রই মশালের আলোকে উভয় পক্ষই প্রকাশিত হইলেন। মরিয়া হইয়া যুদ্ধ চলিল। মাওলিরা সম্পূর্ণ সজ্জিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল, এজন্য সংখ্যায় অধিক বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তন্নাজী মালুশ্রে হত হইলেন। তাহাতে যোদ্ধৃবর্গ ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া রজ্জুময়ী অধিরোহিণীর দিকে ধাবমান হইলেন। এমন সময়ে তন্নাজীর ভ্রাতা সূর্য্যাজী সসৈন্য প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি ব্যাপার দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, "বীরগণ। তোমাদের মধ্যে কে আপন পিতার শব যাহার কর্ত্তৃক গর্ত্তে নিহিত হওয়া দেখিতে পারে।" * "সকলকে কহ অবতরণের সোপান বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে তাহারা যে শিবজীর প্রকৃত মাওলী সৈন্য, তাহা প্রমাণিত করিবার অবসর উপস্থিত।" এই উৎসাহ বাক্য, তন্নাজীর শোক, নূতন সেনার আগমন ও সেনা-নায়কের উপস্থিতি এই কয়েকটা কারণে তাহারা এমন স্থির-সংকল্প হইল যে; আর কিছুতেই নিবৃত্ত হইবার নহে। তাহাদের "হর হর মহাদেব" রবে আকাশ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অনতিবিলম্বে জয়লাভ হইল। দূরস্থ শিবাজীকে সে বার্ত্তা জানাইবার জন্য একখানি তৃণ-নির্ম্মিত গৃহে অগ্নি সংযোগ করিয়া

* মহারাষ্ট্রীয়েরা যুদ্ধে পতিত হইলে যদি সম্ভব হয়, তবে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য শব সঙ্গে লইয়া যায়। সেনাপতির মৃতদেহ ত্যাগ করিয়া যাওয়া অতি নীচতার কাজ বলিয়া গণ্য। বাপ শব্দ ভারতীয় সৈন্য মধ্যে সম্মান ও উৎসাহ প্রকাশার্থ ব্যবহৃত হয়। ইংরাজ সেনাপতি যুদ্ধকালে "চলো মেরা বাপ' বলিয়া দেশীয় সিপাহিগণকে আহ্বান করেন। ইংরাজীতে Come on my boys বাক্য ব্যবহৃত হয়।

সঙ্কেত করা হইল। মাওলীদের হতাহতের সংখ্যা তিনশত। সূর্য্য উদয় হইলে দেখা গেল, পাঁচ শত রাজপুত তাহাদের অধ্যক্ষ উদয় নামা যোদ্ধের সহিত নিহত হইয়া বীর শয্যায় শয়ান রহিয়াছে। কয়েকজন মাত্র ধৃত হইয়া আত্ম সমর্পণ করিল। অনন্যোপায় শত শত লোক পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিতে যাইয়া পঞ্চত্ব লাভ করিয়াছিল। শিবাজী কহিয়াছিলেন, আমার আর কি লাভ হইল, তন্নাজী মালুশ্রে মরিয়াছেন। সিংহ হত হইয়াছে আমাকে কেবল তাহার গহ্বর অধিকার করিতে হইল।

জিজুরি জনপদ পুনা হইতে ১৪ চৌদ্দ ক্রোশ। যাতায়াতের ফিটন ভাড়া ১০৲ দশ টাকা। প্রত্যূষে ছাড়িয়া ১১ টা রাত্রে বাটী আনিয়া দিবে কহিল। ডেক্যানি অশ্বের পরাক্রম অদ্ভুত। পথ দূর হইতে দেখিলে তাহার তরঙ্গায়িত আকার দৃষ্ট হয়। অনেক স্থানে পার্ব্বত্য সরিৎ পথের উপর দিয়া পথ করিয়াছে। সকল কথা বক্তব্য না হইলেও যাহাতে অতিশয় আরাম লাভ করা গিয়াছে, তাহা উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। সেই পাষাণময়ী ভূমির উচ্ছ্বাসময়ী ক্ষুদ্র তরঙ্গিনী তটে প্রাতঃকৃত্য করিয়া মন বড় প্রীত হইল। মধ্যাহ্নকালে "পার্ব্বতীর" ন্যায় শৈলোপরি খণ্ডবার দেবালয় পরিদৃশ্যমান হইল। তীর্থস্থানে পাণ্ডার অভাব হয় না। আমরা তাহাদের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে সোপান শ্রেণী অধিরোহণ করিতে লাগিলাম। ভক্তগণ মানসিক পূর্ণ হওয়ায় দেব উদ্দেশে পর্ব্বতের নানা স্থানে সোপান, তোরণ ও দীপদান নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। খণ্ডবা মহারাষ্ট্রীয়দের কুলস্বামী অর্থাৎ গ্রাম্যদেবতা। ইনি শিবের অবতার বিশেষ। খণ্ডেরাও ঠাকুরের মন্দির হোলকর কর্তৃক নির্ম্মিত। সেবার নিয়ম রাজোচিত ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সোমবতী অমাবশ্যায় সাসওয়াড় গ্রামের নিকট করানদীতটে মেলা হইয়া থাকে। খণ্ডবার সওয়ারি সে সময় তথায় উপস্থিত হয়। মন্দিরের বাহিরে খণ্ডবার মহা অসি রক্ষিত আছে। তাহা কোষ নিষ্কাসিত করিয়া রক্ষি কহিল, ইহা দ্বারা মহাদেব দানব সংহার করিয়াছিলেন। আমি কহিলাম, অসুর বধের জন্য কি তাঁহাকে শস্ত্রের সহায্য লইতে হয়?

এই খণ্ডোর সহিত মুরলিগণের বিবাহ হইয়া থাকে। হরিদ্রা প্রদান করিয়া কার্য্য সম্পূর্ণ করা হয়। কুনাবি প্রভৃতি অশিক্ষিত জাতির সন্তান না হইলে মানিয়া থাকে, আমার সন্তান হইলে প্রথমটি খণ্ডবাকে দান করিব। মনস্কামনা সিদ্ধ হইলে কন্যাটী আনিয়া মহাদেবের সহিত বিবাহ দেওয়াইয়া তাহার গলদেশে তাগা বাঁধিয়া বাটী লইয়া যায়। তাহার আর অপর পুরুষের সহিত বিবাহ হইবার সম্ভাবনা নাই। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে দেবতার সেবার জন্য পিতা মাতা তাহাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দেয়। পুত্র সন্তানও দেবতাকে দান করিয়া বিদায় করিয়া থাকে। ঐরূপ স্ত্রীর নাম মুরলী ও পুরুষের নাম বঘা অথবা বাঘিয়া। জিজুরিতে অনুমান ১৫০ মুরলী আছে। অনেকে ভিক্ষা করিবার জন্য স্থানান্তরিত হইয়া থাকে। ব্যভিচার তাহাদিগকে অবশ্যই করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন নৃত্য গীতের ব্যবসায় করে। অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, এখন আর কেহ মুরলী ছাড়ে না।

সংবাদদাতা কহিল, তাহার জ্ঞানে বার বৎসর হইল শেষ একজনকে মুরলী করিতে দেখিয়াছে। অপ্রত্যক্ষ-মূলক অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া মানুষ যে কত ভ্রান্তিজালে জড়িত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। মানুষ কেহ কল্পনা-প্রধান, কেহ বা সন্দেহ-প্রধান। এজন্য, অতি বিদ্বান লোকও কুসংস্কারাপন্ন হয়। প্রথম হইতে যাহা বিশ্বাস হইয়া গিয়াছে, তাহার বিপরীত ভাবনা গ্রহণ করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

সাসওয়াড় গ্রামের মধ্যদিয়া পথ, একারণ উক্ত গ্রাম দর্শন করণার্থ গাড়ী হইতে অবতরণ করা হইল। এদেশে দেখিতেছি, গ্রাম ও নগর একই ভাবে গঠিত। সহরে খোলার ঘর, গ্রামেও তাই। গ্রামে ভূমি সুলভ, কিন্তু বাটীগুলি সহরের মত একস্থানে সন্নিবেশিত। পথ সঙ্কীর্ণ। গৃহস্থের ফল মূলের বৃক্ষ নাই। সুতরাং গ্রাম শোভা রহিত। পেশয়াদের পারিবারিক বাটী এই গ্রামে। এখানে অবস্থান কালে পেশয়া পুরন্দরের দুর্গ উপহার পান। ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যলক্ষ্মী তাঁহার করায়ত্ব হন। অদ্যাপি তাঁহার সেই বাটী ধরাশায়ী হয় নাই। পুনায় পেশয়ার স্মৃতিচিহ্ন সমুদায় অগ্নিকর্ত্তৃক লোপ পাইয়াছে। যাহা হউক, আমি এখানে আসায় কিঞ্চিৎ দেখিতে পাইলাম। বাটীর প্রাচীর প্রস্তর গ্রথিত। লক্ষ্নৌনগরে দেশীয়দের দৌরাত্ম-চিহ্ন চিরস্মরণীয় করিবার জন্য ভগ্ন বাটী রক্ষা করা হইতেছে দেখিয়া আসিয়াছি। আর এখানে পেশয়ার-প্রাসাদে ইংরাজের গুলি গোলার চিহ্ন দেখিলাম। সিংহদ্বারের কবাট তীক্ষ্ণশির কিলক জালে আচ্ছন্ন। প্রদর্শক কহিল, শত্রুপক্ষীয় হস্তিতে যেন ভগ্ন করিতে না পারে, একারণ এরূপ কীলক দেওয়া হইয়াছে। তখন বেলা নাই, তথাপি বাটীর মধ্যে যাইয়া উপরে উঠিলাম। সেই বাটীতে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত দেখিয়া সেই সঙ্গে পেশয়ার পরাক্রম অস্তমিত হওয়ার ভাব মনে উঠিল। তথায় জন মাত্র নাই, পেশয়ার কুলেও কেহ নাই। বাটী চারি মহল। দ্বিতল। মেরামত শূন্য। সময় হইয়াছে, ভাঙ্গিয়া পড়িলেই হইল। মানুষের শক্তি কি ক্ষণভঙ্গুর! হে কাল, তুমিই বলবত্তর!

শ্রীদুর্গাচরণ ভুক্তি।

কোথায় যাই?

আর ত পারিনা আমি নিতে!
করুণার মমতার, এত বোঝা—এত ভার,
আর আমি পারি না বহিতে!
এত দয়া অনুগ্রহ, কেমনে সহিব কহ,
আর না কুলায় শকতিতে!
হৃদয় গিয়েছে ভ'রে, নয়নে উছ'লে পড়ে,
ধরেনা ধরেনা অঞ্জলিতে!
ভাসিয়া যেতেছি হায়, করুণায় মমতায়,
অলস অবশ সাঁতারিতে!

১

আমারে দিওনা কেহ, আর এ মমতা স্নেহ,
আর অশ্রু পারি না মুছিতে!
এত স্নেহ, মমতায়, কত যে যাতনা হায়,
যে না পায়,—পারে না বুঝিতে!

জীবনে করেছি শিক্ষা, শুধু ভিক্ষা শুধু ভিক্ষা
একটু শিখিনি কারে দিতে!
কত ভর্ৎসি দিব যেয়ে, দিতে চেয়ে বসি চেয়ে
সেত গো জানেনা ফিরাইতে!

২

সে জানে না কণা বিন্দু, সে দেয় ঢালিয়া সিন্ধু
ছোট বুকে পারি না রাখিতে!
আরো বলে দিবে কত, জন্ম জন্ম অবিরত,
রয়েছে অনন্ত আরো দিতে!

শুনিয়া লেগেছে ত্রাস, সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ!
এত দিলে পারি কি বাঁচিতে?
চাহি না তাহার প্রেম, হোক হীরা, হোক হেম,
হউক অমৃত পৃথিবীতে!
কিন্তু গো তুমিও যদি, ভালবাস নিরবধি,
তবেই ত হইবে ঠেকিতে।
সত আছে দেবভূমি, জগৎ যুড়িয়া তুমি,
কোথা আমি যা'ব পলাইতে?

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাস।

বঙ্কিমচন্দ্র ও ব্রাহ্মধর্ম্ম। (৩)

ভক্তি।

ভক্তি সম্বন্ধীয় উপদেশে বঙ্কিম বাবুর ঘনীভূত ধর্ম্ম চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব্ব দুই প্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছি সাধারণতঃ বঙ্কিম বাবুর ধর্ম্মমত ও ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা প্রচারিত ধর্ম্মমত একই রূপ। কিন্তু ভক্তি তত্ত্ব সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবু যে সকল অমূল্য কথা বলিয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজে তাহার অতি অস্ফুট ব্যাখ্যা মাত্র শুনিয়াছি। এই তত্ত্ব ব্যাখ্যায়, তাঁহার প্রগাঢ় ধর্ম্মানুরাগ, সূক্ষ্ম দর্শন, গভীর চিন্তা ও গবেষণার উজ্জ্বল পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ভক্তিতত্ত্বের এমন বিশদ ব্যাখ্যা আর কোথাও শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

ভক্তিকে তিনি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন,—মনুষ্যে ভক্তি ও ঈশ্বরে ভক্তি। তিনি বলেন, মনুষ্যে ভক্তি তিন শ্রেণীর লোকের প্রতি অনুশীলনীয়, (১) গৃহস্থিত গুরুজন, (২) রাজা, (৩) সমাজশিক্ষক। এতদ্ভিন্ন ধার্ম্মিক, রাজকর্ম্মচারী, বয়োজ্যেষ্ঠ বা গুণী ব্যক্তি ও সমাজ, এ সকলকেও ভক্তি করা উচিত। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশ একরূপ ভক্তিহীন হইয়াছে, বলিতে হইবে; এমন কি, পিতা মাতার প্রতিও এমন লোকের ভক্তি নাই। এই সময়ে এই পুস্তক দ্বারা দেশের প্রভূত উপকার হইবে। বঙ্কিম বাবু অযথা ভক্তি প্রয়োগের খর বিরোধী। ব্রাহ্মণজাতির ন্যায় প্রতিভাশালী, জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক জাতি পৃথিবীর মধ্যে দুর্লভ। পরহিতে এই জাতির জীবন উৎসর্গ হইয়াছিল। কিন্তু এখন যে দিন আর নাই। শিষ্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "এখন দেখি ত ব্রাহ্মণেরা লুচিও ভাজেন, রুটীও বেচেন, কালী পাড়া করিয়া কসাইয়ের ব্যবসাও চালান। তাঁহাদিগকে ভক্তি করিতে হইবে?'

"গুরু বলেন।—কদাপি না। যে গুণের জন্য ভক্তি করিব, সে গুণ যাহার নাই, তাহাকে ভক্তি করিব কেন? সেখানে ভক্তি অধর্ম্ম। এইটুকু না বুঝাই, ভারতবর্ষের অবনতির একটি গুরুতর কারণ। যে গুণে ব্রাহ্মণ ভক্তির পাত্র ছিলেন, সে

গুণ যখন গেল, তখন আর ত্র
ভক্তি করিতে লাগিলাম?
ব্রাহ্মণের বশীভূত রহিলাম? ২
কুশিক্ষা হইতে লাগিল, কুপথে যাইতে লাগিলাম। এখন ফিরিতে হইবে।” এই কথায়, বঙ্কিম বাবু যে অযথা ভক্তি প্রয়োগের বিরোধী, তাহা উত্তম রূপ বুঝা যাইতেছে। এই সুখ শোভা এই স্ত্রী পুত্র কন্যা, ও ভাই বন্ধুপূর্ণ সংসার এব বিদ্যালয় বিশেষ। এখানকার নরনারী ক্তির চক্ষে না দেখিতে পারে, ভগবানকে ভক্তি করিতে পারে না। যথা ভক্তি প্রয়োগ নীতি-বিরুদ্ধ কথা উপযুক্ত পাত্রে ভক্তি অর্পিত না মনুষ্যত্ব বিনষ্ট হইয়া যায়। এখন ...কে গুরু জনকে অবহেলা করে, রাজাকে ভয় করে, ভক্তি করে না, সমাজ শিক্ষককে তুচ্ছ জ্ঞান করে। বঙ্কিম বাবু দেশের অবস্থা এই রূপ চিত্র করিয়াছেন—“ভক্তি, যাহা মনুষ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি, তাহা হীনতার চিহ্ন বলিয়া তাহাদের বোধ হইয়াছে। পিতা এখন “My dear Father”—অথবা বুড়ো বেটা। মাতা, বাপের পরিবার। বড় ভাই, জ্ঞাতি মাত্র। শিক্ষক, মাষ্টার বেটা। পুরোহিত, চাল কলা লোলুপ ভণ্ড। যে স্বামী দেবতা ছিলেন,—তিনি এখন কেবল প্রিয় বন্ধু মাত্র—কেহবা ভৃত্যও মনে করেন। স্ত্রীকে আর আমরা লক্ষ্মী-স্বরূপা মনে করিতে পারি না, কেননা, লক্ষ্মীই আর মানি না। এই গেল গৃহের ভিতর। গৃহের বাহিরে অনেকে রাজাকে শত্রু মনে করিয়া থাকেন। রাজ-পুরুষ, অত্যাচারকারী রাক্ষস। সমাজ-শিক্ষকেরা,

আমাদের সমালোচনাশক্তির পরিচয় দিবার স্থল—গালি ও বিদ্রূপের স্থান। ধার্ম্মিক বা জ্ঞানী বলিয়া কাহাকেও মানি না। যদি মানি, তবে ধার্ম্মিককে “গো বেচারা” বলিয়া দয়া করি—জ্ঞানীকে শিক্ষা দিবার জন্য ব্যস্ত হই।” ইত্যাদি ইত্যাদি। দেশের এই শোচনীয় অবস্থা যতদিন, ততদিন এ দেশের মঙ্গল নাই। কেহ কেহ বলেন, ইহা স্বাধীনতার লক্ষণ। যে স্বাধীনতায় পূজ্য ব্যক্তিকে সম্মান করিতে নিষেধ করে, সে স্বাধীনতা যত শীঘ্র কর্ম্মনাশার জলে প্রক্ষিপ্ত হয়, ততই মঙ্গল। গুণী ও মহৎ লোককে পূজা করিতে না শিখিলে কখনও কোন জাতি মহৎ হয় না। মহাপুরুষের আদর্শ যে দেশে নাই, সে দেশ ঘোরতর স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বার্থপরতায় নিমগ্ন। ইংলণ্ড বড় কিসে, যদি কেহ উত্তরে জিজ্ঞাসা করেন, এক কথায় এই বলিতে পারি, মহৎ লোকের ভক্তি ও পূজাতে ইংলণ্ড বড়। ঈশ্বরকে আদর্শ করিয়া সব সময়ে মানুষ জীবন পথে অগ্রসর হইতে পারে না, এই জন্য মহাপুরুষের সৃষ্টি। মহাপুরুষদিগের পদানুসরণ না করিলে, সাধারণ মানুষ, কি নীতিতে, কি ধর্ম্মে, মহত্ত্ব লাভ করিয়া কখনও বড় হইতে পারে না। খ্রীষ্ট বা মহাম্মদ, চৈতন্য বা বুদ্ধ, কবীর বা নানক, হাওয়ার্ড বা ম্যাটসিনি,—ইঁহাদের জীবনের উচ্চ আদর্শ যদি পৃথিবীর সম্মুখে না থাকিত, তবে পৃথিবী কখনও এত উন্নত হইতে পারিত না। ইঁহাদের জীবন-ছায়া সমাজে, ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিফলিত হইয়া কত মানুষকে দেবত্বে লইয়া যাইতেছে। আমাদের দেশ এখন স্বাধীনতা চায়,—তাই

নাকি আপন আপন মহত্ত্ব লইয়াই ব্যতিব্যস্ত। যে ইংলণ্ডের স্বাধীনতার ধুয়া এ দেশকে এই হীনাবস্থায় উপস্থিত করিতেছে, সেই ইংলণ্ডের লোকেরা বড় লোককে কিরূপ সম্মান করে, ভাবিলে অবাক হইতে হয়। 'আমি গ্লাডোষ্টোন সাহেবের দলভুক্ত' এই কথা বলিতেও লোকেরা গৌরব মনে করে। ডার্বিতে গ্লাডোষ্টোন সাহেবের অশীতি জন্মোৎসব উপলক্ষে ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী-সমাজের অন্যতর সভ্য মহাত্মা সার ডবলিউ হারকোর্ট সাহেব গৌরবের সহিত বলিয়াছিলেন :—

"That is the man and that is the spirit in which we are led; that is the man, and that is the spirit in which we will follow him to the end. Whilst life remains with him we will follow in his steps, and when he is no more we will endeavour to follow his example."

'যতদিন তিনি জীবিত আছেন, ততদিন তাঁহার পদানুসরণ করিব; এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার আদর্শ ধরিয়া চলিতে চেষ্টা করিব।" মহাত্মা হারকোর্টের ন্যায় একজন স্বনামখ্যাত ব্যক্তিও গ্লাডোষ্টোন সাহেবকে তত মান্য করেন! বিলাতে এই রূপ যে কত দৃষ্টান্ত আছে, তাহার শেষ নাই। বিলাত স্বাধীন, না ভারত স্বাধীন?

মহাত্মা কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজ মহতের পূজা প্রতিষ্ঠিত করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা পাইয়াছিল। কিন্তু নব সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ মহাপুরুষের বিরোধী, অথবা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার লীলাস্থল। কেশবচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া, সাধারণ সমাজের অধিকাংশ সভ্য, ঘৃণার চক্ষে না দেখেন, এখন মহাপুরুষ দেশের বড় লোকেরা সকলেই। কলেজের ছাত্রগণও প্রপিতামহ শ্রাদ্ধের পিণ্ড সমালোচনার খরতর স্রোতে অকুতোভয়ে ভাসাইয়া দিয়া বাহাদুরি দেখাইতেছেন! "আমি ভিন্ন আর কেহ বড় নাই, আর সকলই মূর্খ," এই কথাই যেন এখন সকলের প্রাণগত ভাব। বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, মানুষকে ভক্তির চক্ষে দেখা, রণের ব্রত নয়; ঘৃণা করাই যেন প্রম নামক যে একটা অতি পূজা জিন র কথা এ জগতে শুনা গিয়াছে, তা দিন দিন সমাজে দুর্লভ হ উঠিতেছে। বঙ্কিম বাবু এ দেশের নতার যে ছবি আঁকিয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজের ছবিও ঠিক তাহার অনুরূপ। দেশের আশা কোথায়, কে বলিতে পারে?

মানুষকে বাইবেলে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব বলা হইয়াছে। একথা সকলে অভ্রান্ত রূপে বিশ্বাস নাও করিতে পারেন, কিন্তু মানুষ যে ঈশ্বরের হাতের জিনিস, ইহাতে আর সন্দেহ কি? ঈশ্বরের হাতের জিনিসকে ভক্তি না করিয়া, ভাল না বাসিয়া যে ঈশ্বরকে ভক্তি করিতে ও ভালবাসিতে ধাবিত হয়, তাঁহার সে কামনা যে কখনও পূর্ণ হইবে না, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। মানুষ সাকারকে ভক্তি করিতে পারিল না, নিরাকারকে ভক্তি করিবে?—ইহা আকাশ-কুসুমের ন্যায় কল্পনার ভেল্কি মাত্র।

ঈশ্বরে ভক্তি সম্বন্ধে সংক্ষেপে বঙ্কিম বাবু এই উপদেশ দিয়াছেন—"যখন মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী বা

ঈশ্বরানুবর্ত্তিনী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি।" সংক্ষেপে ইহাপেক্ষা ভক্তির আর উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা হইতে পারে না। মানুষের সকল বৃত্তির অনুশীলনই যে ভক্তির অন্তর্গত, ইহা অতি পরিষ্কার রূপে বঙ্কিম বাবু বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছেন। বৈদিক ধর্ম্মে যে ভক্তি নাই, একথা বুঝাইয়া ছান্দোগ্য উপনিষদ হইতে একটী বচন উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, উপনিষদে একটু মাত্র ভক্তির আভাষ পাওয়া যায়। ভক্তিমার্গের শাণ্ডিল্য কি শ্রীকৃষ্ণ, এ বিষয় [illegible] মীমাংসা করিতে পারেন নাই। গীতা হইতে তিনি ভক্তি-যোগ সুন্দর [illegible] ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গীতা, জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির সামঞ্জস্যের উজ্জ্বল গ্রন্থ। গীতা, যুদ্ধ শাস্ত্রের নীতি, ধর্ম্মনীতি নহে, এ সম্বন্ধে প্রচলিত যে একটা কুসংস্কারপূর্ণ মত আছে, সেটাকে খণ্ডন করিয়া বঙ্কিম বাবু কর্ম্ম ও জ্ঞান যোগ বুঝাইয়াছেন। ভক্তির প্রথম সোপান নিষ্কাম কর্ম্ম সম্বন্ধে গীতার উপদেশ অতি উদার, অতি উচ্চ।

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্ম ফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি।"২।৭

অর্থাৎ, "তোমার কর্ম্মেই অধিকার, কদাচ কর্ম্মফলে যেন না হয়। কর্ম্মের ফলার্থী হইও না; কর্ম্ম ত্যাগেও প্রবৃত্তি না হউক।"

"অর্থাৎ, কর্ম্ম করিতে আপনাকে বাধ্য মনে করিবে, কিন্তু তাহার কোন ফলের আকাঙ্খা করিবে না।

এ সম্বন্ধে গীতার পর চরণে উক্ত হইয়াছে—

"যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।"

"কর্ম্ম করিবে, কিন্তু কর্ম্ম সিদ্ধ হউক, অসিদ্ধ হউক, সমান জ্ঞান করিবে। তোমার যতদূর কর্ত্তব্য, তাহা তুমি করিবে। তাতে তোমার কর্ম্ম সিদ্ধ হয় আর নাই হয়, তুল্য জ্ঞান করিবে। এই যে সিদ্ধাসিদ্ধিকে সমান জ্ঞান করা, ইহাকে ভগবান যোগ বলিতেছেন। এই রূপ যোগস্থ হইয়া, কর্ম্মে আসক্তি শূন্য হইয়া কর্ম্মের যে অনুষ্ঠান করা, তাহাই নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান।"

কি উদার মত। কোন্ কর্ম্ম সৎ, কোন্ কর্ম্ম অসৎ, এ প্রশ্ন সততই মনে উঠিতে পারে। এ সম্বন্ধে গীতায় উক্ত আছে—

"ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশী নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ।

অর্থাৎ বিবেক বুদ্ধিতে কর্ম্ম সকল আমাতে অর্পণ করিয়া নিষ্কাম হইয়া এবং মমতা ও বিকার শূন্য হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। অর্থাৎ সিদ্ধি অসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করিবে। কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিবে, অর্থাৎ কর্ম্ম তাঁহার, আমি তাঁহার ভৃত্য স্বরূপ কর্ম্ম করিতেছি, এইরূপ বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিবে। ইহা করিতে গেলে কার্য্যকারিণী ও শারীরিকী বৃত্তি সকলকেই ঈশ্বরমুখী করিতে হইবে; অতএব কর্ম্মযোগই ভক্তিযোগ।"

সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস, ভক্তি যোগ সাধন করিতে হইলে কর্ম্মযোগ পরিহার করিতে হয়, গীতাতে এভ্রমের নিরসন হইয়াছে। কর্ম্ম ভিন্ন যে ভক্তি—সে অলস লোকের কল্পনা-মিশ্রিত ভাব মাত্র।

ভক্তির দ্বিতীয় সোপান জ্ঞান। জ্ঞান ভিন্ন আপন ও ঈশ্বরের তত্ত্বে মানুষের বোধ জন্মে না। আমাকে জানা ও ঈশ্বরকে জানা—ভক্তি সাধনের জন্য, এদুইই প্রয়োজন। জানিতে হইবে—আমি সসীম,

ক্ষুদ্র,শক্তিহীন,পাপী, নরাধম,—আমি যাহা তাহাই, আর তিনি অসীম, মহান, শক্তিশালী, পুণ্যময়, জগদীশ্বর। এই জ্ঞান জন্মিলে তবে তাঁহাকে ও তাঁহার প্রিয় জগৎকে ভক্তি করিতে আমার প্রবৃত্তি জন্মিবে। এ সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবু বলিতেছেন, "জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি সকলের সম্যক স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি হওয়া চাই। * * পাণ্ডিত্য জ্ঞান নহে। যে ঈশ্বর বুঝিয়াছে,যে ঈশ্বরে জগতে যে সম্বন্ধ তাহা বুঝিয়াছে, সে কেবল পণ্ডিত নহে, সে জ্ঞানী। পণ্ডিত না হইলেও সে জ্ঞানী।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন ;–

"বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ
বহবো জ্ঞান তপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ। ৪।১০

অর্থাৎ যাহারা চিত্তসংযত ও ঈশ্বরপরায়ণ, তাহারাই জ্ঞানের দ্বারা পূত হইয়া তাঁহাকে পায়। আসল কথা, কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্মের এমন মর্ম্ম নহে যে, কেবল জ্ঞানের দ্বারাই সাধন সম্পূর্ণ হয়। জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ের সংযোগ চাই। কেবল কর্ম্মে হইবে না, কেবল জ্ঞানেও নহে। কর্ম্মেই আবার জ্ঞানের সাধন। কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়।"

ভক্তির প্রথম সোপান কর্ম্ম, দ্বিতীয় সোপান জ্ঞান। এই দুইয়ের সংযোগ চাই। এ সম্বন্ধে গীতাতে উক্ত হইয়াছে ;—

"যোগসংন্যস্ত কর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্ন সংশয়ং
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ।৪।৩৮-৪১

"হে ধনঞ্জয়! কর্ম্মযোগের দ্বারা যে ব্যক্তি সংন্যস্তকর্ম্ম এবং জ্ঞানের দ্বারা যার সংশয় ছিন্ন হইয়াছে, সেই আত্মবানকে কর্ম্ম সকল বদ্ধ করিতে পারে না।"

"তবেই চাই, (১) কর্ম্মের সংন্যাস বা ঈশ্বরার্পণ এবং (২) জ্ঞানের দ্বারা সংশয়চ্ছেদন। এই রূপে কর্ম্মবাদের ও জ্ঞানবাদের বিবাদ মিটিল। ধর্ম্ম সম্পূর্ণ হইল।",

সন্ন্যাস ধর্ম্ম তবে কি অবহেলার জিনিস? যাঁহারা উপরোক্ত কথাগুলি ভালরূপ [illegible] করিয়া দেখিবেন, তাঁহারাই [illegible]বিবেন যে, "নিষ্কাম কর্ম্মই সন্ন্যাস [illegible]সে আর বেশী কিছুই নাই। বেশীর [illegible] আছে, নিষ্প্রয়োজনীয় দুঃখ। গীতায় উক্ত হইয়াছে,–"যাঁহার দ্বেষ নাই ও আকাঙ্ক্ষা নাই, তাঁহাকেই নিত্য সন্ন্যাসী বলিয়া জানিও। * * কর্ম্মহীন সন্ন্যাস, নিকৃষ্ট সন্ন্যাস। কর্ম্ম, বুঝাইয়াছি ভক্ত্যাত্মক। অতএব গীতোক্ত সন্ন্যাসবাদের তাৎপর্য্য এই যে, ভক্ত্যাত্মক কর্ম্মযুক্ত সন্ন্যাসই যথার্থ সন্ন্যাস।"

অনেকের এ রূপ ধারণা আছে যে, অরণ্যে না গেলে প্রকৃত ভক্ত সাধন হয় না। ব্রাহ্মসমাজ একাল পর্য্যন্ত উপদেশ ও দৃষ্টান্তে এ কথার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া আসিয়াছেন। প্রকৃত বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস, আত্মার একটা অবস্থা মাত্র; বাহিরের গৈরিক ভেকে বা শারীরিক কৃচ্ছ্র সাধনে তাহার উৎকর্ষ সাধিত হয় না। ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব না বুঝিয়া বহুলোক বৃথা হুজুগ ধরিয়া মরে।

বঙ্কিম বাবুর ভক্তি সম্বন্ধীয় অন্যান্য কথা বারান্তরে আলোচনা করিব।

হরিমোহন মাইতির দণ্ড ও সমাজ। *

হরিমোহন মাইতির বিরুদ্ধে জুরি একমত হইয়া "দোষী" অভিমত দেওয়াতে বিচারপতি উইলসন তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত এক বৎসর মেয়াদ দিয়াছেন। তাহার বিরুদ্ধে "জানিয়া অসমসাহসী কার্য্য-দ্বারা প্রাণিহত্যা; ঐ প্রকারে গুরুতর পীড়া এবং সামান্য পীড়ার" অভিযোগ হয়। বিচারপতি উইলসন জুরিকে মকদ্দমার অবস্থা বর্ণনার সময়ে বলেন, হিন্দুশাস্ত্র, ব্যবহার, কি পূর্ব্বতন মুসলমান আইনানুসারে বিচার হইতেছে না। দণ্ডবিধি অনুসারে প্রত্যর্থীর পরীক্ষা করিতে হইবে। ফুলমণি মরিয়া যাউক অথবা তাহার মরিবার সম্ভাবনা ছিল, হরিমোহন ইহা ভাবিয়া কার্য্য করে নাই। তাহার গুরুতর অনিষ্ট হইবে, ইহাও আসামী ভাবে নাই। অতএব প্রথম ও দ্বিতীয় চার্জে সে দোষী হইতে পারে না। কিন্তু অপ্রস্ফুটিত বালিকাটীর কষ্ট হইবে, তাহা ৩৫ বৎসর বয়স্ক এক ব্যক্তির জানা উচিত ছিল। তন্নিমিত্ত জুরি এক বাক্যে তাহাকে শেষ চার্জে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন। ইহার চরম দণ্ড এক বৎসর; বিচারপতি তাহাই দিয়াছেন। বস্তুতঃ ডাক্তার যে জবানবন্দি দিয়াছেন, তাহাতে জুরির উপায়ান্তর ছিল না। তবে একটী বিষয় প্রকাশিত হইয়াছিল। পুলিশ সার্জ্জন ডাক্তার কব বলিয়াছেন যে, ইতিপূর্ব্বে ফুলমণি পুরুষের সহবাস করিয়াছিল, তাহার লক্ষণ তিনি দেখিয়াছিলেন। বালিকার মাতা বলিয়াছেন যে, কৈবর্ত্তজাতির বালিকাদিগকে যৌবনের পূর্ব্বে স্বামীর শয়ন গৃহে পাঠাইবার রীতি নাই। বালিকাটী গ্রীষ্ম নিবন্ধন বারাণ্ডায় তাহার আর দুইটী ভগিনীর সহিত শয়ন করিয়াছিল। রাত্রি দুই প্রহরের সময় চীৎকার শুনিয়া তিনি দেখিলেন, ফুলমণি স্বামীর বিছানায় রক্তে ভাসিতেছে। সে ছটফট করিতেছিল; কথার মধ্যে কেবল এক ঘটি জল চাহিয়াছিল। হরিমোহন নিজের সমর্থনে বলিয়াছে যে, সে একাকী শুইয়াছিল, খানিক রাত্রে দেখিল, তাহার স্ত্রী তাহার তক্তপোষে আসিয়া চীৎকার করিতেছে। আসামী এ পর্য্যন্ত বলিলে পর দোষ স্বীকারের অল্পই বাকী রহিল। অন্য পুরুষের দ্বারা অহিত হইয়া তাহার শয্যায় আসা অসম্ভব কথা। অবশ্যই কেবল এদেশে নহে, পৃথিবীর সকল দেশে এক শ্রেণীর স্ত্রীলোক আছে, ইহারা অল্প বয়সে, ৬।৭ বৎসরেও খারাপ হয়। কিন্তু ফুলমণি সম্বন্ধে এই অনুভব করিবার কারণ নাই। পূর্ব্বে সহবাস হইলেও এবার ভয়ানক ফল হইবে না, তাহার কোন কারণ নাই।

হরিমোহন মাইতির কারাবাস নিবন্ধন

---

* এই প্রবন্ধটী আমরা "সহচর" হইতে উদ্ধৃত করিলাম। অল্প কথায়, এ সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা সুন্দর মন্তব্য হইতে পারে না। আমরা সানুনয়ে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করি, এই রূপ কলঙ্কের একটা প্রতিবিধান করুন। ন, স।

কাহারও কষ্ট হইবে না। এপ্রকার লোকের শাস্তি পাওয়াই উচিত। পশুদিগের কাল জ্ঞান আছে। এ প্রকার মকদ্দমা শীঘ্র আদালতে আইসে নাই। দণ্ড বিধির পূর্ব্বে পূর্ব্বতন নিজাম আদালতের রিপোর্টে এপ্রকার মকদ্দমা দেখা যায়। তথাপি প্রশ্ন এই উঠিতে পারে ফুলমণি যাহাতে মরিল,সে ঘটনা কি ঘটে না? আমাদিগের আশঙ্কা হইতেছে, এ প্রকার ঘটনা ঘটিলে কেহ তাহা প্রকাশ করে না। মৃত্যু কম হয়; কিন্তু অকালে স্বামী গৃহে গমন নিবন্ধন যে অনিষ্টের সম্ভাবনা যে রহিয়াছে, ইহা অস্বীকার করা বৃথা। সকল শ্রেণীর বালিকাগণকে অকালে স্বামীর শয্যায় যাইতে হয়। অধিকাংশ বালিকা অনিচ্ছা প্রকাশ করে, কিন্তু বাটীর অন্য স্ত্রীলোকগণের উপদেশ,—তাড়না নিবন্ধন বালিকাকে সম্মত হইতে হয়। সত্য গোপন করা উচিত নহে। এটী আমাদিগের সামাজিক প্রথা দাঁড়াইযাছে। অবশ্যই হিন্দু শাস্ত্রে পৃথক ব্যবস্থা আছে। কিন্তু শাস্ত্র এক্ষণে খিচুড়ি হইযাছেন। "মেয়েলী মত" জিনিসটী কি? তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু অনিষ্ট নিবারণের কাল উপনীত হইয়াছে।

আমরা আশা করিতেছিলাম,জুরি আইন পরিবর্ত্তের কারণ বিচারপতিকে সম্বোধন করিবেন। তাহারা তাহা করেন নাই। ক্ষতি নাই, কারণ সর্ব্বসাধারণ জুরিস্বরূপ গবর্ণমেণ্টকে বলিতেছেন যে, সম্মতির বয়স বৃদ্ধি করা উচিত। আমরা পূর্ব্বে বলিযাছি, পুনর্ব্বার বলিতেছি, দ্বাদশ বৎসরে ফল হইবে না। এই বালিকাটীর দ্বাদশ বৎসরের কযেক মাস মাত্র বাকী ছিল। দশ ও বারর মধ্যে প্রভেদ এই, বার বৎসরে বিপদের সম্ভাবনা কিঞ্চিৎ,—কিঞ্চিৎমাত্র কমে। কিন্তু সে কোথায়? স্বামীর বয়স ১৭।১৮ বৎসর হইলে। কার্য্যতঃ এই দুই বয়সের প্রভেদ নাই। যথার্থ যৌবন চতুর্দ্দশ বৎসরের পূর্ব্বে আরম্ভ হয় না। অতএব যদি যথার্থ কাজ করা ব্যবস্থাপক সভার ইচ্ছা থাকে, তবে সম্মতির বয়েসের ঐ সীমা করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট সমাজের উপরে হস্তক্ষেপণ করিতেছেন। তথাপি পরম্পরা সম্বন্ধে বাল্য-বিবাহ কু প্রথার মূলে আঘাত লাগিবে। লাগাও উচিত। আমাদিগের স্ত্রীলোকদিগের স্বাস্থ্য অবহেলার জিনিস নহে, কারণ ইহার উপর জাতীয় স্বাস্থ্য নির্ভর করিতেছে। বাঙ্গালিদিগকে কতকাংশে প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। সহচর।

উৎকল-ভ্রমণ।

(পুরীর বাহ্যিক অবস্থা।)

এক মতে, আঠার নালা (যাহাতে ১৯টী খিলান বিদ্যমান) মহারাষ্ট্রীয়দের পূর্ব্বে,(১০৩৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) মৎস্য কেশরী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। পুরীর নীচ দিয়া ভার্গবী নদী প্রবাহিত হইয়া চিল্কা অভিমুখে গিয়াছে। আঠার নালা পুরীর

সিংহদ্বার। এইখানে উপস্থিত হইলে সাধকের জীবন সার্থক মনে হয়, ভ্রমণকারীর মনে এক অভূতপূর্ব্ব চিন্তাস্রোত উদিত হয়, অধার্ম্মিক লজ্জায় মুখ অবনত করিতে বাধ্য হয়। পুরীর কথা আজীবন ভাবা যায়, কিন্তু লেখা যায় অতি অল্প।

পুরীর পূর্ব্ব ও দক্ষিণে সমুদ্র, পশ্চিম অংশে ভার্গবী নদী, উত্তরে পুরীর রাস্তা। কটক হইতে পুরী ৫৩ মাইল, পুরী হইতে চিল্কা হ্রদ ২৮ মাইল এবং কণারক ১৯ মাইল ব্যবধান। এই বহুবিস্তৃত ক্ষেত্র ধর্ম্ম ইতিহাসের উজ্জ্বল ছবিতে পরিপূর্ণ। ভুবনেশ্বর, খণ্ডগিরি, কোপিলেশ্বর, ধউলি প্রভৃতি সমস্ত এই ক্ষেত্রের মধ্যে। দুই সহস্র বৎসর যাবত উড়িষ্যা ধর্ম্মের পবিত্র লীলাভূমি হইয়াছে। এই দুই সহস্র বৎসর কত অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছে, ভাবিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, নয়ন হইতে অশ্রু ঝরে। এই দুই সহস্র বৎসরের মধ্যে ভারতের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ, এক কথায়, যাঁহারা ভারতের গৌরব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, অশোক হইতে আরম্ভ করিয়া, বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্য, রামানন্দ, জয়দেব, কবীর সকলেই এই ভূমি স্পর্শ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। এমন পূত ক্ষেত্র আর কোথায় মিলে?

উড়িষ্যা সৌভাগ্যশালী, কেননা, অশোক হইতে আরম্ভ করিয়া কেশরীবংশ, গঙ্গাবংশ, সূর্য্যবংশ, ভূইবংশ, যাঁহারা উড়িষ্যায় রাজত্ব করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা পাইয়াছেন। উড়িষ্যার ধর্ম্ম-বিপ্লবের ইতিহাস অসংখ্য অলৌকিক ও অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা পরিপূরিত। এখানে বৌদ্ধধর্ম্ম পঞ্চম শতাব্দীতে শৈব ধর্ম্মে পরিণত হয়, অর্থাৎ বৌদ্ধ রাজত্বের পর কেশরী বংশ ভুবনেশ্বরের শিব মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া শৈবধর্ম্মের অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করেন। শৈব ধর্ম্ম দ্বাদশ শতাব্দীতে বিষ্ণু ধর্ম্মে পরিণত হয়। গঙ্গাবংশাবতংস অনঙ্গভীমদেব ১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বিষ্ণুমন্দির বা পুরীর শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ করেন। এই মন্দির সম্বন্ধীয় অন্যান্য কথা পরে বিবৃত করিব। ১১০৭—১১৪৩ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার দারুণ দুর্ভিক্ষ। উড়িষ্যার ধারাবাহিক ইতিহাস দেওয়া আমাদের অভিপ্রেত নয়। তাহা সাধারণের পক্ষে তত তৃপ্তিকর হইবে না।

পুরীর গৃহ সংখ্যা ৬৩৬৩, জনসংখ্যা ২৫০০০, যাত্রীর ঘর ৫০০০। ইহার মধ্যে পুরীতে ৩৮০ মঠ আছে। মঠের ইতিহাস এইরূপ। পূর্ব্বে যে সকল সাধক পুরীতে আগমন করিতেন, তাহাদের ভরণপোষণের জন্য তদনীন্তনের রাজন্যবর্গ বিপুল বিষয় সম্পত্তি দান করিতেন। মঠধারী ব্যক্তিগণ অবিবাহিত থাকিয়া ধর্ম্ম-চর্চ্চা, এবং অতিথিসেবা প্রভৃতি পরোপকার করিবেন, এই উদ্দেশ্যে এই সকল বিষয় দেওয়া হইত। বর্ত্তমান সময়ে মঠধারী ব্যক্তিগণ, সাধারণত নাম মাত্র ধর্ম্ম-চর্চ্চা ও অতিথি-সৎকার করেন। এই সকল বৃত্তিধারী মঠের বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার অধিক হইবে। হণ্টার সাহেব বলেন, মঠসমূহের বার্ষিক আয় ৫০,০০০ পাউণ্ড। মহারাষ্ট্রীয়দের সময়ে পুরীর মন্দিরে যাত্রীদের নিকট হইতে টেক্স আদায় হইত। এক পাউণ্ড ৯ শিলিং করিয়া প্রত্যেকের নিকট কর আদায় হইত, ইংরাজেরা তাহা রহিত করেন। * ১৮৩৭

* Calcutta review, Vol X, p 218

শ্রীষ্টাব্দে লাট সাহেবের আদেশে মন্দিরের কর উঠিয়া যায়। পুরীর দেবোত্তরের আয়, হন্টারের মতে, ১০১০০০ পাউণ্ড হইবে। পুরীতে প্রতিবৎসর ৫০০০০ হইতে ৩০০০০০০ যাত্রী উপস্থিত হয়। মৃত্যুসংখ্যা বৎসর ১০০০০ হইতে ৫০০০০। ৩১০০ পাণ্ডা যাত্রী আনয়ন করিতে প্রতি বৎসর মফঃস্বল গমন করে।

. ইংরাজ শাসনে পুরী একটী জেলায় পরিণত হইয়াছে. খোর্দ্দা ইহার একমাত্র সবডিবিসন। পুরীতে গবর্ণমেন্টের কাছারী জেলখানা, ডাক্তারখানা, গবর্ণমেন্ট স্কুল বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি বিশেষ প্রয়োজনীয় সমস্তই আছে। কাছারী ডাক বাঙ্গলা,সাহেবের বাড়ী প্রভৃতি সমুদ্র উপকূলে সংস্থাপিত। পুরী সহর সমুদ্রের গর্ভে স্থাপিত বলিয়া বোধ হয়। ৬০। ৭০ ফিট পর্য্যন্ত ভূমি খনন করিলেও বিশাল বিস্তৃত বালুরাশি দেখা যায়। কথিত আছে, নীলাচলে জগন্নাথদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। এ নীলাচল বালুময় অচল ভিন্ন আর কিছুই নয়। কথিত আছে, প্রথম যে মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল,তাহা বালুরাশির গর্ভে প্রোথিত হইয়াছে। পুরীর পথ ঘাট সব সৈকতময়। কাছারীর চতুর্দ্দিক যেন সৈকতময় মরুভূমি তরঙ্গায়িত, মেঘের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন,—বায়ুর প্রকোপে মেঘ যেমন, সমুদ্রের তরঙ্গের প্রকোপে এই বালুরাশি তেমনই। যে রাস্তাদিয়া জগন্নাথ দেবের রথ গমন করে, সেটী অতি প্রশস্ত পথ। এই রাস্তাটী প্রায় এক মাইল ব্যবধান হইবে। এতবড় প্রশস্ত পথ কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় নগরেও নাই।

পুরীতে পদার্পণ করিয়া আমাদের প্রথম দৃশ্য বস্তু—সাগর। প্রধান কার্য্য—সেই অসহায়া রমণী চতুষ্টয়ের অনুসন্ধান। ধীরে ধীরে আমাদের শকট পোষ্টাফিসের সম্মুখে, আমাদের বন্ধু বাবু বিজয় চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইল। তখন প্রায় ১১টা বাজিয়াছে। বিজয় বাবুর বাসা, বালিকা বিদ্যালয়ের পশ্চিম দিকে, পোষ্টাফিসের সম্মুখে,সমুদ্রের অতি নিকটে। এত নিকটে, বোধ হইত যে সমুদ্রের গভীর গর্জ্জন নিস্তব্ধ রজনীতে যেন আমাদের শিয়রে জাগিয়া অমৃত ধারা ঢালিয়া দিতেছে।পীড়িত বন্ধুকে বিজয় বাবুর বাসায় রাখিয়া আমি একটু স্ফূর্ত্তি পাইলাম। পূর্ব্বে জানিতাম,বিজয় বাবু আড়ম্বরশূন্য লোক—তাঁহার ভালবাসা মুখে ভাসিয়া বেড়ায় না- তাহা হৃদয়ের গভীরতম স্তরের মধ্যে লুক্কায়িত। কিন্তু বিজয় বাবু আমাদিগকে পাইয়া যেন কেমন হইয়া গেলেন। তার আনন্দ বাহিরে প্রকাশ পাইবার নয়,—কিন্তু এবার তাহা প্রকাশ পাইল। এত দূর দেশে,বহুকাল পরে—বন্ধুর সম্মিলন, অপূর্ব্ব সম্মিলন। আহারান্তে বিজয় বাবু ও আমি সাগর তীরে গমন করিলাম, তখন অপরাহ্ণ ২টা বাজিয়াছে। সূর্য্যের তীব্রতা সে সাগর তীরে নিস্তেজ—অনন্ত-প্রবাহিত মুক্ত বায়ু সূর্য্যের অতি প্রখর তেজকেও মন্দীভূত করিয়াছে। সাগরের ঠিক ধারে একটী টালিময় রাস্তা,—কাছারীর প্রাঙ্গণাদিও টালি দ্বারা আবৃত। এ বালি সমুদ্রকে-আমাদের দেশের রাস্তার পাথর-কুচি বা খোয়া মন্থন করিতে পারে না। সেই টালি দ্বারা নির্ম্মিত রাস্তার ধারে, সাগরের ২০।৩০ হাত অনতিদূরে, মধ্যে মধ্যে বসিবার জন্য বেঞ্চ আছে। আমরা একখানি বেঞ্চের উপর বসিলাম। সাগরের ধারে যে সকল বৃক্ষ

দেখিলাম, যে সকলই দক্ষিণ দিকের প্রবল বায়ুর আঘাতে উত্তরমুখী হইয়া হেলিয়া দুলিয়া রহিয়াছে, প্রবল বায়ু প্রবাহ বৃক্ষের পত্রগুলিকে যেন কাঁচি-ছাটা করিয়া দিয়াছে। সাগর তীর, বন্ধুর মিলন—জীবনে কি আনন্দ পাইলাম, বিধাতাই জানেন। এমন দৃশ্য জীবনে আর কখনও দেখি নাই। যখনই ভাবি, ইচ্ছা হয়, পুরীতে ছুটিয়া যাই। কত দূর হইতে বায়ু আসিতেছে কত দূর হইতে সেই পর্ব্বত-প্রমাণ তরঙ্গ আসিতেছে কেহ জানে না। পুরীর সাগরের দক্ষিণে যত যাও—কেবল অনন্ত বারি রাশি—পৃথিবীর দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত শুধুই জলরাশি। আকাশে অনন্ত নীলাকাশ, নিম্নে অনন্ত নীল সাগর—আকাশে ও জলে মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে,—কোথায় আকাশের শেষ, কোথায় জলের শেষ—ঠিক বুঝা যায় না। দূর হইতে বোধ হয় যেন আকাশের মেঘ জলে অবগাহন করিতেছে, জলের ঢেউ আকাশে চড়িয়া মেঘ আকার ধরিতেছে। প্রকৃত ঘটনাও তাই। আকাশ সমুদ্রে ধায়, সমুদ্র আকাশে ধায়। বৃষ্টি বল, মেঘ বল, সমুদ্র হইতে সকলের জন্ম। বৃষ্টি বল, মেঘ বল, সব নদী নালা দিয়া সাগরে মিলিতেছে। এ এক দৃশ্য। কিন্তু এখানে, আকাশের মেঘ ও সাগরের ঢেউ যেন লোকালুফি করিতেছে, এক অপরকে আলিঙ্গন করিতেছে। কোন কোন তরঙ্গ পর্ব্বতাকার ধারণ করিয়াও মেঘ ধরিতে না পারিয়া ছুটিয়া ছুটিয়া শেষে আমাদের পাদমূলে, সেই সৈকতময় প্রাচীরে আসিয়া ক্রোধ সম্বরণ করিতেছে। এত বাতাসই বা কেন, এত তরঙ্গই বা কেন? এত উচ্ছ্বাসই বা কেন? শুনিয়াছি, সাগর ৫।। মাইলের অধিক গভীর নাই, পর্ব্বত ৬ মাইলের অধিক উচ্চ নাই। এত জল কোথা হইতে আসে যে, জোয়ারের সময় সমস্ত তট প্লাবিত করিয়া দেশ ডুবাইয়া যায়? কোথা হইতে আসে, কোথায় যায়, কেন হাসে, কেন নাচে, কেহ উত্তর দিতে পারে না। বিশ্ব-সৃষ্টির গূঢ় রহস্য উদ্ভেদ করিতে পারে, এমন বৈজ্ঞানিক, এমন দার্শনিক পণ্ডিতের আজও আবির্ভাব হয় নাই। কেবল কল্পনা ও 'থিওরি'লইয়া যাহাদের বিদ্যার চরম দৌড়, কি আস্পর্দ্ধা, তাহারা অনন্তের সীমা গণিতে ধায়।

পুরীর সাগর—এ জগতে অতুল শোভার ভাণ্ডার। জগতে অনেক সাগর আছে, কিন্তু পুরীর সাগরের ন্যায় বুঝিবা আর কোথাও এমন মিষ্ট নয়, এমন মধুর নয়। মান্দ্রাজে ঝড় হয়, সুন্দর বন বন্যা-প্লাবনে ডুবিয়া যায়, কিন্তু বহুকাল যাঁহারা পুরীতে আছেন, তাহারাও এখানে ঝড় বন্যার প্রবল প্রকোপ দেখেন নাই। শুনিলাম, একবার নাকি কেবল পুরী সাগর জলে প্লাবিত হইয়াছিল। পুরীর সাগরের শোভা অতুল। এই জন্যই বুঝি, কণারকের সূর্য্যমন্দির বহু অর্থ ব্যয়ে সাগরতীরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। পুরীর মন্দিরও বুঝি বা এই জন্যই। অতুল শোভা দেখিয়া প্রাণের সাগরে ডুবিলাম। সসীমে অসীম—সীমায় অসীমা—মিলিয়া পুরীতে যে অপূর্ব্ব জীবন্ত ভাগবত রচনা করিয়াছে, আমার প্রাণেও তাহার ছায়া পড়িল। এই ক্ষুদ্র প্রাণে অনন্ত মহান যেন প্রতিভাত হইলেন। নয়ন হইতে জল পড়িল। আমি আপনা হারাইলাম। বন্ধু বলিলেন, সমুদ্রের ধারে বসিয়া আপনার বোধ হয় পীড়া হইয়াছে। বন্ধু বুঝিলেন না,—আমি

কি হইয়া গিয়াছি। বসিয়া, বসিয়া, বসিয়া—দিন কাটিল। মুখ কথা বলিল, প্রাণ তাতে সায় দিল না। দিন কাটিল, সূর্য্যাদ ডুবিল, সাগর আরো গাঢ়তর হইল। জীবনে অন্তত এক দিন, এই দিন, আমাকে ভুলিয়া আমি অনন্তের অন্বেষণ করিয়া আসিয়াছি। আমার ন্যায় কেহ অনন্ত-পিপাসু থাক, ঐ পুরীর সাগর তীরে একবার অন্বেষণ করিয়া এসো।

ক্রমশঃ।

বিবাহ ও সমাজ।

কোন্ প্রকার বিবাহ উৎকৃষ্ট, ইহা যখন একটা বিতর্কের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে, তখন আমার এ সম্বন্ধে যাহা চিন্তা করা আছে, তাহা সাধারণ সমীপে উপস্থিত করিলে হয়ত কোন উপকার দর্শিতে পারে।

দ্বিতীয় সংস্কারের পর কন্যাদিগের বিবাহ হওয়া সর্ব্বথা উচিত; কারণ তাহা না হইলে পুরুষ সংস্পর্শে তাহাদিগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অকালে পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়া ক্ষণকাল সুষমা প্রদর্শন পূর্ব্বক অচিরাৎ লয় পায়; ইহাতে নারীদিগের স্বাস্থ্যনাশ, দেহক্ষয়, আয়ুহানি ও তাহাদিগের সন্তান সকল হীনবীর্য্য, রোগী ও অল্পায়ু হইয়া থাকে। এজন্য বলি, প্রকৃতি যখন তাহাদিগের দেহের পূর্ণতা সম্পাদন করেন এবং সংস্কার দ্বারা তাহা অবিসম্বাদিত রূপে ঘোষিত হয়, সেই সময় প্রকৃত বিবাহ কাল, বোধ করি।

ইহাতে একটী আশঙ্কা এই আছে যে, বিবাহের পাত্র সহজে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। দেখা গিয়াছে যে, ৬ মাস চেষ্টা করিয়াও পিতা কন্যার বিবাহ জন্য উপযুক্ত পাত্র স্থির করিতে পারেন নাই। এরূপ দীর্ঘকাল সংস্কারবতী কন্যাকে অবিবাহিত বাধা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। এজন্য আমি বিবেচনা করি, কন্যার দশমবর্ষ অতীত হইলেই অভিভাবকেরা তাহার জন্য পাত্র নির্ব্বাচন পূর্ব্বক বিবাহের পত্র করিবেন, কিন্তু যাবৎ কন্যার সংস্কার না উপস্থিত হইবে, তাবৎ সম্প্রদান হইবে না। এই নিয়মে কার্য্য করিলে নানাবিধ শুভফলের সম্ভাবনা আছে, পত্রান্তে পাত্রের অত্যয় হইলে পাত্রান্তরে বিবাহ দিবার বাধা নাই; বিবাহ হইলে কন্যার নিঃসন্তান অবস্থায় বিধবা হইবার আশঙ্কা অল্প।

পাত্র পাত্রী সমবয়স্ক হওয়া কদাচ যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। কারণ যে বয়সে পুরুষের দেহের পূর্ণতা হয়, তাহার অনেক পূর্ব্বে নারীর হইয়া থাকে। ষোড়শবর্ষীয় পাত্রের সহিত তদ্বর্ষীয়া পাত্রী পরিণীতা হইলে পাত্রের অকালমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, এরূপ বিবাহের অনুষ্ঠান করা ঘোরতর নিষ্ঠুরতা; আবার ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিলে দেখা যায় যে, ৫০ বৎসর বয়সের পর নারীর সন্তান জন্মে না, কিন্তু ৬০ বৎসরের পুরুষের জন্মিয়া থাকে, এজন্য আমি বিবেচনা করি, পাত্র ও পাত্রীর বয়সের পার্থক্য অন্যূন ৬ ও অনধিক দশ বৎসর হওয়া বিধেয়।

পাত্রের বয়োধিক্য পুত্র অপেক্ষা অধিক কন্যা উৎপত্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, আমি এ উক্তি অযৌক্তিক বিবেচনা করি। আমার এ বিশ্বাস অটল যে, সম বয়সে বিবাহ দিলেও কন্যা ভিন্ন পুত্র জন্মিবার সম্ভাবনা নাই, অথচ পুরুষের দেহ হানির আশঙ্কা যথেষ্ট আছে। অধিক কন্যা জন্মিবার কারণ পুরুষের চরিত্র শিথিলতা; অপরিসীম স্বাধীনতা প্রযুক্ত পুরুষ সততই স্বেচ্ছাচারী, সুতরাং তেজোহীন।

বিধবাদিগের বিবাহ যেমন শাস্ত্র নিষিদ্ধ, বিপত্নীক পুরুষদিগের পুনর্বিবাহের সেইরূপ নিষেধ করিলে নীতিগত সাম্য লাভ হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ করি না, বরং তাহা হইলে, পুরুষদিগের কতকটা প্রায়শ্চিত্ত হয়। শাস্ত্র প্রণয়নের ক্ষমতা হাতে ছিল বলিয়া বিধবাদিগকে থালিতে পুরিয়াছ, আজ যদি স্ব ইচ্ছায় সেই থালিতে উঠিতে পার, তাহা হইলে স্বীকার করি, তুমি প্রকৃত বীর। আমি তোমাতে ততটা আশা করি না, তুমি পারিলেও তাহাতে মঙ্গল হয় কিনা, সে বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ; প্রথমতঃ জীব প্রবাহের বাধা হয়, তারপর ভারতবর্ষে যখন খ্রীষ্টান মুসলমান, হিন্দু প্রভৃতি নানা জাতির অবস্থিতি, সে স্থলে কোন একটী জাতি ওরূপ কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিলে, মন্দবৃদ্ধি প্রযুক্ত তাহার অপর দ্রুতবৃদ্ধি শ্রেণীর নিকট সংখ্যা বিষয়ে হীন হইবার আশঙ্কা আছে। শতকরা দুই একটী বাদে কোন বিধবা চরিত্র রক্ষা করিয়া থাকেন বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই, কখনও করিয়াছেন বলিয়াও বোধ হয় না। পিঞ্জর-বদ্ধা বিধবা যাহার সম্পত্তি শূন্যা হইয়াও যখন শাস্ত্রের গভীর অনুজ্ঞায় পদাঘাত করে, তখন সর্ব্ববন্ধন-মুক্ত সহায়-সম্পন্ন পুরুষ বিপত্নীক থাকিয়া যে পত্নী দেবীর অনুধ্যানে জীবনাতিবাহিত করিবেন, ইহা বিশ্বাস করা যায় না, সুতরাং ও কঠিন ব্যবস্থার চরম ফল এই দাঁড়াইবে যে গুপ্ত প্রণয়ের ক্ষেত্র আরও প্রচারিত হইবে এবং ভ্রূণ হত্যার পাপ এক হইতে শতগুণে বৃদ্ধি পাইবে।

আমি এজন্য বলি যে, যে বিপত্নীক পুরুষ পুনরায় দার পরিগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি করুন, তাহার বাধা দেওয়া উচিত নহে। তাহার যদি পূর্ব্ব সংসারের সন্তান থাকে, তাহা কোন বাধার কারণ নহে, কারণ, তাঁহার উৎপাদন-শক্তির সমস্তই জগতের হিতের জন্য ব্যয়িত হওয়া উচিত, সংসারের শান্তির জন্য তাঁহাকে শান্ত রাখা আবশ্যক। বিবাহের বাধা দিলে, প্রকৃতি আমাদিগের সহিত ঐক্য হইবেন না, পুরুষ ইন্দ্রিয় চরিতার্থের জন্য অসদুপায় অবলম্বন করিবেন, তাহাতে কত অনর্থ ঘটিতে পারে, সহজেই অনুমান করা যায়।

আমি বিধবাদিগকেও অবিকল উপরোক্ত প্রকারের স্বাধীনতা দিতে ইচ্ছা করি, কারণ শাসন বা ভয় প্রদর্শন দ্বারা যে সতী, সে সতী নহে, কৃত্রিম উপায় দ্বারা সতী সৃষ্ট হইতে পারে না। যে প্রকৃত সতী, তাঁহাকে পুনর্বিবাহের প্রলোভন দিতে চাহি না। সাধ্বীদিগকে পূজা করিবার প্রথা যে হিন্দু সমাজে প্রচলিত আছে, উহা বিধবা সাধ্বীদিগের জন্য কল্পিত। পুনরায় পতিগ্রহণে স্বাধীনতাবতী হইয়াও যে বিধবা টলিল না, অন্য পুরুষের মুখের দিকে চাহিল না, সে নারীরূপিণী দেবীকে পূজা করা জাতির গৌরব।